স্পাই

বিক্রমাদিত্য

ব্যানার্জী পাবলিশার্স

৫/১এ, কলেজ রো,

কলিকাতা-৯

প্রকাশক
শ্রীসূর্যকুমার ব্যানার্জী
ব্যানার্জী পাবলিসার্স
৫/১এ, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৬৪

মুদ্রাকর
শ্রীঅবনীরঞ্জনমান্না
নিউ মহামায়া প্রেস
৬৫।৭ কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

আমার নাম গোবিন্দবিহারী মালকানি। সংক্ষেপে সবাই আমাকে জি-বি-এম বলে ডাকে। আমি ওভারসিজ ইণ্ডিয়ান—আপনারা যাকে বলেন পরদেশী ভারতীয়। থাকি মধ্যপ্রাচ্যের বিলাস নগরী বেরুট শহরে।

আমার পেশা?—আপনি নিশ্চয় আমার জীবিকার পুরো বিবরণী শুনতে চান। কিন্তু এই পেশা নিয়েই আজকের এই গল্প। তাই অতি সংক্ষেপে আমার কাজের ফিরিস্তি আপনাকে দিতে পারবো না।

আমি হলুম নাইট ক্লাবের বারম্যান। গ্লাসে গ্লাসে মদ ঢালি, জল মেশাই, আর সেই মদ ডবল দামে বিক্রি করি।

আমার নাইট ক্লাবে নিত্যি-নতুন খদ্দের। ইংরেজ, জার্মান, আমেরিকান, মায় আফ্রিকার অধিবাসী। এছাড়া আরব দেশের শেখেরাও আমার বাঁধা খদ্দের।

এদের মধ্যে কেউ মদ খায়, কিন্তু মাতাল হয় না। কেউ কিছু পান না করেও মাতাল হবার ভান করে।

সবাই বারের কাউণ্টারে এসে হাঁক পাড়ে—জি-বি-এম ডবল স্কচ। কেউ বা অর্ডার দেয় জিন-টনিক। কেউ বা দাবী করে ককটেল। আমি ককটেল বানাবার জহুরী। বলুন, কোন্ ককটেল চান? স্কচ ককটেল না ভোদ্কা ককটেল। এই বান্দাকে একবার হুকুম দিন। আপনার টেবিলে ঠিক ককটেলটি এসে হাজির হবে।

এই যা, একেবারেই ভুলে গেছি যে আপনি ভারতীয় পাঠক। অতএব আপনার কাছে ককটেলের গল্প বলে দুর্নাম কিনতে চাইনে। হয়তো ককটেলের গল্প দিয়ে আপনাকে অনেক কাহিনী বলতে পারতুম। হাজার হোক মদ নিয়ে আমার ব্যবসা।

আমার তৈরী ককটেল পান করে খদ্দেরের দিল খুলে যায়। রঙিন নেশা লাগে তার চোখে। বিচিত্র রঙিন স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। কতো মুখরোচক বিচিত্র কাহিনী ছুটে বের হয় তাদের মুখ থেকে। হয়তো তাদের কেউ কোন নারীর স্বপ্ন দেখে গান গাইতে শুরু করে। কেউ বা চীৎকার করে ওঠে—গার্লস, উই ওয়াণ্ট গার্লস্।

মেয়ের চাহিদা মেটানো সহজ কথা নয়। মদের খাই আপনি মেটাতে পারেন তাদের গ্লাসে আরও মদ ঢেলে ঢেলে। তবে মেয়েমানুষের চাহিদা আপনি সহজে মেটাতে পারবেন না। আর খদ্দেরের মন যদি তুষ্ট না হলো তাহলে আপনাকে বিস্তর হাঙ্গামা পোহাতে হবে। এমন কি আপনার জীবনের আশঙ্কাও থাকবে। আপনি ভয় পাচ্ছেন? আমি গোবিন্দবিহারী মালকানি এ কাজে অতি পটু। সহজে ভয় পাইনে কোন কিছুতে। \আমার খদ্দের হলো নাবিক, সেলসম্যান বা এয়ার কোম্পানীর পাইলট। কেউ বা ইউনাইটেড নেশনের সৈন্য। জীবনের ক্লান্তি মেটানোর জন্য তারা জি-বি-এম-এর বার কাউণ্টারে এসে হাজির হয়। তাদের দাবী মেটানো সহজ নয়।

আমার খদ্দের হলো বিচিত্র ধরনের মানুষ। বার কাউণ্টারে এসেই তারা মদ চাইবে। ডবল স্কচ কিংবা ব্রাণ্ডি সাওয়ার। যাদের পুঁজি অল্প তারা দাবী করবে বিয়ার।

তারপর শুরু করবে মুখরোচক গল্প বলতে। মুখরোচক গল্প মানেই মেয়ে মানুষের গল্প। বেটী কিংবা জেনীর গল্প। মদের নেশা যতোই বাড়তে থাকবে গল্পের আসর ততই জমে উঠবে। একদিন হঠাৎ এই গল্পের মাঝখানে একজন চীৎকার করে বলে: জি-বি-এম!

আমি দৌড়ে তার কাছে ছুটে যাই। কম্পিত কণ্ঠে বলি: বলুন স্যার।

: হোয়ার ইজ নাদিয়া? নাদিয়া কোথায়?

বাই দি ওয়ে। আপনার সঙ্গে নাদিয়ার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। একবার জি-বি-এম-এর মদের আড্ডাখানায় আসুন। নাদিয়া হুসেনের সঙ্গে আপনার নিশ্চয় পরিচয় হবে। শুধুমাত্র পরিচয় নয়, হৃদ্যতাও হবে। আপনি দিলখোলা আদমী। প্রেম করতে আপনার দ্বিধা-সংকোচ নেই। এদিকে নাদিয়া হুসেন শেখের প্রেম, সৈন্যের প্রেম, ব্যবসায়ীর প্রেমে মশগুল। কাকে কী করে তুষ্ট করতে হয় নাদিয়া তা জানে।

নাদিয়ার মুনাফা থেকে এই বান্দার কিছুটা বখরাও মেলে। ইংরেজিতে আপনারা যাকে বলেন কমিশন। আমি বলি বকশিস!

এবার আমার আসরে নাদিয়া এলো।

শুধু নাদিয়া কেন, রুকশানা, শামিয়া, রেহাবও এলো। এরা সবাই আরব সুন্দরী। জি-বি-এম-এর আসর জগমগিয়ে উঠলো। আরব রূপসীদের সৌন্দর্যে উজ্জ্বল বাতির আলোও যেন নিষ্প্রভ হলো।

জি-বি-এম-এর বার শুধুমাত্র সৈন্য-সামন্তদের আড্ডাখানা নয়। কুয়েট, আবুদাবি, কাতারের শেখদের মজলিস।

রাত একটু গভীর হ[illegible] কুয়েতের শেখ এলেন। চোগা-চাপকান চড়িয়ে তার সাঙ্গপাঙ্গরা বেশ ঠাটে আমার বারে ঢুকলো।

শেখ আমার বহুদিনের পুরানো খদ্দের। তাকে দেখেই আমি দৌড়ে ছুটে যাই।

বারের এক প্রান্তে আপন মনে সঙ্গীদের নিয়ে শেখ বসলেন।

সাঙ্গ-পাঙ্গরা স্কচ কিংবা বিয়ারের অর্ডার দিলো। কিন্তু শেখ চাইলেন হুইস্কি অন দি রক্স।

ড্রিংকস এলো। শেখ চুক্‌চুক্ করে হুইস্কি গিলছেন। হঠাৎ চীৎকার করে আমাকে ডাকলেন: জি-বি-এম!

আমি সেলাম ঠুকে দাঁড়ালুম।

শেখ আমাকে তার কাছে টেনে নিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললেন: নাদিয়া।

আমি একটু মৃদু হাসি। আগেই বলেছি আমি হলুম মেয়ে মানুষের দালাল। এই কাজ কী করে করতে হয় আমার তা বিলক্ষণ জানা আছে। তাই মুখ একটু গম্ভীর করে বললুম: স্যার, আজ নাদিয়ার শরীর ভালো নেই।

আমার কথাটা মিথ্যে। আমি টাকার অঙ্ক বাড়াতে চাই! হয়তো শেখ আমার জবাবের তাৎপর্য বুঝতে পারেন। উনি জানেন জি-বি-এম মাছ খেলিয়ে ডাঙায় তুলবে। অর্থাৎ সহজে ধরা দেবে না। আমার জবাব শুনে উনি খানিকটা সময় চুপ করে থাকেন। তারপর আমার হাতের মুঠোয় দুশো ডলারের নোট গুঁজে দিলেন। আমার মুখে হাসি ফুটে উঠলো। আমি বললুম: স্যার, আজ সারাটাদিন নাদিয়া আপনার জন্যে প্রতীক্ষা করছে।

তারপর শেখকে নাদিয়ার কেবিন দেখিয়ে দিলুম।

ইতিমধ্যে বারের কাউন্টার সরগরম হয়ে উঠেছে। নানান ধরনের খদ্দের। বেটীর বয়ফ্রেণ্ড আজ আসেনি। তাই বেটী এক সেলসম্যানের সঙ্গে প্রেম জমাবার চেষ্টা করছিলো। এমনি সময়ে বেটীর বয়ফ্রেণ্ডও হাজির। ব্যস, হাঙ্গামা শুরু হলো। সেই হাঙ্গামা মেটাতেও আমাকেই ছুটে যেতে হলো।

এই হল জি-বি-এম-এর দৈনন্দিন জীবন।

*   *   *

আজও আমি বারে বসেছিলুম।

বারের কাউন্টারে বেটী বসেছিলো। আমি গ্লাস পরিষ্কার করছিলুম। হুইস্কির বোতল সাজিয়ে রাখছিলুম।

প্রথম দুটো বোতলের ছিপি খুলিনি। কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ বোতলের ছিপি খুলে জল ভরে রাখলুম। খানিকটা জল খানিকটা হুইস্কি!

বারের আইন-কানুন আপনি নিশ্চয়ই ... খরিদ্দার প্রথমে এসেই চাইবে হুইস্কি অন দি রক্স। প্রথম পেগের সঙ্গে জল মেশানো একেবারেই অসম্ভব। তারপর নেশা যখন একটু রঙিন হয়ে এলো তখন চাইবে হুইস্কি উইথ সোডা। এবার হুইস্কির সঙ্গে জল মেশালুম। নেশার ঘোরে খদ্দের কী খেলো তা একেবারেই বুঝতে পারল না।

বেটী আমাকে বলল : ডার্লিং! হুইস্কি প্লিজ। বেটী যখন কাউকে ডার্লিং বলে ডাকবে, তখনই বুঝতে পারবেন যে নিশ্চয় তার কোন অভিসন্ধি আছে। আমি হুইস্কি দিলুম। বেটী এবার আমার গালে চুমু খেলো।

হাজার হোক আমার রক্ত-মাংসের শরীর। বেটীর ঠোঁটের স্পর্শে আমার দেহে চাঞ্চল্য আনলো। আমি একটু নড়েচড়ে বসলুম। জিজ্ঞেস করলুম : কী ব্যাপার?

: ডার্লিং—, বেটীর কণ্ঠস্বর যেন আমার কাছে সঙ্গীতের ধ্বনি বলে মনে হলো।

আপনি খরিদ্দার। আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি, বেটী যদি কখনও আপনাকে চুমু খায় তবে সতর্ক হবেন। তাই আমিও নিজেকে সামলে নিলুম। বললুম : কী ব্যাপার?

: জি-বি-এম, আমি যে ক্লায়েন্টের সঙ্গে বসেছিলুম তার বিল হয়েছিলো পঁচিশ স্টার্লিং। আমার কমিশন হলো পঁচিশ পার্সেন্ট। অর্থাৎ ছয় পাউণ্ড পাঁচ শিলিং। ডার্লিং, ক্যান আই হ্যাভ দিস মানি প্লিজ।

এই হলো নাইট ক্লাবের আইন-কানুন অর্থাৎ কোন খদ্দেরের সঙ্গে বসে যখন কোন মেয়ে মদ খায়, তাকে পঁচিশ পার্সেন্ট কমিশন দিতে হয়। অনেক সময় প্রেমের বিভোরে মেয়েরা কমিশনের কথা ভুলে যায়। আর আমি সেই কমিশন নিজের পকেটে ভরি। আজও আমি ভেবেছিলুম যে কমিশনটা নিজের পকেটে ভরতে পারবো। কিন্তু বেটী সেয়ানা মেয়ে, প্রেমের কথা ভুলতে পারে, রূপোর কথা কখনই নয়।

বেটীর কথা শুনে আমি মৃদু হাসলুম। একটা জবাব দেবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু আমি কোন জবাব দেবার আগেই বেটী আমার হাত চেপে ধরলো। মেয়েলি হাতের স্পর্শে আমি যেন সজাগ হয়ে উঠলুম।

: ডার্লিং, মাই কমিশন প্লিজ—বেটী এবার অনুযোগের কণ্ঠে বলে।

: নিশ্চয়, নিশ্চয়। কমিশন। এই বলে আমি বেটীর হাতে পাঁচ স্টার্লিং-এর একটা নোট গুঁজে দিলুম। বেটী নোটটা তার ভ্যানিটি ব্যাগে পুরে বললো : ডার্লিং, আমার কমিশন হলো ছয় স্টার্লিং পাঁচ শিলিং।

আপনারাই বলুন, বেটী কী ডাকাতে মেয়ে। মিষ্টি কথা বলে আমার ঘাড় ভেঙে সম্পূর্ণ টাকাটাই বের করে নিলো।

আমি বেটীকে ড্রিংকস অফার করলুম।

: অন দি হাউস জি-বি-এম, না তোমার একাউন্টে খাওয়াচ্ছো? অন দি হাউস হলে হুইস্কি অন দি রকস চাই। তোমার পয়সায় হলে নো শ্যাম্পাইন বাট পিঙ্ক শ্যাম্পাইন। বেটী বললো।

: পিঙ্ক শ্যাম্পাইন? আমার প্রশ্নে থাকে বিস্ময় ও উত্তেজনা।

: জি-বি-এম, বেটী আমার হাত ধরে বলে,—নাইট ক্লাবের মেয়েদের ঠকিয়ে তো কম পয়সা করোনি। প্রতিদিন দিবারাত্র তুমি আমাদের ঠকাচ্ছো। শেখ সেদিন নাদিয়াকে যে হীরের নেকলেসটা দিয়েছিলেন সেই হার কোথায় গেলো জি-বি-এম? নাহালাকে কুয়েটির বিজনেস ম্যান যে ক্যাস চেক দিয়েছিলেন সেই চেকের হদিস আজ অবধি পাওয়া যায় নি। নো জি-বি-এম, তুমি সুইট ডার্লিং, কিন্তু মেয়েদের প্রতি তোমার একটুও দয়ামায়া নেই। তাইতো শেখ মুনির তোমাকে ম্যানেজারের গদীতে বসিয়েছে।

এই যা, আসল কথাটা বলতেই ভুলে বসে আছি। শেখ মুনিরের সঙ্গে আপনাদের নিশ্চয় আলাপ-পরিচয় নেই। শেখ মুনির হলেন এই নাইট ক্লাবের মালিক বা প্রোপাইটার।

নাইট ক্লাবের একপ্রান্তে শেখ মুনিরের ঘর। বলতে পারেন, অফিস কিন্তু সেই ঘরে। সবার ঢোকবার হুকুম নেই। এমন কি জি-বি-এমকেও টেলিফোন করে অনুমতি নিয়ে ঘরে ঢুকতে হয়। অবশ্যি এই অনুমতি নেবার বিশেষ কারণ আছে। কারণ বেরুটের নাইট ক্লাবে রূপসীর ছড়াছড়ি। মালিকের ঘরেও সর্বদাই সেসব সুন্দরীরা আনাগোনা করছে।

শেখ মুনির বেশ কড়া মেজাজের লোক। তবে মেয়েদের প্রতি তার কোন দুর্বলতা নেই একথা বলবো না। তার সব চাইতে পেয়ারের মেয়ে হলো লোলিটা।

লোলিটা স্প্যানিস মেয়ে, মনিরের প্রেয়সী। তাই ওর ওপর একটু বিশেষ নজর রাখতে হয়। ওর সব আব্দার মেনে চলতে হয়। আর এই কারণে বেটী কিন্তু শেখ মুনিরের ওপর বড্ডো চটা।

যাক্, সেদিন বেটীকে খুশী করবার জন্যে আমায় পিঙ্ক শ্যাম্পাইনের বোতল খুলতে হলো। সবেমাত্র শ্যাম্পাইনের বোতলের ছিপি খুলেছি এমনি সময় করিডরের একপ্রান্ত থেকে শেখ মুনিরের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো: জি-বি-এম।

কণ্ঠস্বর শুনে আমার একটুও বুঝতে অসুবিধে হল না যে আমাকে শেখ

মুনিরের খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। নইলে এই অসময়ে তিনি আমাকে কখনই ডাকতেন না। অসময় বলছি তার কারণ, সন্ধ্যার সময় শেখ মুনির আমাকে কখনই ডাকেন না। রাত যখন গভীর হয় তখন শেখ মুনির বান্ধবীদের নিয়ে আসর গুলজার করতে বসেন। কিন্তু সন্ধ্যার সময়ে নাইট ক্লাবে তার দেখা পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। রাত এগারোটা অবধি এই নাইট ক্লাবের 'বস' হলুম আমি—গোবিন্দবিহারী মালকানি।

শেখ মুনিরের ডাক শুনে আমি দৌড়ে ছুটে গেলুম। করিডরের ওপর দিয়ে বেশ খানিকটা পথ অতিক্রম করে যেতে হলো।

শেখ মুনিরের স্পেশাল কামরা। কামরার সামনে একটি লাল বাতি। যদি বাতি জ্বালানো থাকে তবে বুঝবেন শেখ মুনির এনগেজড—অর্থাৎ ব্যস্ত। বেশ খানিকটা সময় বাতি জ্বললে তবে তার অর্থ হলো লোলিটা তার ঘরে আছে।

আজও লাল বাতি জ্বলছিলো। তাই দরজায় টোকা দিলুম। ভেতর থেকে রাশভারী কণ্ঠস্বরে জবাব এলো : কম ইন।

আমি একটু ভীত হয়ে ঘরে ঢুকলুম। আপনাদের অতি সন্তর্পণে বলছি, শেখ মুনিরকে দেখলেই আমার বুক কাঁপতে থাকে। কেন? এ কথার জবাব আপনাদের আমি দিতে পারবো না।

সেদিন শেখ মুনিরের ঘরে লোলিটা ছিল না। ছিলো অন্য দু'জন লোক। এর মধ্যে একজন যে লেবানীজ এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।

: জি-বি-এম, শেখ মুনির আমাকে বললেন,—এসো, এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই। আমার বিশেষ বন্ধু, এরা তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

: আমার সঙ্গে? আমার এই জবাবে থাকে বিস্ময় ও উত্তেজনা।

: হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে। কিছু কাজ-কারবার নিয়ে এরা তোমার সঙ্গে শলা-পরামর্শ করতে চান। হ্যাঁ, আমার এই বন্ধুর নাম সভোলা। অন্য বন্ধুটির নাম জানবার প্রয়োজন নেই। যাক্, জি-বি-এম, যে কাজ-কারবার নিয়ে এরা তোমার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে চান, সে কাজে তুমি অপটু নও।

আমি শেখ মুনিরের কথা শুনে হাসি। জবাব দিই : স্যার, ডু দে ওয়ান্ট গার্লস?

গম্ভীর কণ্ঠে শেখ মুনির বলেন : নো।

: তাহলে আমি আর কী করতে পারি স্যার? বেশ একটু উৎকণ্ঠিত হয়ে আমি বলি।

সতীলা বা তার বন্ধু আমাকে কাজের কোন আভাস দিলেন না। সতীলার বন্ধু আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি ভারতীয় ?

: ইয়েস স্যার, ওভারসিজ ইণ্ডিয়ান। আমি ওভারসিজ ইণ্ডিয়ান শব্দটির ওপর বেশ জোর দিয়ে বললুম।

: কতোদিন আগে দেশে গিয়েছো ? আবার প্রশ্ন করলেন তিনি।

আমি এবার মিথ্যে কথা বললুম। বললুম : এই তো দু'বছর আগে একবার দেশ থেকে ঘুরে এলুম।

: লায়ার। মিথ্যেবাদী। না জি-বি-এম, সত্যিই তুমি হলে এ গ্রেট গাই। এতো সহজে বিনা দ্বিধায় মিথ্যে কথা বলতে পারো দেখে অবাক হচ্ছি। আমাদের কাজের জন্যে তুমিই উপযুক্ত। দি রাইট পারসন।

: স্যার, আপনি কি বলছেন। বেশ বিস্মিত হয়ে আমি জবাব দিই।

: কিছু না। শুধু মাত্র বলেছি যে ইউ আর এ লায়ার। তুমি মিথ্যেবাদী।

সেদিন সতীলার বন্ধুর মন্তব্যে আমিও হতবাক্ হয়েছিলুম। অবশ্য তার কথার মধ্যে খানিকটা সত্যি ছিলো। মানে দু'বছর আগে আমি ভারতবর্ষে যাইনি। প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর আগে একবার বোম্বাইয়ে গিয়েছিলুম। তাও অল্প কয়েক দিনের জন্যে।

সতীলার বন্ধু এবার একটি ফাইল বের করলেন। বললেন : জি-বি-এম, তোমার নামের ফাইল। বেশ কিছুদিন থেকে তোমার ওপর আমরা নজর রাখছি। হ্যাঁ, এই ফাইল থেকে খানিকটা তোমাকে পড়ে শোনাই। গোবিন্দ-বিহারী মালকানি দু'বছর আগে স্মাগলিং-এর অপরাধে একবার জেল খেটেছিল। বাই দি ওয়ে, কাস্টমস্‌কে ফাঁকি দিয়ে দামাস্কাস থেকে কী আনছিলে ? হাশিস্ না আর্মস ?

হ্যাঁ, আমাদের ফাইলে লেখা আছে, দামাস্কাসের সামিরামি হোটেলের হাজার লেবানীজ পাউণ্ড দেনা এখনও তুমি শোধ করোনি। আর হ্যাঁ, আমাদের হোটেলেই বা দেনা কতো ?

এবার আমার চিন্তা বাড়লো। শঙ্কিত হলুম। আমার অতীত নিয়ে যে কেউ এতো গবেষণা করবে এ কখনও কল্পনা করিনি। না, লোকটা ভুল বলেনি। দামাস্কাস থেকে হাশিস আনতে গিয়ে একবার ধরা পড়েছিলুম। স্মাগলিং-এর অপরাধে আমার বেশ কিছুদিনের জন্যে জেলও হয়েছিলো। আর একবার কায়রোতেও পুলিশ আমাকে পাকড়াও করেছিলো। জানতে চান কী অপরাধে ? হাসিস নয়, আর্মস নয়—কারেন্সি লুকিয়ে নিয়ে যাবার অপরাধে। জানেন তো কায়রোতে বিদেশী কারেন্সি নিয়ে যাওয়া নিষেধ।

সতীলার বন্ধুর কথার জবাব খুবই ক্ষীণকণ্ঠে দিলুম। বললুম: ইয়েস স্যার, কিন্তু সেদিনকার গাফিলতির জন্তে আমাকে দোষারোপ করবেন না। নাদিয়ার মূর্খামির জন্তেই আমাকে সেদিন হাঙ্গামা পোহাতে হয়েছিলো।

সতীলা এতোক্ষণ মুখ খোলেনি। এবারে বেশ দৃঢ়কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে: থাক, তোমার মেয়ে ঘটিত কাহিনী আমরা শুনতে চাইনে। এবার বলতো সত্যি করে, কোন্ বছরে ভারতবর্ষে গিয়েছিলে?

আমি অসহায় করুণ দৃষ্টিতে শেখ মুনিরের পানে তাকালুম। দেখলুম তার মুখও গম্ভীর। হয়তো আমার জবাব তাকে সন্তুষ্ট করেনি। এরপর আর কী করা যায়। তাই ক্ষীণকণ্ঠে প্রশ্ন করি: আপনার এই খবরে কী প্রয়োজন?

: বাজে তর্ক করে আর আমাদের সময় নষ্ট করো না জি-বি-এম। যে প্রশ্ন করি তার সহজ এবং সরল জবাব দাও। স্পষ্ট করে বলো, হোয়েন ডিড ইউ গো টু ইণ্ডিয়া?

আমার মুখ দিয়ে এবার সত্যি কথা বেরিয়ে পড়ে। বলি: ঠিক তারিখ স্মরণ নেই। তবে বছর পাঁচেক আগে একবার গিয়েছিলুম। তার পরেও দু' একবার আমাকে সোনা নিয়ে বোম্বাই শহর অব্দি যেতে হয়েছিলো।

: কোন্ কোন্ শহরে গিয়েছিলে? সতীলা বেশ কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করে।

: বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজ, লখনউ—আমার কথা শেষ হবার আগেই সতীলার বন্ধু বেশ দৃঢ়কণ্ঠে বলেন: এগেন লাম্বিং। জি-বি-এম, বোম্বাই-এর কাষ্টম্স অফিসার তোমাকে সন্দেহ করেছিলো। কিন্তু সেদিন তুমি কাষ্টম্স অফিসারকে ফাঁকি দিয়ে সরে পড়ো। তারপর বোম্বাই থেকে কলকাতায় যাও। সেখান থেকে···।

এবার আমার জবাব দেবার পালা।

: স্যার আমার সম্বন্ধে যখন সবই জানেন তবে অনর্থক প্রশ্ন করে কেন আমার সময় নষ্ট করছেন! সোজা স্পষ্ট ভাষায় বলুন আমাকে কী করতে হবে?

এবার শেখ মুনির তার মুখ খুললেন। বললেন: জি-বি-এম, তোমাকে দেশে ফিরে যেতে হবে।

: দেশে! আপনি কী বলছেন স্যার! আমার এই জবাবে এতো উত্তেজনা ছিলো যে আমার কণ্ঠস্বর শুনে সবাই বিস্মিত হলো।

: হ্যাঁ, ইউ আর টু গো ব্যাক টু ইয়োর কাণ্ট্রি—আই মীন, টু ইণ্ডিয়া। সতীলা বেশ সজোরে বললো।

এবার আমি একটু করুণকণ্ঠে জবাব দিই: বলুন স্যার, আমি কী অপরাধ

করেছি? সুখে থাকতে আজকাল কী কেউ আর ভারতবর্ষে যায়! সেখানে খাবার কিছু নেই। প্রতিদিন অনাহারে কতো লোক মারা যাচ্ছে। এই বান্দা কী অপরাধ করেছে?

: কারণ, আমাদের যে কাজ তা একমাত্র তুমিই করতে পারবে। সতীলা জবাব দিলো।

: ধরুন, আমি যদি আপনাদের কাজ করতে রাজী না হই, আমি জবাব দিই।

: তাহলেও এই কাজ করবার জন্যে তোমাকে বাধ্য করা হবে জি-বি-এম। না, অমন ভুল করো না। তোমার ফাইল দেখছো তো? সতীলার বন্ধু বেশ দৃঢ়কণ্ঠে বলেন।

আর এই বলে উনি আমার চোখের সামনে সেই ফাইলটা তুলে ধরেন। আমি কিন্তু ফাইলটা দেখবার জন্য কোনও আগ্রহ প্রকাশ করি না।

সতীলার বন্ধু আবার বললেন: তিন মাস আগে তোমার এই নাইট ক্লাব থেকে একটি মেয়ে উধাও হয়ে যায়। ইতালিয়ান মেয়ে। কী নাম তার? রোজালিন। বাজারে গুজব রটেছে যে মেয়েটি আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু জি-বি-এম, আমরা জানি তুমি জানো, মেয়েটি আত্মহত্যা করেনি। দুবাইর এক শেখের কাছে তাকে বিক্রি করা হয়েছে।

এই ঘটনার কয়েকদিন বাদে তোমার নাইট ক্লাবের বেলী ড্যান্সার নাগোয়া মারা গেলো। তার মৃত্যুর ফাইল আমরা পুলিশের কাছ থেকে উদ্ধার করেছি। তোমার অত্যাচারের দরুণই সেই মেয়েটি মারা যায়, তাই নয় কী?

এই বলে সতীলার বন্ধু খানিকক্ষণ চুপ করলেন। আমিও চুপ করে থাকি। কী জবাব দেবো বলুন? নিজের মনে বেশ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলুম।

সতীলার বন্ধু আবার বলতে শুরু করলেন: নাইট ক্লাবের মেয়েদের মারফৎ হাসিস ও হেরোন বিক্রি করছে কে? জি-বি-মালকানি। স্মাগলিং করছে কে? জি-বি-এম।

যাক্ আমরা তোমার অতীত নিয়ে আলোচনা করতে চাইনে। তবে প্রয়োজন হলে এইসব পুরানো কাসুন্দি আমাদের ঘাটতে হবে।

এবার আমার মনের আতঙ্ক বাড়লো। বুঝতে পারলুম, বেশ বড়ো ফ্যাসাদে জড়িয়ে গেছি। এই গেরোর হাত থেকে যে সহজে উদ্ধার পাবো তা মনে হলো না।

এবার সতীলা আমার ফাইলটা নিজের হাতে নিয়ে বললো: তোমার জীবনী শুনতে চাও? বেশ শোন, তোমার কাহিনী শোনাচ্ছি। তুমি,—গোবিন্দ-

বিহারী মালকানি, ওভারসিজ ইণ্ডিয়ান। তোমার নামে তিনটি দেশ থেকে পাশপোর্ট ইস্যু করা হয়েছে। ব্রিটিশ, লেবানীজ ও ভারতীয়। তাই নয় কী? পাঁচ বছর আগে একটা জাল চেক ক্যাস করেছিলে। কিন্তু সেখানে পুলিশ তোমার কোন খবর পায়নি। তারপর···

সতীলার কথা শেষ হবার আগেই কিন্তু আমি জবাব দিলুম: জানি স্যার। আপনারা যে আমার জীবনের নাড়ী-নক্ষত্র জানেন, তা জানি। আমার জীবন কাহিনী আর আপনাদের শোনাতে হবে না। এবার বলুন, আমাকে কী করতে হবে। আপনাদের প্রস্তাবটাই শুনি।

শেখ মুনির এবার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর একটা সিগারেটে আগুন ধরিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললেন: জি-বি-এম, তোমাকে একবার ভারতবর্ষে ফিরে যেতে হবে। তুমি ভারতীয় নাগরিক। তাই তোমাকেই আমাদের বিশেষ প্রয়োজন।

বুঝলুম আমার আর্জি ওরা রাখবে না। তাই করুণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলুম: স্যার, আমাকে কী করতে হবে। স্মাগলিং! সোনা না কারেন্সি?

সতীলা আমার কথা শুনে একটু হাসলো। তারপর বললো: না, এবার তোমাকে কাজের ধারা একটু পাল্টাতে হবে।

: অর্থাৎ? আমার প্রশ্নে থাকে বিস্ময়।

: তোমাকে স্পাইং-এর কাজ করতে হবে, সতীলার বন্ধু বললেন।

: স্পাইং! শব্দ দুটো আমি এতো জোরে উচ্চারণ করলুম যে আমার কণ্ঠস্বর শুনে সবাই একটু বিস্মিত হলেন। মুহূর্তের জন্যে যেন আমার চেতনা হারিয়ে ফেললুম। যখন আবার চেতনা ফিরে এলো তখন দেখলুম, শেখ মুনির একটা সিগারেট ফুঁকছেন। আপনাদের বলছি, আসলে ওটি কোন সিগারেট নয়, ও হলো হাসিস। হাসিসের গন্ধ বেশ তীব্র।

: হ্যাঁ, আমাদের জন্য কিছু খবরাখবর জোগাড় করতে হবে।

: আমরা,—মানে কে?

: সে খবর দিয়ে তোমার কোন প্রয়োজন নেই। তোমার কাজ হবে আমাদের নির্দেশানুযায়ী চলা অর্থাৎ আমাদের হুকুম মানা।

: কাজটা কী ধরনের তা একবার জানতে পারি কী?

: ধীরে বন্ধু ধীরে। এই ধরনের কাজে সমস্ত কথা এক সঙ্গে খুলে বলা যায় না।

: বেশ, বলুন কবে কাজ শুরু করতে হবে?

আমার এই জবাব শুনে শেখ মুনির, সতীলা এবং তার বন্ধু যেন একটু অবাক

হলেন। শুধু অবাক নয় একটু বিস্মিতও হলেন। তারপর সভৌলা জবাব দিলো। বললো : কাজের পুরো ফিরিস্তি তোমাকে এই মুহূর্তে দিতে পারবো না। কারণ, যে কাজ তোমাকে দেয়া হচ্ছে সেই কাজটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাই অল্প কথায় এই কাজের ব্যাখ্যাও করতে পারবো না। আর শুধু তাই নয় জি-বি-এম, আমাদের এই প্রস্তাব ভেবে-চিন্তে করার জন্য তোমাকে সময়ও দিচ্ছি কিছু।

: বেশ, আমাকে এই ব্যাপার নিয়ে চব্বিশ ঘন্টা ভাবতে দিন। কিন্তু বলুন, কী করে আপনাদের প্রস্তাবের জবাব দেবো ?

: আমাদের এই প্রস্তাবে যদি রাজী থাকো তাহলে আজ থেকে পাঁচদিন বাদে, মানে সামনের শুক্রবার, বৌসের দোলচা ভিটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে অপেক্ষা করো। ঠিক তিনটের সময় এক ভদ্রলোক সেখানে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। উনি তোমাকে চেনেন। ঠিক তোমার পাশের টেবিলে বসবেন। ওর নাম হলো আনোয়ার হুসেন। উনি একটি মারলবরো সিগারেট ধরানোর চেষ্টা করবেন। তোমাকে প্রশ্ন করবেন : ওয়েল মিঃ, ক্যান আই হ্যাভ এ লাইটার ? তুমি তার সিগারেটে আগুন ধরিয়ে দেবে। উনি আবার বলবেন : মিঃ জাভেরী,– হ্যাঁ, উনি তোমাকে মিঃ জাভেরী বলেই সম্বোধন করবেন। বলবেন . আপনার সঙ্গে আমার নিশ্চয় কায়রোতে পরিচয় হয়েছে। এতেই বুঝতে পারবে উনি আমাদের লোক। তুমি জবাব দেবে : মিঃ হুসেন, আই এ্যাম্ গ্ল্যাড টু মিট্ ইউ। ব্যস, তারপর তোমাকে কী কাজ করতে হবে তার বাকী নির্দেশ উনিই দেবেন। কিন্তু শুক্রবার দিন ঠিক তিনটের সময় তুমি যদি দোলচা ভিটা রেস্তোরাঁয় না যাও, তাহলে তাকে আর কখনই দেখতে পাবে না। অবশ্যি এর পরিণাম কী হবে তা সঠিক আমি এখনও বলতে পারছি নে। ওয়েল জি-বি-এম, গুড বাই এ্যাণ্ড গুড লাক।

এই বলে সভৌলা এবং তার বন্ধু শেখ মুনিরের ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। শেখ মুনিরও একটু বাদে আমাকে বললেন : জি-বি-এম, এ হলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বেশ ভালো করে চিন্তা করে দেখো। উই শ্যাল মিট্ এগেইন।

এই বলে শেখ মুনিরও চলে যেতে আমি আবার বারে ফিরে এলুম।

* * *

তারপর এলো শুক্রবার।

ঠিক তিনটে বাজবার দশ মিনিট আগে আমি দোলচা ভিটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে হাজির হলুম। একটা বিয়ারের গ্লাস নিয়ে বসলুম।

ঘড়ির পানে তাকালুম। তখনও তিনটে বাজেনি। আমি প্রতিটি মুহূর্ত গুনতে লাগলুম। তিনটে বেজে গেলো খানিক বাদে। আমার পাশে একটি লোক এসে বসলো। না, লোকটি যে আরব এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমি লক্ষ্য করলুম, লোকটি একটি স্কচ অন দি রক্সের অর্ডার দিলো। মারলবরো সিগারেটের প্যাকেট খুলে একটি সিগারেট বের করলো। তারপর পকেট হাতড়াতে লাগলো।

বুঝতে পারলুম লোকটি দেশলাই খুঁজছে। হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করলো: ক্যান আই হ্যাভ এ লাইটার?

আমি লাইটার জ্বালিয়ে তার সিগারেটে আগুন ধরিয়ে দিলুম।

: মিঃ জাভেরী? লোকটি প্রশ্ন করলো।

: ইয়েস মিঃ হুসেন, আই এ্যাম সো গ্লাড্ টু মিট্ ইউ।

: থ্যাঙ্কস্। আপনার সঙ্গে পরিচয় করে খুশী হলুম। যাক্, আপনি এই রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে রৌসের দিকে হাঁটুন। রাস্তায় বেরোলেই একটি মেয়ে আপনার কাছে ফুল বিক্রি করতে আসবে। সেই মেয়েটিই আপনাকে কোথায় যেতে হবে তার ঠিকানা দেবে।

আমি আপত্তি করলুম। স্পষ্ট ভাষায় বললুম: আপনার এই বন্দোবস্ত আমার একটুও ভালো লাগছে না।

: আপনাকে যা করতে বলা হচ্ছে সেই নির্দেশ পালন করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

: আমি আপনার কাছ থেকে কোন পরামর্শ চাইনি। আমি শুধু বলছিলুম যে আপনার এই আয়োজন বা বন্দোবস্ত আমার একটুও মনঃপূত নয়।

: যাক্, ভালোমন্দ নিয়ে আমরা বিচার করবো না। মিঃ হুসেন জবাব দিলেন। তারপর আবার বললেন,—ফুলওয়ালী আপনাকে চেনে। অতএব তার সঙ্গে দেখা করতে ভুল করবেন না। আপনার ভালোর জন্যেই কথাটা বলছি।

এই কথা বলে আনোয়ার হুসেন চলে গেলো। না, আনোয়ার হুসেনের সঙ্গে সতীলার বা তার বন্ধুর কোনই সাদৃশ্য নেই। আমি ভাবতে শুরু করলুম আবার কোন জটিল রহস্যে জড়িয়ে পড়লুম।

* * * *

খানিকবাদে আমি রৌসের রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলুম। এলডোরাডো হোটেলের কাছে এসে যখন পৌঁছলুম তখন একটি মেয়ে এসে বলল: ফ্লাওয়ার স্যার।

আমি একটু সচকিত হলুম। না মেয়েটি যে ফুলওয়ালী এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু খুবই অল্প বয়স্ক ও সুন্দরী। দেহে রূপ জগমগ করছে।

: গোলাপ ফুল নেবেন স্যার? মেয়েটি জিজ্ঞেস করে।

: কারনেশন, দুটো কারনেশন। আমি জবাব দিই।

: আপনিই জি-বি-এম? আজ সন্ধ্যে সাতটায় আসরফিয়াতে বারো নম্বর বাড়ীতে যাবেন।

: কিন্তু আসরফিয়া অঞ্চল যে আমি ভালো করে চিনিনে?

: সন্ধ্যে ছটার সময় আপনি রৌসের দোল্চা ভিটা রেস্তোরাঁয় উপস্থিত থাকবেন। আমি আপনাকে নিতে আসবো।

: বেশ, ঠিক সন্ধ্যে ছটায় আমি দোলচা ভিটা রেস্তোরাঁয় উপস্থিত থাকবো। আমি জবাব দিলুম।

* * * *

দোলচা ভিটা রেস্তোরাঁ আপনারা নিশ্চয় চেনেন। রৌসের অঞ্চলের প্রসিদ্ধ রেস্তোরাঁ। আমি ঠিক ছ'টার সময় দোলচা ভিটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে হাজির হলুম। খানিক বাদে মেয়েটি এলো।

: আমার নাম ইয়াসমিন। আমাকে এই নাম ধরেই ডাকবেন, মেয়েটি বলে।

: ট্যাক্সি! আমি একটা ট্যাক্সি ডাকলুম। বললুম: আসরফিয়া অনেক দূর, হেঁটে যাওয়া যায় না।

ট্যাক্সি নিতে মেয়েটি কোন আপত্তি করলো না। রাস্তায় আমাদের কোন আলাপ-আলোচনা হলো না।

বেশ খানিকটা পথ এসে ট্যাক্সি থামলো। পথের নির্দেশ দিচ্ছিলো মেয়েটিই। ট্যাক্সি থামতে আমি বুঝতে পারলুম যে আমরা আসরফিয়া অঞ্চলে পৌছোচ।

: এই হলো আসরফিয়া, মেয়েটি বললো।

: আমি জানি, আমি জবাব দিই। কারণ, এই অঞ্চল আমার বিশেষ পরিচিত। এই অঞ্চলের কতো মেয়ে যে আমার বারে এসে রাত কাটিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

ট্যাক্সি থেকে নেমে আমরা বেশ খানিকটা পথ হাঁটলুম। তারপর বেশ পুরানো একটা বাড়ীতে গিয়ে পৌছলুম। জীবনে বহু উত্তেজনাপূর্ণ সময়ের ভেতরে দিন কাটিয়েছি। কিন্তু আজ এই মেয়েটির সঙ্গে এই বাড়ীতে আসতে আমার মনে যে চাঞ্চল্য জেগেছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

বাড়ীর ভেতর ঢুকে আমরা একটা ছোট ঘরে বসলুম। তারপর মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে বললুম: তারপর?

মেয়েটিও আমার মুখের দিকে তাকালো, কিন্তু কোন জবাব দিলো না।

খানিকবাদে পাশের ঘর থেকে একটি লোক বেরিয়ে এলো। সে আমাকে প্রশ্ন করলো : জি-বি-এম ?

: ইয়েস স্যার, আমি জবাব দিই।

: চলুন।

: কোথায় ? আমি প্রশ্ন করি।

আমার প্রশ্নের কোন জবাব পেলুম না। তাই অন্ধের মতোই লোকটির অনুসরণ করলুম।

মেয়েটি কিন্তু সেই ঘরেই বসে রইলো।

আমরা যে ঘরে ঢুকলুম সে ঘরে আরও একজন মধ্যমবয়সী লোক বসেছিলেন লোকটি যে আরব নন সে বিষয়ে আমার একটুও সন্দেহ ছিলো না। কিন্তু লোকটি দেখতে শুধু সুপুরুষ নয়, বেশ ভারিক্কী প্রকৃতির।

আমাদের আলাপ আলোচনায় কোন ভূমিকা না করেই উনি বললেন : জি-বি-এম, আজ তোমাকে এখানে কী কাজের জন্যে তলব করা হয়েছে নিশ্চয়ই তার পুনরাবৃত্তি করতে হবে না ?

: না, সত্তালা কাজের খানিকটা আভাস আমাকে আগেই দিয়েছে।

: বেশ, এবার তোমার বক্তব্য কী তাই শুনি ? কর্তা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন।

: আমার বলবার কিছুই নেই। শুধু এটুকু বলতে পারি, যে কাজে আমাকে পাঠানো হচ্ছে, সেই কাজে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই।

আমার বক্তব্য শোনার পরে কর্তা আমাকে একটা সিগারেট অফার করলেন। তারপর বললেন : জি-বি-এম, তোমার যে বহু রকমের বিচিত্র অভিজ্ঞতা আছে তা আমি জানি। তাই সত্তালাকে তোমার কাছে পাঠিয়ে জেনে নিতে চেয়েছিলুম যে আমাদের এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার নিতে তুমি রাজী আছো কি না। আমার বিবেচনায় সবদিক থেকেই তুমি আমাদের কাজের উপযুক্ত। তুমি ইণ্ডিয়ান। তুমি হিন্দীতে কথা বলতে পারো, আর-

কিন্তু কর্তার কথা শেষ হবার আগেই আমি জবাব দিই : হিন্দী নয় স্যার, উর্দু।

: হ্যাঁ, বেশ উর্দু। তুমি অকৃতদার। অবিশ্যি মেয়েমানুষের প্রতি তোমার যে যথেষ্ট দুর্বলতা আছে সে কথাটাও আমাদের অবিদিত নয়। এবার বলো, আমাদের কাজ করতে তুমি রাজী আছো কি না ?

: কিন্তু স্যার, আমি প্রথম থেকেই জানতে চাইছি, কী কাজ ?

কর্তা হাসলেন। তারপর বললেন : বিজনেস ফার্ম রিপ্রেজেন্টেটিভ। অর্থাৎ একটি বিদেশী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হয়ে তুমি যাবে। দীর্ঘদিন বাদে দেশে ফিরে যাচ্ছো। কেন ফিরে যাচ্ছো সবাই জানতে চাইবে। তাদের বলবে, রেডিও কোম্পানীর প্রতিনিধি হয়ে যাচ্ছো।

আমি কর্তার কথা শুনে হাসলুম। আমি জানি, আজকাল ভারতবর্ষে কিছুই রপ্তানী করা যায় না। রেডিও তো দূরের কথা। তাই প্রতিবাদ করে বললুম : স্যার, ভারতবর্ষে বিদেশী রেডিও বিক্রি করা যায় না।

হয়তো আমার কথা কর্তার মনে একটু খটকা জাগিয়েছিলো। কিন্তু সে বিচলতা অতি ক্ষণিকের। উনি হেসে জবাব দিলেন : না জি-বি-এম, তোমাকে সাধারণ রেডিও কোম্পানীর প্রতিনিধি করে ভারতবর্ষে পাঠাচ্ছি না। সম্প্রতি চীনের সঙ্গে ভারতের একটা লড়াই হয়ে গেছে। তাই ভারতীয় সামরিক দপ্তর দেশের বিভিন্ন জায়গায় শক্তিশালী রেডিও ট্রান্সমিটার বসাচ্ছেন। ঐসব ট্রান্সমিটার বিদেশ থেকে আমদানী করা হচ্ছে। তুমি ঐ রকম কোন ট্রান্সমিটার বিক্রি করবার চেষ্টা করবে। কিন্তু তোমার আসল কাজ হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই কাজের দায়িত্ব বিভিন্ন লোককে ভাগ করে দেয়া হয়েছে। তারই এক অংশের দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে তোমাকেও।

আমি আবার হাসি। মৃদু মৃদু হেসে এমন ভাব করি যেন তার কথা বুঝতে আমার একটুও অসুবিধে হয় নি।

কর্তা আবার বলে যান : এই কাজের জন্যে তোমাকে বোম্বাই, কলকাতা যেতে হবে। দিল্লীর জিমখানা ক্লাবে গিয়ে তোমার এক পুরানো বন্ধুর দেখা পাবে। তার সঙ্গে আলাপ জমাবে। তোমার বন্ধু তোমার গতিবিধি এবং কার্যকলাপ সম্বন্ধে খবরাখবর রাখেন। অতএব আলাপ জমাতে বেশী কষ্ট হবে না। কিন্তু দিল্লীতে গিয়ে তোমার অন্যান্য পুরানো বন্ধুদের সঙ্গেও দেখা করবে।

আমি দিল্লীর পুরানো বন্ধুদের স্মরণ করবার চেষ্টা করলুম। রামু সোহনী আর রতনলাল আমার বাল্যকালের বন্ধু। শুনেছি রামু দিল্লীতে বেশ বড়ো চাকরি করে। রতনলাল আজকাল ব্যবসা করছে। সোহনী সাংবাদিক। কিন্তু এরা যে সবাই স্পাই একথা আমি কখনই কল্পনা করিনি।

কর্তা বলতে লাগলেন : তোমার কাজ হবে কোডে খবর পাঠানো। তাই দিল্লীতে যাবার আগে ওয়্যারলেসে খবর পাঠানোর কাজটা তোমাকে শিখে নিতে হবে। ট্রেনিং শেষ হলে পরে তুমি এয়ার ইণ্ডিয়ার প্লেনে দিল্লীতে যাবে। যদি বিপদে পড়ো তাহলে তোমাকে আমরা কোন সাহায্য করতে পারবো না।

টাকার জন্য চিন্তা করো না। দিল্লী-বোম্বাই-কলকাতায় আমাদের লোক তোমাকে টাকা দেবে। দুই মাসের জন্যে তোমাকে ভারতবর্ষে থাকতে হবে।

আমি চুপ করে থাকি। কোন জবাব দিই না। জানি প্রতিবাদ করে কোন লাভ নেই। কারণ এ কাজ করতে অস্বীকার করলেও আমাকে বিপদে পড়তে হবে। সেই বিপদ যে কী তার ইঙ্গিতও আমাকে নতীলা আগেই দিয়েছে। ভেবে দেখুন, নাইট ক্লাবের বারম্যানের কতো বিপদ।

* * *

এরপর কয়েকদিন বাদে আমার ওয়ারলেস ট্রেনিং শুরু হলো। মাসখানেক সেই কাজ শিখলুম। সন্ধ্যাবেলায় বারে বসে মদ ঢালি আর দিনেরবেলায় টেলিগ্রামের টরেটক্কা করি।

কোডের কাজ সহজ নয়। শুধু ওয়ারলেস মারফৎ কোড শব্দ পাঠানো হয় না। চিঠিপত্রের ভেতরেও আপনি কোডে খবর পাঠাতে পারেন। ধরুন, আপনি ভারতবর্ষ থেকে চিঠি লিখছেন। কাষ্টমস সেন্সার আপনার চিঠি খুলছে। কিন্তু চিঠির ভেতর আপনি এমন ভাষা ব্যবহার করলেন যাতে কাষ্টমস আপনার কথার অর্থ বুঝতে না পারে। কোড অনেক সময় অঙ্করেও হয়। আপনার সেই কোড অঙ্ক কষে বের করা যায়। এই প্রথার নাম ক্রিপ্টো অ্যানালিসিস।

বেশ কিছুদিন ধরে ওয়ারলেস ট্রেনিং নিলুম। কোন ওয়েভলেংথে যে খবর পাঠাতে হবে তারও নির্দেশ আমাকে দেয়া হলো। বলা হলো, প্রতি খবরের পর ট্রিপল এক্স কোড পাঠাতে হবে। ওয়ারলেসে কাজ করতে গিয়ে জানতে পারলুম আমাকে চীনের হয়ে কাজ করতে হবে।

ছিলুম স্মাগলার হলুম স্পাই। তাও কিনা চীনের স্পাই। এই বিপদের হাত থেকে কী সহজে নিষ্কৃতি আছে? আমাকে দিল্লী-কলকাতা-বোম্বাই থেকে খবর পাঠাতে হবে। কোন্ দেশে জানিনে। বলা হলো, পুরো কাজের ফিরিস্তি দিল্লীতে দেওয়া হবে। একদিন বেটী নাদিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভারতবর্ষে রওনা হলুম।

* * * *

ভোর চারটের সময় তিন পাক ঘুরে পালাম বিমান বন্দরে আমার বোয়িং প্লেন নামলো। বাইরে তখন খুব কনকনে হাওয়া। ওভার কোটটা বেশ ভালো করে জড়িয়ে নিলুম। আমার সঙ্গে বিশেষ কোন মাল নেই। হাতে শুধু একটা ছোট এটাচি কেস। তার ভেতর পাশপোর্ট, টিকিট। জানতে চাইছেন কোন্ পাশপোর্ট ব্যবহার করছি? ভারতীয় পাশপোর্ট। হাজার

হোক দেশে ফিরবার অধিকার আমার আছে। আর শুধু কী তাই। আমার উর্দু উচ্চারণেও কোন খুঁৎ নেই। ফর্ম ভরে আমার পাশপোর্ট পুলিশের হাতে দিলুম। তারপর পকেট থেকে লাইটার বের করে একটা সিগারেট ধরালুম। সময় কেটে গেলো বেশ দ্রুতবেগে। আমার পেছনের যাত্রীদের পাশপোর্টে পুলিশের ছাপ পড়লো। আমি দু'একবার পুলিশের কাছে গিয়ে আমার পাশপোর্টের খবর করলুম।

: আপনি গোবিন্দবিহারী মালকানি? পুলিশের এক কর্তা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন।

এই ধরনের প্রশ্ন শোনা আমার অভ্যেস আছে। হেসে জবাব দিলুম: ইয়েস স্যার। ইণ্ডিয়ান লিভিং ইন বেরুট।

এই বলে সিগারেটে বেশ একটা জোর টান দিলুম। মুখ থেকে প্রচুর ধোঁয়া বের করলুম। আমার জবাব শুনে হয়তো পুলিশের কর্তা একটু বিস্মিত হলেন। কারণ, এতো উঁচু কণ্ঠে জবাব উনি আমার কাছ থেকে আশা করেন নি।

: আপনি যে ভারতীয় তা আমরা জানি। কিন্তু বলুন, কী কাজ করেন আপনি? অর্থাৎ বেরুটে আপনার পেশা কী?

আমি ভাবতে থাকি কী জবাব দেবো। বিজনেস-ম্যান, সার্ভিস না সাংবাদিক। আমার আসল পেশা যে নাইট ক্লাবের বারে বসে মদ ঢালা, সে কথা কী সহজে বলা যায়! বললুম: বিজনেস ম্যান।

পুলিশের কর্তা আমার জবাব শুনে একটু হাসলেন। বললেন: পাশপোর্টে লেখা আছে, প্রফেশন জার্নালিজম।

পুলিশের কর্তার জবাব শুনে আমার চিন্তা বাড়লো। বললুম: স্যার, দেশ থেকে যখন বেরুই তখন এক সংবাদপত্রের প্রতিনিধি হয়ে গিয়েছিলুম। তার পর জার্নালিজম ছেড়ে স্বাধীন ব্যবসা শুরু করেছি।

: কোন্ নিউজ পেপারে কাজ করতেন? আমাকে প্রশ্ন করা হলো।

ভাবতে শুরু করলুম কী জবাব দিই। হঠাৎ বললুম: স্যার মাপ করবেন, আমি যে কাগজে কাজ করতুম সে কাগজ এখন উঠে গেছে।

: তার নাম আপনি নিশ্চয় জানেন?

: ক্যালকাটা অবজার্ভার, আমি গড়গড় করে একটা মিথ্যে কথা বানিয়ে বললুম।

আমার জবাব শুনে পুলিশের কর্তা আরও দু'একবার আমার পাশপোর্ট নেড়ে চেড়ে দেখলেন। তারপর বললেন: অলরাইট।

কাস্টমসের কর্তারা আমাকে বিশেষ জেরা করলেন না। আমাকে বললেন:

আপনি যেতে পারেন।

কাষ্টমসের শেড থেকে বেরিয়ে এসে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে দাঁড়ালুম। ট্যাক্সিতে মালপত্র ওঠালুম। আমাকে ইম্পিরিয়াল হোটেলে থাকতে হবে।

ট্যাক্সিতে উঠতে যাচ্ছি এমন সময় পুলিশের কর্তা এসে আবার কাছে দাঁড়ালেন। তারপর মৃদুকণ্ঠে বললেন: জি-বি-এম, মাঝে মাঝে অতি চালাকেরও গলায় দড়ি পড়ে।

আমি বিস্মিত হয়ে তার পানে তাকাই। লোকটা বলে কী? অতি চালাকের গলায় দড়ি। এই কথার মানে কী? আমি কোন প্রশ্ন করবার আগেই উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন। অথচ পাশপোর্টটি আপনি রিনিউ করান নি। আমার কী মনে হয় জানেন! আপনার পাশপোর্টটি জাল।

আমি তার কথা শুনে স্তম্ভিত হলুম। আমার সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা বরফ হয়ে গেলো। কী জবাব দেবো ভেবে পেলুম না। কিন্তু আমি কিছু বলবার আগেই উনি বললেন: কোথায় থাকছেন? ইম্পিরিয়াল হোটেলে? বেষ্ট অব লাক।

পুলিশের কর্তা চলে যেতে আবার আমার ভাবনা শুরু হলো। বলে কিনা আমার পাশপোর্ট জাল!

কথাটি অবশ্যি সত্যি। কারণ, কয়েক বছর আগে আমি ব্রিটিশ পাশপোর্ট নিয়েছিলুম। পরে একবার ভারতীয় পাশপোর্ট নেবারও চেষ্টা করেছিলুম। কিন্তু ভারতীয় পাশপোর্ট পাইনি। তাই আমাকে পাশপোর্ট জাল করতে হয়েছিলো। কিন্তু জাল পাশপোর্টের মেয়াদ তো আর বাড়ানো যায় না। আর সত্যি কথা বলতে কী, পাঁচ বছর বাদে বাদে পাশপোর্ট যে নতুন করে বানাতে হয় ঐ নিয়ম আমি ভুলেই গিয়েছিলুম। আমার পাশপোর্ট জাল একথা জানা সত্বেও পুলিশের কর্তা আমাকে কেন গ্রেপ্তার করলেন না? কেন আমাকে ছেড়ে দিলেন? এইসব অবান্তর কথা ভাবতে ভাবতে আমার মাথা গরম হয়ে উঠলো। কিন্তু ট্যাক্সির দরজা খুলে তো আর বেশীক্ষণ দাঁড়ানো যায় না, তাই ট্যাক্সীওয়ালাকে বললুম: হোটেল ইম্পিরিয়াল।

*   *   *   *

দশ বছর বাদে দিল্লী শহর আমার কাছে নতুন বলে মনে হলো। রাস্তার নাম পালটে গেছে, অসংখ্য নতুন দোকান গজিয়ে উঠেছে। আমার মনে হলো এই শহরে আমি যেন মুসাফিব। ইংরেজিতে আপনারা যাকে বলেন ট্যুরিষ্ট।

ইম্পিরিয়াল হোটেলে এসে আস্তানা গাড়লুম। কিন্তু আমার প্রথম কাজ হলো পুরানো বন্ধুদের খবর নেয়া। রামু, রতনলাল এবং মোহনীর নাম ঠিকানা আমার নোট বইতে লেখা ছিলো। ঠিক করলুম ওদের বাড়ীতে গিয়ে হানা

দিতে হবে।

সেদিন রাত্রে দিল্লীর জিমখানা ক্লাবে গিয়ে বসলুম। কুড়ি বছর আগে এই ক্লাবে কী আমার ঢুকবার অধিকার ছিলো! তখন এই ক্লাবে সাহেব মেম-সাহেব গিসগিস করতো। দূর থেকে আমরা তাদের সেলাম কাটতুম। তাই আজ বারে বসে বেশ কড়া মেজাজে হুকুম দিলুম: হুইস্কি অন দি রক্‌স।

: আপনি মেম্বার স্যার? বেয়ারা এসে আমাকে বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো।

আমার ভুরু একটুও কুচকালো না: নিশ্চয়, নিশ্চয়। আমি পনের বছরের পুরানো মেম্বার। বেশ একটু রুক্ষ স্বরেই জবাব দিলুম। আর জবাব দিয়েই নিজের পকেটে হাত দিলুম। ভাবটা এমন করলুম যেন মেম্বারশিপ কার্ডটা বের করতে যাচ্ছি। এরপর বারম্যান আর কোন প্রশ্ন করলো না।

সবেমাত্র হুইস্কির গ্লাস নিয়ে বসেছি এমন সময় পেছন থেকে কে যেন আমায় গায়ে হাত দিয়ে বললো: বাই জোভ, জি সি-এম, তুমি এখানে? তোমাকে কোনদিন যে দিল্লীতে দেখবো এ আমি কল্পনাও করিনি। কবে এলে? কী করছো?

আজ প্রায় পাঁচ বছর বাদে মানিকলালের সঙ্গে দেখা। না, মানিকলাল একটুও বদলায় নি। তাছাড়া তার চেহারা দেখলে কে বলবে যে তার বয়েস হয়েছে? কতো বয়স হবে মানিকলালের? চল্লিশ, পঞ্চাশ। যতোই হোক না কেন, মানিকলালকে দেখলে মনে হয় তার বয়স ত্রিশ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ঈজিপ্টে সর্বপ্রথম আমার সঙ্গে মানিকলালের পরিচয়। আমি ছিলুম ক্যানটিনের ম্যানেজার। মানিকলাল পাইলট। আমার কাছ থেকে মানিকলাল অনেক সময় সস্তায় জিনিসপত্র কিনতো। কায়রোতে থাকা কালীন আমরা দুজনেই সন্ধ্যার পর সফরে বের হতুম। কতো রাত্রে যে আমরা দুজনে একসঙ্গে রাত কাটিয়েছি তার হিসেব নেই।

আজ জিমখানা ক্লাবে মানিকলালকে দেখে একটু অবাক হলুম। মানিকলাল যে আমার বন্ধু একথা একবারও আমার মনে জাগেনি। প্রায় পাঁচ বছর আগে হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার পর দামাস্কাস শহরে আমার সঙ্গে মানিকলালের দেখা হয়েছিলো। লণ্ডন থেকে প্লেন নিয়ে আসছিলো মানিকলাল। প্লেন খারাপ হবার দরুন বাধ্য হয়ে রাতটা দামাস্কাসে কাটাতে হয়।

সেদিন রাত্রে নাইট ক্লাবে হঠাৎ তার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো। আমি একটি আরব মেয়েকে নিয়ে খোস গল্প করছিলুম, এমনি সময় মানিকলাল আমার গায়ে

হাত দিয়ে বললো : মালকানি।

না, সেদিনকার মানিকলালের আর আজকের মানিকলালের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

: মানিকলাল ? আমি সেদিন কৌতূহলী হয়ে তাকে প্রশ্ন করেছিলুম।

: ডিয়ার ফ্রেণ্ড, মাই বিলাভেড ফ্রেণ্ড, তোমার বান্ধবীর সঙ্গে একবার পরিচয় করিয়ে দাও না।

বলুন, এরপর আর কী করা যায়। বান্ধবীর সঙ্গে মানিকলালের পরিচয় করিয়ে দিলুম।

ব্যস এরপর আর কোনদিন সেই বান্ধবীর খোঁজ পাইনি। কাজেই মানিক--লালের ওপরে আমার বেশ রাগ হয়েছিলো। আজ আবার জিমখানা ক্লাবে মানিকলালের দেখা পাওয়া ছিলো আমারও কল্পনার অতীত।

: বাই জোভ, জি-বি এম মাই ওল্ড ফ্রেণ্ড। সত্যিই, আই নেভার থট যে তোমাকে ভারতবর্ষে দেখতে পাবো।

আমি প্রথমটায় চুপ করে থাকি। হয়তো মানিকলাল বুঝতে পারে যে আমি রেগেছি। তাই কণ্ঠস্বরে একটু অনুনয়ের সুর মিশিয়ে বললো : সেদিনকার ঘটনা দেখছি এখনও ভুলে যাওনি। আরে আমি কী ছাই জানতুম যে মেয়েটি আমার সঙ্গ নেবে ? দামাস্কাস থেকে বেরুটে এলুম। মেয়েটিও আমার সঙ্গে এলো। অসুখের ভাঁওতা করে প্রায় সপ্তাহখানেক বেরুটে ছিলুম। মেয়েটিও সঙ্গে ছিলো। তারপর আমি চলে যাবার পর মেয়েটি ইস্তাম্বুলে চলে যায়। নেভার মেট হার এগেন। থাক অতীত দিনের কথা ভুলে যাও ভাই। এবার বলো কী উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে এসেছ ?

: বিজনেস, আমি খুবই সংক্ষিপ্ত জবাব দিই।

: স্মাগলিং। গোল্ড অর কারেন্সি ?

মানিকলাল সহজ ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করলো। যেন আমার পেশা ও নেশা সম্বন্ধে ও বিশেষ পরিচিত।

: না, স্রেফ বিজনেস। রেডিও ট্রান্সমিটার আর ওয়ারলেসের বাজার দেখতে এসেছি।

: কোন্ কোম্পানী, ইংরেজ না আমেরিকান ?

: জার্মান। ফাইনাজড বাই কুযেটি, জবাব দিলুম।

আমার কথা শুনে মানিকলাল হাসে। বলে : শুনে সুখী হলুম। থাক্ ক'দিন দিল্লীতে থাকছো ?

: এখনও সঠিক বলতে পারবো না। আমার কাজের ওপর তা নির্ভর করছে।

মানিকলাল বারম্যানকে ডেকে বললো : হ্যাভ এনাদার ড্রিংক।

আমি প্রতিবাদ করে বলি : না না, আজ আর আমি ড্রিংক করবো না।

: আবার কবে দেখা হচ্ছে ? কোথায় আছো ?

মানিকলালকে আমি এড়াতে চাই। ওর সঙ্গে দেখা করবার আমার একেবারেই ইচ্ছে নেই। কায়রোতে ওকে নিয়ে আমাকে কম হাঙ্গামা পোহাতে হয় নি। তাই জবাব দিলুম : আবার কবে দেখা হবে বলতে পারছি নে। তবে জিমখানা ক্লাবে নিশ্চয় দেখা হবে। তুমি আজকাল কী করছো ?

আমার প্রশ্ন শুনে মানিকলাল একটু গম্ভীর হলো। বেশ খানিকটা সময় আমার প্রশ্নের কোন জবাব দিলো না। তারপর বললো : ফ্লাইং ছেড়ে দিয়েছি। বেরুটের সেই মেয়েটিকে নিয়ে আমারও কম হাঙ্গামা পোহাতে হয় নি।

: মানে ? আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করি।

: অতো প্রশ্ন করো না। একদিন বেরুটের এক উকিলের কাছ থেকে এক নোটিশ পেলুম যে মেয়েটি অন্তঃসত্বা। বাস্, এই ব্যাপার নিয়ে তুমুল হৈ-হল্লা হলো। সরকারের কানেও কথাটি গেলো। বড়ো-কর্তারা সন্দেহ করলেন যে অসুখের নাম করে বেরুট শহরে থাকাটা একেবারেই ভুয়ো কথা। বাস্, আমার বিরুদ্ধে ডিসিপ্লিনারী এ্যাকশান নেওয়া হলো। বলা হলো, আমাকে অফিসে কাজ করতে হবে। সেই থেকে আমি গ্রাউণ্ডে কাজ করছি।

: তোমার কাহিনী শুনে ভাই বড়োই দুঃখিত হলুম, আমি জবাব দিই। কিন্তু মনে মনে আমি বেশ খুশিই হয়েছিলুম। কারণ দামাস্কাসের সেই রাত্রের ঘটনা আমি তখনও ভুলে যাইনি।

: যাক্, কোথায় উঠেছো ? মানিকলাল আবার জিজ্ঞেস করে।

তার প্রশ্নকে আমি এড়িয়ে যাই। কোনও জবাব দিই না। মানিকলালের সঙ্গে খাতির জমানো মানে বিপদ ডেকে আনা। হাজার হোক মানিকলাল বর্তমানে এক উচ্চপদস্থ সহকারী কর্মচারী।

আমি বার থেকে উঠে দাঁড়ালুম। মানিকলাল এবার কাছে এসে মৃদুকণ্ঠে বললো : নেভার মাইণ্ড, আমাকে তোমার দরকার হবে। আবার দেখা হবে। বাই-বাই···

* * *

তারপর বেশ কয়েকটা দিন দিল্লী শহরে ঘুরে বেড়ালুম। প্রতিদিনই বগলে কয়েকটা ফাইল নিয়ে বেরুতাম। ইনফরমেশন কাউণ্টারে বলে রেখেছিলুম যে যদি কেউ আমার খবর নেয়, তবে তার টেলিফোন নম্বরটা যেন রেখে দেয়া হয়। কিন্তু চারদিনের ভেতরও কেউ আমার খোঁজ-খবর করেনি।

আর একদিন জিমখানা ক্লাবে গেলুম। আজ আমার মেম্বারশিপ কার্ড নিয়ে কেউ কোন প্রশ্ন করলো না। বারম্যান বললো : কী নেবেন স্যার ?

: ব্লাডী মেরী, আমি জবাব দিলুম। খানিক বাদে ড্রিংকস এলো। আমি সবেমাত্র গ্লাসে চুমুক দিয়েছি এমনি সময় পাশের একটি লোক বললো : এ ড্রিংকস কিন্তু আমারও ভারী পছন্দ। ব্লাডী মেরী।

তার কথার কোন জবাব দিলুম না। লোকটি নিজের থেকে আলাপ করতে শুরু করলো। বললো, আমার নাম মাধবন নায়ার।

মাধবন নায়ার নামটি শুনে আমি বেশ একটু আতঙ্কিত হলুম। কারণ, আমার মনে হলো এই নামটি যেন আমার কাছে পরিচিত। আমার সহকর্মী স্মাগলারদের কাছে এই নামটি বহুবার শুনেছি। কিন্তু ঘাবড়াবার পাত্তর জি-বি-এম নয়। বেশ স্পষ্ট গলায় বললুম : আমার নাম জি-বি-মালকানি। বিজনেসম্যান। বিদেশে থাকি। দেশে মার্কেট সার্ভে করতে এসেছি।

: কী বিক্রি করেন ? মাধবন নায়ার জিজ্ঞেস করলো।

: রেডিও স্পেয়ার পার্টস, আমি জবাব দিই। আপনি কী ? প্রশ্ন করি।

: স্পাই। এই বলে মাধবন নায়ার যেন জোরে হেসে উঠলো। তারপর বললো, আমি স্মাগলারদের ধরে বেড়াই। অর্থাৎ হোম মিনিষ্ট্রিতে কাজ করি।

মাধবন নায়ারের জবাব শুনে আমি সত্যিই একটু চিন্তিত হলুম। কী কারণে সে আমাকে বললো যে স্মাগলারদের পেছু নেওয়াই তার কাজ! তাহলে মাধবন নায়ার কী জানতে পেরেছে যে গোবিন্দবিহারী মালকানিও স্মাগলার। আমার সঙ্গে যেচে আলাপ করার কি কারণ, জানিনে! ব্লাডী মেরী যেন আমার গলার ভেতর দিয়ে ঢুকলো না।

একটু বাদেই বুঝতে পারলুম যে জি-বি-এম-এর আসল পরিচয় এখনও মাধবন নায়ার পায়নি।

আমাদের আলাপ-আলোচনা ক্রমেই গভীর হলো। কাজের খাতিরে মাধবন নায়ারকে প্রায়ই দেশের বাইরে যেতে হয়। সে বিদেশের সঙ্গে দেশের তুলনা করলো। মাঝে মাঝে তার দু' একটা কথার জবাব দিলুম।

মাধবন নায়ার এবার মেয়ে মানুষ নিয়ে গল্প শুরু করলো। মেয়ে মানুষের গল্পে আমি সবজান্তা। তাই বেশ বিজ্ঞের মতো সমস্ত কথার জবাব দিতে লাগলুম।

মাধবন নায়ার বললো : মালকানি, মেয়ে মানুষ আমার জীবনে টিকতে চায় না।

আমি একটু গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করি : তার মানে ?

: এই দেখুন না, প্রায় দুবার বিয়ে করলুম, দুটো বিয়েই খোপে টিকলো না। তাই ঠিক করেছি আর মেয়েদের কাছে মাথা নত করবো না। আপনি বিয়ে করেছেন জি-বি-এম? মাধবন নায়ার জিজ্ঞেস করে।

প্রশ্ন শুনে আমি হাসলুম। কারণ, জীবনে এতো মেয়ে মানুষের সংস্পর্শে এসেছি যে কারও দায়িত্ব নেবার প্রয়োজন মনে করিনি। বেরুটে আমার নাইট ক্লাবে প্রবাদ ছিলো—জি-বি-এম এবং লে গার্লস একেবারেই অভিন্ন হৃদয়।

আমি মাধবন নায়ারের প্রশ্নের কোন জবাব দিলুম না। মৃদু হাসলুম। হয়তো আমার হাসির কোন তাৎপর্য ছিলো। মাধবন নায়ার আমার মনের কথা বুঝতে পারলো। তাই এ প্রশ্ন নিয়ে কোন প্রশ্ন তুললো না।

আমি সবেমাত্র দু' গ্লাস হুইস্কি টেনেছি, এমনি সময় মানিকলাল এসে উপস্থিত হলো। বললো: বাই জোভ জি-বি-এম, তুমি? গ্লাড টু সী ইউ এগেন। আমি জানতুম আমাদের দেখা আবার হবেই।

আমি মাধবন নায়ারের সঙ্গে মানিকলালের পরিচয় করিয়ে দিলুম। বললুম: এ মিষ্টিরিয়াস ম্যান।

: অর্থাৎ। মানিকলালের কণ্ঠে ছিলো বিস্ময়।

: এ ম্যান হু নোজ টু মাচ,—অর্থাৎ সবজান্তা আদমী। হি ওয়ার্কস ইন দি হোম মিনিষ্ট্রি।

ক্ষণিকের জন্য মানিকলালের মুখ যেন গম্ভীর হলো। কিন্তু একটু বাদেই নিজেকে সামলে নিয়ে সে বললো: গ্ল্যাড টু মীট ইউ স্যার। আমার নাম মানিকলাল।

আরো দুই পেগ হুইস্কি এলো। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা আর মুখ-খিস্তি শুরু হলো। আমাদের আসর বেশ জমে উঠলো।

খানিকবাদে মাধবন নায়ার বললো: থ্যাঙ্কস জি-বি এম। দিল্লীতে নিশ্চয় কিছুদিন থাকবেন। তাহলে আবার দেখাও হবে নিশ্চয়। একদিন আসুন না আমার বাড়ীতে। বেশ আরাম করে মুখখিস্তি করা যাবে। লোদী রোডে আমি থাকি।

মাধবন নায়ার চলে গেলো। আমি ভাবতে লাগলুম। সতীলা এবং তার কর্তা বলেছিলো যে ভারতবর্ষে তাদের লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। কিন্তু আজ অবধি কেউ আমার খোঁজ করে নি। বরং একজন স্মাগলিং দপ্তরের কর্তা ও অপর একজন মাতাল এমন দুজনের সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় হলো। পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে যে কী করে যোগাযোগ করা যায় এইটে ভাবতে লাগলুম।

আবার আর এক দফা হুইস্কি এলো।

মানিকলাল তার পকেট থেকে সিগারেট বের করলো। বললো: মারলবরো।

মানিকলালের মুখে মারলবরোর নাম শুনে বিস্মিত হলুম। না, কোন সন্দেহ নেই যে মানিকলালই হলো সতীলার দলের লোক। কারণ, প্রথমেই আমাকে বলা হয়েছিলো যে মারলবরো হলো আমাদের কোড শব্দ। অর্থাৎ যারা সতীলা এবং চীনে-এর হয়ে কাজ করবে তারাই মারলবরো সিগারেট অফার করবে।

অতএব মানিকলালই যে আমার ভারতীয় যোগাযোগ এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ রইলো না।

আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলুম: মানিকলাল!

: ছাটস রাইট। আমি জানতুম এ কাজের জন্য কর্তারা তোমাকে পাঠাচ্ছেন। শুধু তাই নয়, আমাদের দুজনকে একসঙ্গেই কাজ করতে হবে।

কর্তা! কে? আমি বিস্মিত ও কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করি।

: জানিনে। আমার কাছে নির্দেশ আসে কী করতে হবে। আমি নির্বিবাদে সেই কাজ করে যাই। তার পরিবর্তে ব্যাঙ্কে আমার একাউণ্টে টাকা জমা হয়।

: অর্থাৎ তুমি হুকুম তামিল করো?

: ঠিক বলেছ। মাসখানেক আগে আমাকে বলা হয়েছে যে কোন এক বিশেষ কাজের জন্যে তোমাকে ভারতবর্ষে পাঠানো হচ্ছে। অবিশ্যি এমন নয় যে এই দেশে এই ধরনের কাজের জন্যে লোক পাওয়া যায় না। বিস্তর লোক ছিলো। পুলিশের সন্দেহ এড়াবার জন্যই বেরুট থেকে তোমাকে পাঠানো হলো। আরও কারণ, এই ধরনের কাজে তুমি দক্ষ।

: তুমি আমার কাজের কী জানো?

: কিছুটা জানি, সম্পূর্ণ নয়। কারণ আমাদের কাজে তো আর পুরো কাজের ফিরিস্তি দেয়া হয় না।

: তুমি জানবার চেষ্টা করোনি? আমি প্রশ্ন করি।

: প্রয়োজন বোধ করিনি। আমি টাকা পাই কাজ করি। পাঁচ বছর আগে বেরুটের সেই মেয়ে ঘটিত ব্যাপারে আমি জড়িত হয়ে পড়েছিলুম। জানিনে কী করে চীনের কর্তারা সেই খবর পেলো। ব্যস, সেই থেকে ওরা আমাকে ব্ল্যাকমেলিং করা শুরু করলো। একবার যখন ফাঁদে পা দিয়েছি তখন সারা জীবন এর ফল ভোগ করতে হবে। থাক্, আমার কথা বললুম। এবার

বলো, তুমি এদের সঙ্গে কী করে জড়ালে ?

: একই গল্প বন্ধু, একই গল্প। মেয়ে মানুষের প্রতি আমার চিরন্তন দুর্বলতা তোমার অজানা থাকার কথা নয়। জীবনে কখন এবং কবে কোন মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছি, কার সঙ্গে কোথায় আমার ছবি উঠিয়েছি, কবে কার কী সর্বনাশ করেছি সবই ওদের খাতায় লেখা ছিলো। ব্যস, আজ ওরা সেই সব অতীত কাহিনীর পুরানো কাসুন্দী ঘেটে আমার টিকি ধরে টান দিয়েছে।

মানিকলাল আমার কথা শুনে চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর খানিক বাদে বললো : কাল এসো আমার বাড়িতে। আমি বিনয় নগরে থাকি। সরকারী ফ্ল্যাট। লেট আস হ্যাভ ডিনার টুগেদার। আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

* * *

মানিকলাল তার বাড়ীর ঠিকানা দিয়েছিলো। অতএব সন্ধ্যার পর তার বাড়ী খুঁজে নিতে আমার কষ্ট হয় নি।

ঠিক আটটায় মানিকলালের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলুম। মিসেস মানিকলাল দোর খুলে দিলেন। মিসেস মানিকলালকে আগে আমি কখনও দেখিনি। তাই বেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে মিসেস মানিকলালের পানে তাকালুম। কতো বয়েস হবে ? ত্রিশ পঁয়ত্রিশ। না, কোন ভুল নেই। মিসেস মানিকলাল বয়সের তুলনায় দেখতে অনেক বেশী বয়স্কা। মানিকলাল এক গাল হেসে আমাকে অভ্যর্থনা করলো। বললো : বাড়ী খুঁজে বের করতে অসুবিধে হয়নি তো ?

বললাম : বাড়ীর নম্বর জানা থাকলে আমি নরকেও বাড়ী খুঁজে বের করতে পারি। তারপর একটু মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলুম : তোমার কাজকর্মের হিসেব-নিকেশ গিন্নীও রাখেন নাকি ?

: পাগল হয়েছ ? সমস্ত কথা কী আর মেয়েদের কাছে খুলে বলা যায় ! মানিকলাল প্রতিবাদ করে বললো।

: তোমার গিন্নীকে দেখে মনে হচ্ছে যে আমাকে দেখে উনি খুব খুশি হননি। হয়তো ওর মনে কোন সন্দেহ জেগেছে, আমি জবাব দিই।

: এ নিয়ে চিন্তা করো না। ভয় পাবার কিছু নেই।

: আশ্চর্য মানিকলাল ! আমরা দুজনেই বেগার খাটছি। পয়সার লোভে লোকে স্পাই-এর কাজ করে। কিন্তু আমরা দুজনে ব্ল্যাকমেলিং-এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে এই নোংরা কাজ শুরু করেছি। অবিশ্যি এ নিয়ে আমার মনে কোন খেদ নেই। স্পাইং আর স্মাগলিং দুই-ই সমান আমি বলি।

মানিকলাল আমার কথা চুপ করে শুনলো, তারপর বললো : আজ তোমাকে

নার এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো। উনিও আমাদের সঙ্গে কাজ করছেন।

: কী কাজ? আমি এবার একটু কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করি।

: উনি ডিফেন্স দপ্তরে কাজ করেন। শুধু তাই নয়, দপ্তরের সমস্ত গোপনীয় খবরাখবর আমরা ওর মারফৎ পাই।

খানিক বাদে ভদ্রলোক এলেন। ভদ্রলোকের নাম সমীর সেন। বিবাহিত। স্ত্রী সুন্দরী।

হ্যাঁ, স্বীকার করবো মিসেস সেন বিশেষ সুন্দরী। জীবনে নাইট ক্লাবের বহু মেয়ে নিয়ে ঘাটাঘাটি করেছি। মিসেস সেনের মতো সুন্দরী ভদ্র মহিলা আমি কখনই দেখিনি। তার দেহে মাদকতা আছে। চোখে আছে কৌতূহল। আমি বলবো মিসেস সেনকে দেখেই আমি তার প্রেমে পড়েছিলুম।

কিছুক্ষণ আলাপের পর আমার সমস্ত সংকোচ-দ্বিধা কেটে গেলো। দেখতে পেলুম মিসেস সেন শুধু আলাপী নন, পবাণ আকৃষ্ট করবার যথেষ্ট ক্ষমতাও রাখেন।

কয়েক মুহূর্তের জন্য মেয়েরা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। মানিকলাল হেসে বললো: আমরা তিনজনেই হলুম স্পাই। কখনও কল্পনা করিনি যে দেশের বুকে বসে চীনি ভাইদেব জন্য স্পাই-এর কাজ করবো? স্ট্রেঞ্জ!

সমীর সেন মানিকলালের কথা শুনে হাসলো। আমি ভাবলুম, মানিকলালেব কথার ভেতর হাসবার কিছু কারণ ছিলো না। তাহলে সমীর সেন হাসলো কেন? সমীর সেন আবাব বললো: তোমার এই প্রশ্নের কোন মানে বুঝতে পারলুম না। কারণ, আমাদের এই কাজের ভেতর আর নতুন কোন কৌতূহল নেই। হয়তো এই কাজ কববার আগে আমার একটু দ্বিধা সংকোচ হয়েছিল। আজকাল এই কাজ নিয়ে সামান্য আলোচনাও আর করিনে।

: তার প্রধান কারণ তুমি টাকার জন্য কাজ করছো। এ কাজ থেকে মুনাফা পাচ্ছো। আমরা দুজনেই নিরুপায় হয়ে কাজ করছি। এ কাজ থেকে আমরা টাকা রোজগার করতে চাইনে। মানিকলাল বলল।

সমীর সেন আবার মৃদু হাসলো। তারপর বললো: হ্যাঁ, আমি অর্থের জন্য খাটছি বটে কিন্তু একটা কথা ভুলে যেও না, আমার কাজে বিপদের ঝুঁকি সব চাইতে বেশি।

: কাজের গুরুত্ব নিয়ে আজ আমরা তর্ক-বিতর্ক কবতে চাইনে। কী উপায়ে আমবা সংবাদ সংগ্রহ করবো এবং কী করে সেই সংবাদ বেতারে পাঠাবো, তাই নিয়েই আলোচনা করা যাক।

এবার আমার জবাব দেবার পালা। বলি : আমাকে তোমরা খবর দেবে। সেই খবর আমি কোডে পাঠাবো।

এই কথা বলে আমি চিন্তা করতে শুরু করি। আমাকে বেতারে খবর পাঠাতে বলা হয়েছে সত্যি, কিন্তু কোথায়, কোন ওয়েভলেংথে যে খবর পাঠাতে হবে, সে কথা আমাকে বলা হয়নি। তাই একটু কৌতূহল প্রকাশ করে বলি : আমাকে বলা হয়েছিলো যে দিল্লীতে পৌছবার পর বেতারে খবর পাঠাবার ওয়েভলেংথ আমাকে জানানো হবে। আজ অবধি কেউ আমাকে সেই ওয়েভলেংথ-এর কথা জানায় নি।

আমার কথা শুনে সমীর সেন হাসলো। বললো : এর কারণ, আজ অবধি খবর পাঠাবার কোন প্রয়োজন হয়নি।

মানিকলাল একটু গম্ভীর হযে বললো : জি-বি-এম, ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশন অর্থাৎ এফ. এম. খুবই সর্ট ওয়েভেলেংথ এ খবর পাঠাতে হবে।

আমি মানিকলালের কথা শুনে একটু বিস্ময় প্রকাশ করি। বলি : এতো সর্ট ওয়েভলেংথে। আশ্চর্য! আমাদের খবর রিসিভ করা হবে কোথায়?

: এইখানে। মানে দিল্লীর চীনি দূতাবাসে। আমাদের খবর ওখান থেকেই কোডে পিকিং-এর কর্তাদের কাছে পাঠানো হবে।

আমার বিস্ময় উত্তেজনা বাড়ে। বলি : চীনি দূতাবাসে! তুমি কী বলছো মানিকলাল?

: আমি যা জানি তাই তোমাকে বলছি জি বি-এম। হাজার হোক আমাদের ট্রান্সমিটার শক্তিশালী নয়। কিন্তু দূতাবাসের ট্রান্সমিটার খুবই শক্তিশালী।

: অর্থাৎ আমরা যে খবর পাঠাচ্ছি, সেই খবর দিল্লী শহরের বুকে বসেই চীনিরা টুকে নিচ্ছে।

: ঠিক বলেছেন জি-বি-এম। জানেন তো, আজকাল পুলিশ চীনি দূতাবাসের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে। অর্থাৎ দূতাবাসের ভেতর কে এলো কে গেলো সব কিছুর উপর তাদের নজর আছে। তাই পুলিশের নজর এড়িয়ে এইভাবে বেতারে সংবাদ পাঠাবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

সমীর সেন বলতে লাগলো : যাক্, দুই একদিনের ভেতর আমি বেশ একটি মূল্যবান খবর সংগ্রহ করতে পারবো। মানে বর্ডার এরিয়া নিয়ে এক বিশেষ কমিটির রিপোর্ট।

আমি জিজ্ঞেস করি : কতো পাতা?

: প্রায় দেড়শ' পাতা হবে। সিক্রেট ডকুমেন্ট। খুব বড়ো উচ্চপদস্থ

কর্মচারীর কাছে এই রিপোর্ট পেশ করা হচ্ছে। পুরো রিপোর্টটাই বেতারে পাঠাতে হবে। জি-বি-এম, বলুন, এ কাজ করতে পারবেন তো?

সমীর সেনের কথা শুনে আমি একটু বিরক্তি প্রকাশ করলুম। আমার কর্মদক্ষতা সমন্ধে সমীর সেন এখনও ওয়াকিবহাল হয়নি।

মানিকলাল বললো: অবশ্যি জি-বি-এম এই কাজ করতে না পারলে এই রিপোর্ট মাইক্রোডটে পাঠাতে পারি।

সমীর সেন জবাব দিলো: মাইক্রোডটে এই রিপোর্ট পাঠাবার অনেক অসুবিধে আছে। প্রথমতঃ চীনি দূতাবাসের প্রতিটি চিঠিপত্রই পোষ্ট অফিসের কর্তারা সেন্সর করছেন। মাইক্রোডটের রেওয়াজ আজকাল আর কারু অজানা নয়। যাক্‌, জি-বি এম ই বলুন, এই সংবাদ আপনি রেডিওতে পাঠাতে পারবেন কি না?

আমি বেশ গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিই। বলি: আপনি রিপোর্ট সংগ্রহ করুন। কোডে পাঠাবার ব্যাপার নিয়ে অনর্থক মাথা ঘামাতে হবে না।

: আপনার কথা শুনে নিশ্চিন্ত হলুম, সমীর সেন জবাব দিলো।

মানিকলাল বলে: বেশ, রিপোর্ট সংগ্রহ হলেই আমরা জি-বি-এম-কে খবর দেবো। তারপর কখন এবং কোথা থেকে এই খবর ট্রান্সমিট করতে হবে এ নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

: আমি সময় নষ্ট করতে চাইনে। আমি জবাব দিই।— কারণ খুব বেশীদিন আমার এই দেশে থাকার ইচ্ছে নেই। বিপদ বাড়তে পারে।

: এই রিপোর্ট পাঠাতে কতোক্ষণ সময় লাগবে? সমীর সেন জিজ্ঞেস করে।

আমি নিজের মনে মনে অঙ্ক কষতে লাগলুম। দেড়শো পাতার রিপোর্ট। প্রতি দশপাতা পাঠাতে একঘণ্টা লাগে। তার মানে পনেরো ঘণ্টার কাজ। তাই বললুম,

: এ হলো দুদিনের কাজ। এক সিটিং এ এ কাজ করা সম্ভব নয়।

: আশ্চর্য! সমীর সেনের কণ্ঠে ছিলো বিস্ময়ের স্বর।— মানিকলাল, আমি কখনই ভাবিনি এ রিপোর্ট পাঠাতে দুদিন সময় লাগবে। এর মানে
লা দুদিনের জন্যে রিপোর্টটা দপ্তরের বাইরে থাকবে। না, এ কাজে একটু
ঝুঁকি সব ... আছে।
... কলাল বললো: এ কাজের বিন্দুবিসর্গও আমি জানিনে। আমি
: কাজের ... ান। অর্থাৎ জি-বি এম এবং তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া
উপায়ে আমর কাজ।
পাঠাবো, তাই কি? সমীর সেনের কণ্ঠে ছিলো কৌতূহল ও বিস্ময়।

: না, শুধু তাই নয়। ছোট খাটো কাজ সবই আমাকে করতে হবে, জবাব দিলো মানিকলাল।

সমীর সেন বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বললো: আমি জানতুম মানিকলাল, তোমাকে দিয়ে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্ভব নয়। তোমাকে অপদার্থ বললে আমি আপত্তি করবো না। যাক্, তবু তোমাকে দিয়েই আমাদের কাজ চালাতে হবে। এবার সমীর সেনের কণ্ঠে দৃঢ়তার স্বর ছিলো।

মানিকলাল সমীর সেনের কথা শুনে হাসলো। তারপর বললো: এ কাজ করার আমার একটুও ইচ্ছে ছিলো না। কিন্তু আমি নিরুপায়। তাই আমাকে এই নোংরা কাজ করতে হচ্ছে।

মানিকলালের কথা শুনে হাসি পেলো। বললাম: থাক, এই নিয়ে ঝগড়া করে লাভ নেই। আমাদের আসল কাজে ব্যাঘাত ঘটবে।

: এ কাজ করতে আমাকে বাধ্য করা হচ্ছে,—জবাব দিলো মানিকলাল।

এরপর বেশ খানিকক্ষণ সবাই চুপ করে রইলো। কেউ কোন কথা বললো না। কিন্তু ঘরের নিস্তব্ধতা ভাঙলো সমীর সেন। বললো: বেশ আজ থেকে পাঁচদিন বাদে আমরা গেলর্ড রেস্তোরাঁয় দেখা করবো।

: অর্থাৎ আমরা প্ল্যান ঠিক করবো, আমি বললুম।

মানিকলাল সংক্ষিপ্ত জবাব দিলো, বললো: আমার কোন আপত্তি নেই। কখন দেখা হবে? ডিনারে না লাঞ্চে?

: ডিনার, জবাব দেয় সমীর সেন।

: রাত সাড়ে আটটায়, আমি বলি।

আমাদের আলাপ আলোচনায় বাধা পড়লো। মানিকলালের স্ত্রী এবং মিসেস সেন ফিরে এলো।

মিসেস সেনের পানে আমি বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে ছিলুম। জানিনে কেন তার দেহ আমাকে আকৃষ্ট করেছিলো। হয়তো আমাদের ভেতর দৃষ্টি বিনিময়ও হয়েছিলো। আমরা দুজনেই কোন কথা বলিনি।

* * *

নির্দিষ্ট দিনে গেলর্ড রেস্তোরাঁয় গেলুম। মানিকলাল আগে থেকেই ওখানে বসেছিলো। খানিক বাদে সমীর সেনও এলো। কোন ভূমিকা না করেই বললো: আই এ্যাম রেডী।

বেশ একটু বিস্মিত হয়ে মানিকলাল জিজ্ঞেস করলো: মানে?

: মানে আর কিছু নয়। রিপোর্ট সংগ্রহ করেছি। এবার জি-বি-এম

সেই রিপোর্ট বেতারে পাঠাবেন।

মানিকলাল বলে : তুমি ঠাট্টা করছো।

: একাজে ঠাট্টা করা যায় না মানিকলাল। এখন আমাদের হাতে আর সময় নেই। যেটুকু সময় আছে সে সময় অতি মূল্যবান। জি-বি-এম, আপনি কখন থেকে কাজ শুরু করছেন?

: পরশু থেকে কাজ শুরু করবো। দুদিনের কাজ। রিপোর্ট পাঠাবার আগে ওয়ার্নিং পাঠাতে হবে। আর বেশ বড়ো রিপোর্ট, পাঠাবার জন্যে একটা ভালো জায়গা বেছে নিয়ে ট্রান্সমিটার বসাতে হবে।

: আর এ্যান্টেনা? সমীর সেন প্রশ্ন করে।

: বড়ো এ্যান্টেনার প্রয়োজন নেই। ছোট এ্যান্টেনা হলেই চলবে। কারণ মাত্র পঞ্চাশ মাইল অবধি আমাদের খবর পাঠাবার রেঞ্জ।

এবার কোথায় ট্রান্সমিটার বসানো যায় এ নিয়ে আলোচনা শুরু হলো। মানিকলালের বাড়ী হলো বিনয়নগরের এক প্রান্তে। আমি বললুম : আমার মনে হয় মানিকলালের বাড়ী থেকেই আমরা খবর ট্রান্সমিট করতে পারি।

: আমার বাড়ী থেকে? বিস্ময় উত্তেজনা সবই ছিলো মানিকলালের জবাবে।

: দ্যাটস রাইট। তুমি কী কানে শুনতে পাওনা মানিকলাল? জি-বি এম হলেন টেকনিক্যাল এক্সপার্ট। অতএব ওর নির্দেশানুযায়ীই আমাদের কাজ করতে হবে। সমীর সেন বেশ ধমক দিয়ে বললো।

: কিন্তু…কিন্তু…? মানিকলালের প্রশ্নে বেশ সংকোচ ছিলো।

: কিন্তু কী? আমি বেশ দৃঢ়কণ্ঠে জিজ্ঞেস করি।

আমি যে এই ঘটনার ভেতর জড়িত আছি, এ কাহিনীর বিন্দুবিসর্গও আমার স্ত্রী জানেন না।

সমীর সেন খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বললো : বেশ, দিন তিনেকের জন্যে তোমার স্ত্রীকে তার বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দাও।

: কিন্তু তাকে কী কারণ দেখাবো? মানিকলাল প্রশ্ন করে।

: স্ত্রীর কাছে স্বামী কী কৈফিয়ৎ দেবে তা নিয়ে আমরা চিন্তা করতে পারিনে। পরশু আমাদের কাজ শুরু হবে। কাল জি বি-এম তোমার বাড়ীতে ট্রান্সমিটার বসাতে যাবেন। বুঝেছো?

এবার মানিকলালের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। আমি বুঝতে পারলুম যে মানিকলাল ভয় পেয়েছে। কেন জানিনে, প্রথম দিন থেকেই আমি সন্দেহ করেছিলুম এই কাজে মানিকলালের একেবারেই মন নেই।

: হ্যাঁ, তোমার বাড়ী থেকেই আমরা কাজ শুরু করবো। সমীর সেন বেশ

দৃঢ়কণ্ঠেই জবাব দিলো।

চুপ করে রইলো মানিকলাল। আমি শুধু বললুম : তাহলে কাল সকাল নাগাদ তোমার বাড়ীতে যাবো।

মানিকলাল এবারও কোন উত্তর দিলো না। আমাদের সেদিনের আসর ভাঙলো।

* * *

শেষ পর্যন্ত মানিকলালের বাড়ী থেকে আমাদের খবর ট্রান্সমিট করা হলো না। কারণ পরের দিন খুব ভোরে সমীর সেনের টেলিফোন পেলুম।

: একটা বিশেষ খারাপ খবর আছে, সমীর সেন বললো।

: কী খবর? আমার কণ্ঠে থাকে কৌতূহলী প্রশ্ন।

: মানিকলাল হঠাৎ আত্মহত্যা করেছে। সমীর সেন বেশ সংক্ষিপ্ত জবাব দিলো।

এই খবর শুধু আমাকে বিস্মিত নয়, স্তম্ভিত করলো। মানিকলাল আত্মহত্যা করেছে এ খবর আমার মন বিশ্বাস করতে চাইলো না। কেন আত্মহত্যা করেছে? কী কারণ? আমি ভাবতে থাকি। সমীর সেন সমস্ত খবর কিন্তু বিশ্লেষণ করে বললো না। শুধু আমাকে বললো, পারেন তো একবার শ্মশানে যাবেন। হয়তো দেখা হবে।

ঘণ্টা দুয়েকের ভেতর আমি শ্মশানে গেলুম। মানিকলালের স্ত্রী ও তাদের বন্ধুবান্ধবেরা উপস্থিত ছিলো। মানিকলালের স্ত্রীর পানে তাকাবার মতো সাহস আমার হলো না। মানিকলালের স্ত্রী আমার পানে তাকালো। তার দৃষ্টি দেখে মনে হলো যে আমার প্রতি তার সন্দেহ জেগেছে।

সন্দেহ হবার কারণ ছিলো। কারণ আমাকে দেখে মানিকলাল বেশ উত্তেজিত হয়েছিলো। প্রথম দিন থেকেই তার এই উত্তেজনার আভাস পেয়েছিলুম।

কতোক্ষণ শ্মশানে ছিলুম ঠিক বলতে পারবো না। ঘণ্টা দেড়েক। সমীর সেনকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করলুম। কোথায় সমীর সেন? কোথাও তার দেখা পেলুম না।

আমি ভিড় এড়াবার চেষ্টা করলুম। আপন মনে মনে ভাবছিলুম। হঠাৎ আমার চিন্তায় বাধা পড়লো। দেখলুম এক মধ্যমবর্ষীয় ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞেস করছেন : আপনি স্মোক করেন? হাভ মারলবরো।

তার প্রশ্ন শুনে সত্যিই একটু বিস্মিত হলুম। মারলবরো! আশ্চর্য! ভারতবর্ষে কেউ মারলবরো সিগারেট স্মোক করে এ আমি কখনই কল্পনা করিনি।

হঠাৎ আমার সতীলার কথা মনে পড়লো। মারলবরো। হলো কোড শব্দ। লোকটি নিশ্চয় সতীলার চর হবে। প্রথমে না চিনবার ভান করলুম। বললুম: আমি স্মোক করিনে।

হাজার হোক বিদেশে কাউকে বিশ্বাস করতে নেই। নিজের মনকে সান্ত্বনা দিলুম।

: আমি সতীলার বন্ধু। ভয় পাবার কিছু নেই। আপনিই জি-বি-এম, বেরুট থেকে এসেছেন? ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন।

এর পরে আর চুপ করে থাকা যায় না। কোন একটা জবাব দিতে হবে। স্বীকার করতেই হবে সতীলা আমারও বিশেষ বন্ধু। জিজ্ঞেস করলুম: আপনি কে?

আমার প্রশ্ন শুনে ভদ্রলোক একটু হাসলেন। স্মিত হাসি। বললেন: আমার পরিচয়? কী পরিচয় দেবো? শুধু এইটুকু বলতে পারি এই অপারেশনের কর্তা হলুম আমি। আমার নাম সমাদ্দার। আপনি মানিকলালের বন্ধু?

: ওল্ড ফ্রেণ্ড। কায়রোতে থাকাকালীন পরিচয় হয়েছিলো।

: বন্ধুত্বের কারণ নিশ্চয় মেয়েমানুষ—সমাদ্দারের কণ্ঠে বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গ ছিলো।

আমি এবার বিরক্তি প্রকাশ করলুম। বললুম: এইসব ব্যক্তিগত প্রশ্নের কোন জবাব দেবো না।

এবার সমাদ্দার একটু হাসলেন। তারপর বললেন: রাগ করলেন জি বি এম, আমি ঠাট্টা করছিলুম। মেয়েমানুষের প্রতি মানিকলালের ভারী দুর্বলতা ছিলো।

জি বি এম, আপনার জীবনকাহিনী আমার অজানা নেই। ছিলেন বারম্যান। বিচিত্র ধরনের মানুষ আপনার কাছে আসতো। মানিকলালও এসেছিলো। তাই নয় কী?

আমার সঙ্গে মানিকলালের প্রথম পরিচয় যুদ্ধের ক্যান্টিনে' কোন বারে নয়। জানিনে কেন সমাদ্দারের প্রশ্ন এবং লোকটিকে আমার ভালো লাগলো না। কিন্তু মনের কথা ভাষায় প্রকাশ করলুম না।

: শ্যাল উই গো? সমাদ্দার জিজ্ঞেস করলেন।

: কোথায়? আমি জিজ্ঞেস করলুম।

: অন্য কোথাও, যেখানে নিরিবিলি বসে কথা বলতে পারি।

আমি একটু ইতঃস্তত ভাব প্রকাশ করলুম। কী করবো ভেবে পেলুম না।

সমাদ্দারকে বিশ্বাস করা সমীচীন হবে কিনা জানিনে।

কিন্তু সমাদ্দারকে অবিশ্বাস করা উচিৎ হবে কি? সমাদ্দার মার্লবরো সিগারেট পান করেন। আর মার্লবরো হলো আমাদের দলের কোড শব্দ। সমাদ্দার যে আমাদেরই একজন এই বিষয়ে কোন সন্দেহ করা চলে না।

আমি একটু নীচু কণ্ঠে জবাব দিলুম: চলুন, কিন্তু কোথায় যাবেন?

: কনট সার্কাসে।

সামনেই একটা অষ্টিন গাড়ী ছিলো। আমরা দুজনে ঐ গাড়ীতে গিয়ে বসলুম।

সমাদ্দার ষ্টিয়ারিং ধরলেন। বললেন: মানিকলাল মারা গেলো।

আমি তক্ষুণি জবাব দিলুম। বললুম: সবাই কেন বলেছেন, আত্মহত্যা করেছে।

: আত্মহত্যা না এ্যাক্সিডেন্টে তার মৃত্যু হয়েছে সঠিক বলতে পারব না। বাজারে গুজব রটেছে মানিকলাল আত্মহত্যা করেছে। কাল রাতে জিমখানা ক্লাবে প্রচুর মদ পান করেছিলো। তাই একটু বেসামাল হয়ে পড়ছিলো। হঠাৎ চলন্ত গাড়ীর নীচে পড়ে। কিন্তু এই মৃত্যু কী সত্যিই আত্মহত্যা, না তাকে খুন করা হয়েছে? অত গভীর রাতে নির্জন রাস্তায় কেউ গাড়ী চাপা পড়ে আমি ভাবতেই পারিনে।

সমাদ্দার চুপ করলেন। আমি ভাবতে লাগলুম। সমাদ্দারের কথা খানিকটা সত্যি। অতো গভীর রাতে এ্যাক্সিডেন্ট হওয়া কী সম্ভব! পরক্ষণেই নিজের মনকে সান্ত্বনা দিলুম, মানুষের জীবনে সব কিছুই সম্ভব।

: আজ কিছুদিন হলো হঠাৎ মানিকলালের কী হয়েছিলো জানিনে। ওর মন ভারী চঞ্চল ছিলো। তাই প্রতিদিনই জিমখানা ক্লাবে বসে প্রচুর মদ খেতো। আমরা আর একটা খবরও পাচ্ছিলুম। মানিকলাল পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবার চেষ্টা করছিলো। কিছুদিন আগে জিমখানা ক্লাবে বসে এক লম্বা চিঠি লিখেছিলো। ক্লাবের বারম্যানকে সেই চিঠি পোষ্ট করতে দিয়েছিলো। আমরা শুনতে পেলুম মানিকলাল ঐ চিঠি পুলিশকে লিখেছিলো। আসল কথা কী জানেন জি বি-এম, সম্প্রতি মানিকলাল আমাদের সঙ্গে কাজ করতে ভয় পাচ্ছিলো।

আমি চুপ করে রইলুম। মানিকলালের মনের ভেতর যে একটু শঙ্কা হয়েছিলো তার খানিকটা আভাস আমিও পেয়েছিলুম।

: আর একটা ব্যাপারে আপনাকে একটু সতর্ক করতে চাই জি বি-এম। পুলিশের খাতায় আপনার নামও উঠেছে। হ্যাঁ আমি হলপ্ করে বলতে

পারি আপনার উপরেও পুলিশের নজর রয়েছে। আর এর জন্যে অবশ্যি আপনিই দায়ী।

: আমি যেন মিঃ সমাদ্দারের কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারলুম না, কথা বলতে বলতে আমরা কনট সার্কাসে এসে পৌছলুম।

গাড়ী থেকে নেমে একটা কফি হাউসে ঢুকলুম।

সমাদ্দার দুকাপ কফির অর্ডার দিলেন। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন: সামান্য একটা ভুলের জন্যে পুলিশের নজর আপনার উপর পড়েছে। জি বি-এম আপনি যে পাশপোর্ট নিয়ে ভারতবর্ষে ঢুকেছেন, সেই পাশপোর্টের মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে। আপনি ভারতীয় নাগরিক, তাই এয়ারপোর্টের কর্তারা আপনাকে এ দেশে ঢুকতে দিয়েছে। আমার মন বলছে যে পুলিশ এবার থেকে আপনার উপর কড়া নজর রাখবে।

আমি এবার আর একটু কৌতূহল প্রকাশ করলুম। জিজ্ঞেস করলুম: পুলিশের সন্দেহের কথা বলেছেন, পুলিশ কী একমাত্র আমাকেই সন্দেহ করছে? আপনার উপরেও কী পুলিশের তীক্ষ্ণ নজর নেই?

আমার প্রশ্ন শুনে সমাদ্দার একটু হাসলেন। চট করে জবাব দিলেন না। বুঝতে পারলুম উনি আবার চিন্তা সুরু করেছেন। সমাদ্দার আমাকে একটি সিগারেট অফার করলেন। বললেন: মাবলবরো। আমাদের এই অপারেশনের কোডওয়ার্ড। যাক, কী জিজ্ঞেস করছিলেন? পুলিশ আমার প্রতিও নজর রাখছে কি না? না নজর থাকলেও মানিকলালের মৃত্যুর পর পুলিশ হয়তো নজর রাখবে। তাই আমাদের একটু সতর্ক হয়ে কাজ করতে হবে। যতোটা সম্ভব প্রকাশ্য দিবালোকে আমাদের দেখাশোনা না করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। তাই আমাদের প্রতি মুহূর্তেই মিসেস সেনের সাহায্যের দরকার হবে। কারণ, আমরা ওর মারফৎই সমীর সেনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবো। আজকাল সমীর সেন হলেন আমাদের 'কী ম্যান'।

এবার গলার স্বর একটু নীচু করে বললেন: মিসেস সেনকে কেমন লাগে?

মিসেস সেনের প্রতি যে আমার একটু অনুরাগ জন্মেছিলো সেকথা অস্বীকার করলুম না। বললুম: মিসেস সেন সুন্দরী। তার দেহসৌষ্ঠব যে-কোন পুরুষকেই আকর্ষণ করবে।

সমাদ্দার আমার জবাব শুনে হাসলেন। বললেন: ব্যস, তাহলে ওর সঙ্গে স্রেফ প্রেম করে যান। দ্বিধা করবেন না জি-বি-এম। সুন্দরী রমণীর হৃদয় জয় করা হলো অতি ভাগ্যবান পুরুষের কাজ।

সমাদ্দারের কথায় আমি একটু উৎসাহিত বোধ করলুম। সমাদ্দারকে

ধন্যবাদ জানিয়ে বললুম : মিসেস সেনের দৃষ্টি যদি আকর্ষণ করতে পারি তাহলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করবো।

সমাদ্দার এবার আলোচনার মোড় ঘোরালেন। বললেন : জি-বি-এম, এবার বলুন বেরুটে আমার বন্ধুরা আপনাকে কী নির্দেশ দিয়েছে ?

: নির্দেশ কিছুই দেয় নি। শুধু এইটুকু বলেছে যে ভারতবর্ষে এলে পরে এখানেই আমার কাজের ফিরিস্তি জানিয়ে দেয়া হবে।

: কাজ শিখেছেন কিছু ?

সমাদ্দারের কথার জবাব দিতে আমি অপমান বোধ করলুম। হয়তো আমার কণ্ঠস্বরেও বিরক্তির একটু আভাস ছিলো। বললুম : বান্দা প্রফেশনাল স্মাগলার। কখন কি করতে হয় সবই আমার জানা আছে।

: কিন্তু জি বি-এম, আপনি তো আর ভারতবর্ষে স্মাগলিং করতে আসেন নি। আপনি এসেছেন গুপ্ত খবর সংগ্রহ করতে।

: একবার বাজিয়ে দেখুন আমি সাচ্চা মাল কিনা ? দেখতে পাবেন আমি সব কাজে পটু। বলুন, কী কাজ করতে হবে, রেডিও ট্রান্সমিশান, মাইক্রোফিল্ম, মাইক্রোডট সব ধরনের কাজ করতেই আমি ওস্তাদ।

: বেশ তাহলে এবার কাজের কথাই শুরু করা যাক। জি-বি-এম, মানিকলালের আকস্মিক মৃত্যুতে হয়তো আমাদের কাজের খানিকটা ব্যাঘাত ঘটতে পারে। কারণ এবার মানিকলালের মৃত্যু নিয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করবে। এই তদন্তে পুলিশ অনেক কিছু জানতে পারবে। প্রথমতঃ আমাদের কাছ থেকে মানিকলাল বিস্তর টাকা পেতো। অথচ মানিকলাল সরকারী চাকুরে। মাপা মাইনে। ছক্ বাধা প্রমোশন। আবার কিছুদিন হলো তার প্রমোশনও বন্ধ হয়েছিলো। এদিকে প্রতিদিনই জিমখানা ক্লাবে তার বিস্তর বিল হচ্ছে। এইসব কথা যখন পুলিশ জানতে পারবে তখন নিশ্চয় ওদের মনের সন্দেহ বাড়বে। ওর বন্ধুবান্ধব পরিচিতদের পেছনে লাগবে। তাই আপনাকে এবার বেশ একটু হুঁশিয়ার হয়ে কাজ করতে হবে।

যাক, এবার যে কাজের কথা বলছিলুম। পরশুদিন মানিকলালের চৌথা। ওর আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবেরা সবাই মানিকলালের গিন্নীর কাছে সহানুভূতি দেখাতে যাবে। আপনিও যাবেন। মিসেস মানিকলালের কাছে আপনার দুঃখ, সহানুভূতি জানাবেন।

হাজার হোক আপনি ওর পুরানো দিনের বন্ধু। আপনার যাওয়া একান্ত প্রয়োজন।

মানিকলালের বাড়ীতে আবার সমীর সেনের সঙ্গে দেখা হবে। কর্তার

সঙ্গে গিন্নিও থাকবেন। খবরদার সেদিন কিন্তু মিসেস সেনের প্রতি প্রলুব্ধ দৃষ্টি দেবেন না। কাজকর্ম নিয়ে সমীর সেনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবেন। সমীর সেনই বলবে, কী কাজ করতে হবে। সম্প্রতি সমীর সেন কিছু জরুরী কাগজপত্র যোগাড় করেছেন। আপনার কাজ হলো এই কাগজ সংগ্রহ করা। কী করে এই কাজ করবেন তার পুরো প্ল্যান আপনাদেরই কষতে হবে। অতো ভিড়ের মধ্যে আপনি সমীর সেনের সঙ্গে কী আলাপ-আলোচনা করছেন কেউ জানতে পারবে না।

আপনি সমীর সেনকে গেলর্ড রেস্তোরাঁয় নেমন্তন্ন করবেন। হ্যাঁ, নেমন্তন্ন আপনি প্রকাশ্যেই করবেন। দীর্ঘদিন বাদে আপনি দেশে ফিরেছেন। হঠাৎ সমীর সেন ও তার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার আলাপ পরিচয় হলো। মিসেস সেন আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আপনি ওর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় জমাতে চান। তাই ওকে গেলর্ড রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ খাওয়াচ্ছেন। অতএব কারু মনে একটুও সন্দেহ জাগবে না। সেদিন লাঞ্চের বিল আপনিই মেটাবেন। বিদেশ থেকে বন্ধুরা আপনাকে নিয়মিত টাকার যোগান দেবে। অতএব আপনার অর্থের টানাটানি হবে না। এই গেলর্ডে সমীর সেন আমাদের কাজের একটা পুরো ফিরিস্তি আপনাকে দেবে। হাজার হোক মানিকলালের বাড়ীতে অতো লোকের সামনে সব কথা খুলে বলা যায় না। তাই গেলর্ড রেস্তোরাঁয় আপনাদের মিট করা দরকার। বলুন এবার আমার প্রস্তাবে কোন খুঁত আছে কিনা?

সমাদ্দারের প্রস্তাবে আমি কোন বাদ-প্রতিবাদ করলুম না। এখনও এই দেশের জীবনের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়নি। আমার কী কাজ এখনও স্বচ্ছ পরিষ্কার হয়নি। তাই ভাবলুম সমাদ্দারের নির্দেশ পালন করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

খানিক বাদে সমাদ্দারের কাছে বিদায় নিয়ে নিজের হোটেলে চলে এলুম।

*　　*　　*　　*

দু দিন বাদে মানিকলালের বাড়ীতে এলুম। মানিকলালের বাড়ীতে সেদিন বিস্তর লোক জড়ো হয়েছিলো। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু বান্ধব ও তার দপ্তরের সহকর্মীরা। এই অপরিচিত জনতার মাঝে নিজের অস্তিত্বকে যেন হারিয়ে ফেললুম। নিতান্তই অসহায় বোধ করলুম নিজেকে।

এদিকে তাকিয়ে দেখলুম। না, সমীর সেন তখনও আসেননি। ভাবতে লাগলুম কি করে সময় কাটানো যায়।

মিসেস মানিকলালের কাছে গিয়ে ব্যক্তিগত দুঃখ এবং সহানুভূতি প্রকাশ

করলুম। মিসেস মানিকলাল আমার পানে বেশ কঠোর দৃষ্টিতে তাকালেন। আমার মনে হলো উনি আমাকে সন্দেহ করেছেন যে তার স্বামীর মৃত্যুর জন্যে আমিই দায়ী। কেন যে তার মনে এই সন্দেহ জেগেছে আমি তার কারণ খুঁজে পেলুম না।

আমি একাই বসেছিলুম আর খানিকটা সময়। তখনও সমীর সেন এসে পৌছোন নি। বেশীক্ষণ আমাকে একা বসে থাকতে হলো না। একটু বাদেই সমীর সেন আর মিসেস সেন এলেন। আজ আমার চোখে মিসেস সেনকে ভারী সুন্দর লাগলো। উনি আজ অতি সাধারণ সাজসজ্জা করেছিলেন। সাদা শাড়ী, মুখে কোন প্রসাধন নেই। আমার মনে হলো এই পোষাকেই মিসেস সেনকে সবচাইতে বেশি সুন্দর দেখায়। ওরা দুজনে গিয়ে মিসেস মানিকলালের কাছে বসলেন। ওদের আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করলেন।

নীরব নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন মিসেস মানিকলাল। আজ তার কথা বলবারও শক্তি ছিলো না। তার দুচোখে শুধু ছিলো জল।

একটু পরে সমীর সেন উঠে এসে আমার পাশের চেয়ারে বসলেন।

আমি চাপা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলুম: সমাদ্দার বলে কাউকে চেনেন?

আমার প্রশ্ন শুনে সমীর সেন যেন চকচকিয়ে গেলেন। বেশ খানিকক্ষণ তার মুখ দিয়ে কোন শব্দ বেরুল না। দেখতে পেলুম তার মুখে ভয়ের ছাপ ফুটে উঠেছে। এই আতঙ্ক কেন? বার বার আমার মনে এই প্রশ্ন জাগতে লাগলো। সমীর সেন সমাদ্দারের নাম শুনেই কেন ভয় পেলেন। আমি দেখতে পেলুম সমীর সেন চিন্তা করতে সুরু করেছেন। বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর অতি সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন। সমাদ্দারকে না চিনবার ভান করে বললেন: না সমাদ্দার বলে কাউকে আমি চিনিনে।

কিন্তু আমি সমীর সেনকে বিশ্বাস করতে পারলুম না। কেন জানিনে আমার মন বলতে লাগলো উনি সমাদ্দারকে চেনেন ঠিকই। হয়তো প্রকাশ্যে এই পরিচয়কে স্বীকার করতে চান না। তাই আমার প্রশ্নকে এড়িয়ে গেলেন।

সমীর সেন এবার জিজ্ঞেস করলেন: হঠাৎ আপনি এই প্রশ্ন করলেন কেন জি-বি-এম?

সমীর সেনের কণ্ঠে ছিল কৌতূহলের সুর।

: বিশেষ কোন কারণ নেই। আমি বললুম,—হঠাৎ সেদিন শ্মশান ঘাটে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হলো। ভদ্রলোকের নাম সমাদ্দার। উনি আমাকে মারলবরো সিগারেট অফার করলেন। বুঝতে পারলুম উনিও আমাদের দলের লোক। তাই, হয়তো আপনার পরিচিত হতে পারেন ভেবে আপনাকে

জিজ্ঞেস করলুম সমাদ্দার নামটি আপনার কাছে পরিচিত কিনা?

: সরি, জি-বি-এম, ভেরি সরি। সমাদ্দার নামটি আমার কাছে একেবারেই অপরিচিত। এই বলে সমীর সেন চুপ করলেন।

আমার মনে হলো সমীর সেন অতীতের স্মৃতির ভাণ্ডার রোমন্থন করছেন। দেখতে পেলুম তার চোখের পাতা বুঁজে গেছে।

কিন্তু একটু পরেই উনি আবার সজাগ হয়ে উঠলেন। চোখ দুটো আবার তীব্র হয়ে উঠলো। মনে হলো তার মনের সংশয় দূর হয়ে গেছে।

আমি আবার বললুম: হয়তো সমাদ্দার আপনার কাছে অন্য নামে পরিচিত।

আমার জবাবে হয়তো উনি অন্ধকারের ভেতরে একটা পথ খুঁজে পেলেন। মনে হলো উনি যেন মস্ত বড়ো কোন এক জটিল সমস্যার সমাধান করে ফেলেছেন। ওর মুখে হাসি ফুটে উঠলো। বললেন: হতে পারে। না, আপনার কথার যুক্তি আছে। হয়তো সমাদ্দারকে আমি অন্য নামে চিনি।

সমীর সেন এবার আলোচনার মোড় ঘোরাতে চেষ্টা করলেন। বললেন: এবার কাজের কথা নিয়ে আলোচনা করা যাক, জি বি-এম। একটা বিষয়ে আপনাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই। মানিকলাল মারা গেছে। এখন থেকে আরও সতর্ক হয়ে কাজ করতে হবে। সাবধানের মার নেই। মনে রাখবেন বিপদ, যে কোন সময়েই আসতে পারে। কাল আমাদের একজন বলছিলেন যে মানিকলাল নাকি পুলিশের কাছে গিয়ে সমস্ত কথা খুলে বলবার সংকল্প করেছিলো। বেচারা পুলিশের কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণের সুযোগ পেলো কোথায়? তার আগেই একটা মোটর এ্যাকসিডেন্টে মারা পড়লো। আজ আমার মন বলছে পুলিশ আমাদের কার্যকলাপের হদিশ পেয়েছে। হয়তো এবার থেকে আমাদের পেছনেও লাগবে।

: আপনার এই সন্দেহের কী কারণ বলুন তো? আমি জিজ্ঞেস করলুম।

: না, সন্দেহের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ এখনো নেই। তবু কেন জানিনে, আমার মন বলছে যে পুলিশ হয়তো আমাদের পেছনেও লাগতে পারে। এই মানিকলালের মৃত্যু নিয়ে বিস্তর টানা হ্যাঁচড়া হবে। পুলিশের এনকোয়ারী, মিসেস মানিকলালের জবানবন্দী, সমস্ত মিলিয়ে কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় দেখুন। হ্যাঁ, আর একটা কথা জি-বি-এম। মানিকলালের মৃত্যুর জন্যে আমরাও খানিকটা দায়ী। ইচ্ছে করলে আমরা ওকে বাঁচাতে পারতুম। বিশেষ করে আমি এবং আপনি।

: আমি? বিস্মিত হতবাক্ হয়ে প্রশ্ন করলুম। আমার প্রশ্নে ছিলো উত্তেজনা। মানিকলালের মৃত্যুর জন্যে যে আমি অপরাধী একথা আমি যেন

বিশ্বাস করতে পারলুম না। তাই প্রতিবাদ করে বললুম: মানিকলালের মৃত্যুর জন্যে আমাকে অনর্থক দায়ী করছেন মিঃ সেন।

: অনর্থক নয় জি-বি-এম। কারণ আছে বলেই আপনাকে এই ব্যাপারে জড়াচ্ছি। যেদিন আপনি মানিকলালের বাড়ী থেকে ট্রান্সমিশান করবার প্রস্তাব করলেন, আপনার সেই প্রস্তাবে মানিকলাল বড্ডো ভয় পেলো। কী করবে ভেবে পেলো না। পুলিশ যদি জানতে পারে যে তার বাড়ী থেকেই ওয়ারলেস ট্রান্সমিশান করা হচ্ছে তাহলে তার গ্রেপ্তার হওয়া ছিলো অনিবার্য। পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পরিণাম আন্দাজ করতে মানিকলালের একটুও অসুবিধে হয় নি। দীর্ঘদিনের জন্যে শ্রীঘরে বাস করতে হবে। সমাজে কেলেঙ্কারী হবে। পুলিশের হাতে তার আত্মীয়স্বজনকে নাকাল নাজেহাল হতে হবে। কারণ, দেশদ্রোহীকে কেউই সমর্থন করবে না। বলুন, এই সব চিন্তা ভাবনার পর মানিকলাল কী করতে পারে?

মানিকলাল ছিল দুর্বল প্রকৃতির লোক। শক্ত মন নিয়ে কোন কাজ করতে পারতো না। তার মানসিক দ্বন্দ্ব সংঘাত সংযত করতে জিমখানা ক্লাবে গিয়ে বসলো মদের বোতল নিয়ে। কী করা যায় ভাবতে লাগলো সেইখানে বসে। পুলিশের কাছে যাবার মত মনের জোর ছিলো না। তারপর মাতাল হয়ে যখন রাস্তায় বেরুল তখন আর নিজেকে সামলাতে না পেরে একটা লরীর ধাক্কায় প্রাণ দিলো। একেই বলে ভাগ্য, স্রেফ ভাগ্য জি-বি এম।

আমার কাছে এবার মিসেস মানিকলালের সন্দেহের কারণ স্বচ্ছ, সরল হয়ে এলো। বুঝতে পারলুম মানিকলাল তার স্ত্রীর কাছে আমার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করে দিয়েছে এবং বর্তমানে আমি যে স্পাই, কোন বিদেশীর হয়ে কাজ করছি একথাও নিশ্চয় মিসেস মানিকলাল জানেন। আমিই মানিকলালকে আমার কাজে জড়িয়েছি এবং মৃত্যুর পথে তাকে টেনে নিয়েছি। তাই মিসেস মানিকলাল সন্দেহ করেন যে তার স্বামীর মৃত্যুর জন্যে আমিই দায়ী। আমিই তার মৃত্যুর ফাঁদ পেতেছিলুম।

সমীর সেন বলতে থাকলেন: বেশ কিছুদিন হলো মানিকলালের মন উত্তেজিত ও চঞ্চল হয়েছিলো। হয়তো কোন বিপদের গন্ধ পেয়েছিলো। মনের এই উত্তেজনাকে দাবিয়ে রাখতে পারেনি। কাজ করতে সংকোচ বোধ করছিলো। না জি-বি-এম, আমাদের কাজে বড্ডো বিপদ। মানিকলালের মত ভীরু দুর্বল প্রকৃতির লোককে রিক্রুট করা উচিত হয় নি। এই সব লোক কাজের ঝঞ্ঝাট বাড়ায়। এই দেখুন না, মানিকলালের জন্যে কত্তো বিপদ ঘনিয়ে আসছে।

সমীর সেনের কথা ঠিক। মানিকলাল যে দুর্বল প্রকৃতির লোক এতে আমার

কোন সন্দেহ ছিলো না। আমি ভাবলাম আজ সমীর সেন কার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন। কে মানিকলালকে রিক্রুট করেছিলো। সমাদ্দার? সমীর সেন তো সমাদ্দারের অস্তিত্বকেই স্বীকার করেন নি। এই নাম তার কাছে একেবারেই অপরিচিত। তাহলে এই অভিযোগ কার বিরুদ্ধে। আমার ভাববার আর একটা কারণ ছিলো। মানিকলালের মৃত্যুর জন্যে আমি কতোটা দায়ী ভাবতে লাগলাম। সমীর সেন বলছেন যে আমার প্রস্তাবে মানিকলাল ভয় পেয়েছিলেন। কিন্তু দলের সঙ্গে জড়িত থাকলে বিপদের ঝুঁকি নিতে হবে বৈকি! না, ঠিক বলছেন সমীর সেন, দুর্বল প্রকৃতির লোকদের আমাদের কাজে কখনোই জড়ানো উচিত নয়।

: আপনিই বলুন মিঃ সেন, আমি যে মানিকলালের বাড়ীতে ট্রান্সমিটার বসাবার প্রস্তাব করেছিলাম সেই প্রস্তাবে কি কোন খুঁত ছিলো? শহরের নির্জন প্রান্ত, গাছপালা নেই, গাড়ীর শব্দ নেই। সব দিক থেকে কাজের জন্য মানিকলালের বাড়ীই সবচাইতে নিরাপদ।

সমীর সেন আমার কথার কোন জবাব দিলেন না। আমার মনে হলো উনি আমার প্রস্তাবকে মনে মনে স্বীকার করে নিয়েছেন। শুধু বললেন: জি বি-এম, অতীত নিয়ে আলোচনা করে লাভ নেই। ডেড ম্যান মাস্ট বী ফরগটন। এখন ভবিষ্যতের জন্য আরও সাবধান হওয়া উচিত। একটু হুঁসিয়ার হয়ে কাজ করবেন। সাবধানের মার নেই।

আমার জানবার ইচ্ছে হলো, মিসেস সেন আমাদের কাজের কতোটুকু জানেন। উনি কী জানেন, আমরা কী কাজ করছি? মনের কথা আমি সমীর সেনের কাছে প্রকাশ করলাম।

আমার প্রশ্নে সমীর সেন একটু গম্ভীর হলেন। তার মুখ দেখে মনে হলো আমার প্রশ্নে উনি একটুও খুশি হননি। তাই ওর জবাবে বেশ খানিকটা বিরক্তির ঝাঁঝ ছিলো। : আপনি মিসেস সেনকে অতো অবহেলা করবেন না, জি বি এম। ওকে খুশী রাখলে আপনার কাজে সুবিধে হবে। আমাদের এই কাজের ভেতর মিসেস সেন বেশ গভীর ভাবে জড়িয়ে আছেন। থাক, আমরা অনর্থক বাজে বিষয় নিয়ে তর্ক বিতর্ক করছি। এবার কাজের কথা বলা যাক। হ্যাঁ, একটা কথা আপনাকে বলতে চাই। যে কাজের নির্দেশ আপনাকে দেয়া হবে সেই কাজের হুকুম তামিল করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। প্রতিবাদ করে কিংবা কাজে গাফিলতি করে নিজের বিপদ ডেকে আনবেন না। বেশী কৌতূহল প্রকাশ করবেন না কোন ব্যাপারে। জানেন তো, অহেতুক কৌতূহলও অনেক বিপদ ডেকে আনে।

জি-বি-এম, এবার আমাদের কাজের একটা নকশা করা দরকার। পরশু আমার সঙ্গে গেলর্ড রেস্তোরাঁয় দেখা করবেন। এই ব্যাপার নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করবো।

আমি মৃদু আপত্তি করলাম। বললাম : মিঃ সেন, আমাদের এই দেখা সাক্ষাতের কী কোন প্রয়োজন আছে ?

আমার প্রশ্ন শুনে সমীর সেন একটু থতমতো খেলেন। রাগও করলেন। বললেন : আপনি বড্ডো বেশী কথা বলেন। আপনাকে কতোবার বলেছি যে হুকুম তামিল করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

আমি চুপ করে রইলাম। কোন জবাব দিলাম না।

নির্দিষ্ট দিনে গেলর্ড রেস্তোরাঁয় গিয়ে হাজির হলাম। আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। হাজার হোক আমি বারম্যান। রেস্তোরাঁর ভুল ত্রুটি ধরা আমার পক্ষে খুবই সহজ কাজ।

তাকিয়ে দেখলুম, গেলর্ড রেস্তোরাঁ মোটামুটি খুব মন্দ কিছু নয়। চাকচিক্যের কোনও অভাব নেই। তবু কেন যেন মনে হলো এর ভেতরে কোন প্রাণ নেই।

একটু বাদে ওয়েটার এলো। বললাম : জিন টনিক প্লিজ।

আমার অর্ডার শুনে লোকটা অবাক হলো। এমনি ভাব করলো যেন আমি বেফাঁস কিছু বলে ফেলেছি।

: সরি স্যার, দিল্লীর কোন রেস্তোরাঁয় মদ বিক্রী হয় না। প্রহিবিশন।

মদ পাবো না শুনে মনটা বিগড়ে গেলো। অনেক দিন থেকে জল খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলুম। কিন্তু আজ নিরুপায়। জুস ছাড়া খাবার নেই কিছু। অনন্যোপায় হয়ে জুসেরই অর্ডার দিলুম।

প্রায় আড়াইটের সময় সস্ত্রীক সমীর সেন এলেন। আজও মিসেস সেনকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিলো। যতোই মিসেস সেনকে দেখছি ততোই তার রূপ আমাকে মুগ্ধ করছে।

: হাউ আর ইউ জি-বি-এম, সমীর সেন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন।

: ভালো। ভালোই আছি, আমি জবাব দিলুম। জবাব দেবার সময় আমার দৃষ্টি ছিলো মিসেস সেনের পানে। মিসেস সেনের সঙ্গে আমার দৃষ্টি বিনিময় হলো। উনি একটু লজ্জা পেলেন। মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমি ওর রূপের প্রশংসা করে বললুম : মিসেস সেন আজ আপনাকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। আপনি যে কোন বিউটি কম্পিটিশনেই প্রথম হবেন। না, আমি অন্তর থেকেই একথা বলছি।

আমার প্রশংসা শুনে মিসেস সেন একটু হেসে জবাব দিলেন : থ্যাংকস্। অশেষ ধন্যবাদ।

আমি আরো কী যেন বলতে যাচ্ছিলুম। আমার কথায় সমীর সেন বাধা দিলেন। বললেন : জি-বি-এম, সময় নষ্ট করে লাভ নেই। কাজের কথা আরম্ভ করা যাক্। মানিকলাল মারা গেছে। এবার আমাদের কাজের নতুন প্ল্যান করতে হবে।

আমি মাথা নাড়লুম। সংক্ষিপ্ত জবাব দিলুম : একবার হুকুম দিন, দেখবেন সব কাজ সুসম্পন্ন হয়ে গেছে।

ইতিমধ্যে ওয়েটার মেনুকার্ড নিয়ে এলো। আমার খাবারের অর্ডার দিলুম। একটু বাদে খাবার এলো।

: কবে নাগাদ কাজ শুরু করবেন? জিজ্ঞেস করলেন সমীর সেন।

: যে কোন দিন, যে কোন মুহূর্তে, আমি জবাব দিলুম।

: বেশ, শুনুন এবার। এর আগেও একবার আপনাকে বলেছি যে আমি একটা বিশেষ গোপনীয় টপ্ সিক্রেট ডকুমেন্ট যোগাড় করেছি। চীনিদের সঙ্গে যুদ্ধে হারবার পর ভারতীয় সরকার সীমান্ত অঞ্চলকে আরো শক্তিশালী করার জন্যে বর্ডার এরিয়া ডিফেন্স কমিটি গঠন করেছেন। সম্প্রতি এই সব সীমান্ত অঞ্চল পরিদর্শন করে কমিটি সরকারের কাছে এক রিপোর্ট পেশ করেছেন। এই রিপোর্টে সীমান্তগুলোকে আরও শক্তিশালী করে তুলবার জন্যে বহু ধরনের প্রস্তাব করা হয়েছে। রিপোর্ট এখন সরকারের বিবেচনাধীন আছে, কিন্তু আমি জানি যে সরকার কমিটির সুপারিশই গ্রহণ করবেন। এই রিপোর্টে মাউন্টেন ইউনিট গঠন করার প্রস্তাব করা হয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন বিমান বন্দর তৈরী করারও সঙ্কল্প করা হয়েছে। এই রিপোর্ট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় সরকারের টপ সিক্রেট ডকুমেন্ট। জয়েন্ট সেক্রেটারীর নীচে আর কারও এই রিপোর্ট দেখবার অধিকার নেই। এই রিপোর্টের সারাংশ শিগ্‌গীরই বন্ধুদের কাছে পাঠাতে হবে। রিপোর্ট সংগ্রহ করার দায়িত্ব আমার। পাঠাবার দায়িত্ব আপনার। অতএব রিপোর্ট পাবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে ট্রান্সমিট করতে হবে।

এবার আমার জবাব দেবার পালা। ট্রান্সমিশন করার যে প্ল্যান করেছিলুম সবই মানিকলাল মারা যাবার পর ভেস্তে গেছে। তাই বললুম : বলুন, রিপোর্ট কোথা থেকে ট্রান্সমিট করবো।

: উঁহু, সেই চিন্তা আপনি করবেন। কারণ, রিপোর্ট ট্রান্সমিট করার দায়িত্ব আপনার। বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করুন। তাদের কাছ

থেকে পরামর্শ নিন। রিপোর্ট ট্রান্সমিট করার একটা উপায় নিশ্চয়ই তারা বাত্‌লে দেবেন।

: বন্ধু! বন্ধুদের নাম বলুন সেন সাহেব? আমি এবার একটু কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলুম।

: জি বি-এম, কাজের প্রারম্ভেই সতর্ক করে দিচ্ছি। আমাদের কাজ শুধু গুরুত্বপূর্ণ নয়, বিপজ্জনক কাজ। এই কাজে কারও নাম উচ্চারণ করতে নেই। মনে রাখবেন, দেয়ালেরও কান আছে। যাক্‌ আপনি চিন্তা ভাবনা করবেন না। বন্ধুরাই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবেন। আপনি তাদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করে যান। আপনি দুদিনের ভেতর আমার কাছ থেকে বর্ডার এরিয়া কমিটির রিপোর্ট পাবেন। কী করে আমার কাছ থেকে রিপোর্ট সংগ্রহ করবেন তার নির্দেশও শিগ্‌গীরই আপনাকে দেয়া হবে।

মিসেস সেন এতোক্ষণ আমাদের আলোচনায় যোগ দেন নি। এবার মুখ খুললেন। বললেন: কতোদিন বাদে দেশে ফিরলেন?

: প্রায় দশ বছর বাদে। তাই দেশের সব কিছুই নতুন লাগছে। মনে হচ্ছে দেশের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। জানেন মিসেস সেন, মানুষের কিন্তু একটুও পরিবর্তন হয়নি। স্বাধীনতার আগে আমরা যেমন ছিলুম আজও তেমনি আছি।

আমাদের আলোচনায় সমীর সেন আবার বাধা দিলেন। আমি তাকিয়ে দেখলুম, সমীর সেনের মুখ ক্রমেই গম্ভীর হচ্ছে। তিনি বললেন: এবার ওঠা যাক্‌। আমাকে দু-একটা কাজের জন্যে একবার কনট সার্কাসে যেতে হবে।

মিসেস সেন সমীর সেনের কথায় কান দিলেন না। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন: এবার ক'দিন থাকবেন দেশে?

: বেশিদিন নয়। মিসেস সেনের প্রশ্নের জবাব দেবার সময় আমার দীর্ঘশ্বাস পড়লো। লাভ্‌লি বেরুট—লাভ্‌লি গার্লস্‌।

: জানেন মিসেস সেন, আমি আবার বললুম,—আমি হলুম নাইট ক্লাবের বারম্যান। আমার জীবন হলো·

সমীর সেন আমার কথা লুফে নিলেন। বললেন: ষ্ট্রেঞ্জ! আশ্চর্য! আমি জানতুম আপনি হলেন প্রফেশনাল স্মাগলার, অর্থাৎ সরকারকে ঠকানোই আপনার পেশা।

সমীর সেনের কথায় আমি একটু লজ্জা বোধ করলুম। আমার আত্ম-সম্মানে আঘাত লাগলো। তাই প্রতিবাদ করলুম: স্মাগলিং হল আমার সাইড বিজনেস্‌। ঠিক কেরিয়ার নয়।

: আপনি নিশ্চয় বারের মেয়েদের ঠকান জি-বি-এম। বইয়ে-উপন্যাসে পড়েছি যে নাইট ক্লাবের বারম্যানেরা মেয়েদের বিস্তর ঠকায়। বলুন, এই অভিযোগের কতোটুকু সত্যি? মিসেস সেন জিজ্ঞেস করলেন।

মিসেস সেনের এই প্রশ্নে বিস্মিত হলুম। বারম্যানদের সম্বন্ধে কারও যে এতো নীচু ধারণা থাকতে পারে, কল্পনা করিনি। তাই ওর ভুল ধারণা সংশোধন করার চেষ্টা করলুম : আমি বারের মেয়েদের কখনো ঠকাইনে মিসেস সেন। হ্যাঁ, তবে একটা কথা অস্বীকার করবো না। মেয়েদের কাছে টাকা পয়সার হিসেব বুঝিয়ে দেয়া সহজ কথা নয়। সামান্য ভুলচুক হওয়া অতি স্বাভাবিক। ওরা একটা কথাই বার বার জিজ্ঞেস করবে। আপনি হিসেব পত্রের নিকেষ দিলেন কিন্তু ওদের মন উঠলো না। বলুন এবার কী করবেন? ওরা বলবে আমি পয়সা চুরি করেছি।

হয়তো আমার জবাব মিসেস সেনকে সন্তুষ্ট করলো। উনি একটু হাসলেন।

সমীর সেন উঠবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। অতএব রেস্তোরাঁর বিল চুকিয়ে আমরা উঠে পড়লুম। সমীর সেন কনট সার্কাসে গেলেন। আমি ইম্পিরিয়াল হোটেলে চলে এলুম।

*　　　*　　　*　　　*

পরের দিন জিমখানা ক্লাবে হুইস্কির গ্লাস নিয়ে বসেছিলুম। তখনও সন্ধ্যার বাতি জ্বলে ওঠেনি। ক্লাবে লোকজনের ভিড় হয়নি। আপন মনে বহু অবান্তর কথা ভাবতে লাগলুম। দশটা দিন দেখতে দেখতে কেটে গেলো, কিন্তু এখনও কাজ শুরু হয় নি। এমনি মন্থর গতিতে কাজ চললে আমাকে বেশ কয়েকটা মাস ভারতবর্ষে কাটাতে হবে। দীর্ঘকাল এই দেশে থাকা আমার কল্পনার অতীত। হয়তো মানিকলালের মৃত্যু না ঘটলে আমাদের কাজ শুরু হয়ে যেতো। ভাবনা চিন্তা বাড়লো। আমার কাছে প্রতিটি দিনই মূল্যবান। মনে হলো আমি জীবনটাকে হাতের মুঠোয় পুরে নিয়ে চলেছি। পুলিশ হয়তো আমার উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে। আমার কাজে একটু ভুল চুক হলেই দীর্ঘ কয়েদ বাস একেবারেই অনিবার্য।

আমার চিন্তাধারায় বাধা পড়লো। পেছন থেকে কে যেন আমার নাম ধরে ডাকলো। : জি-বি-এম।

তাকিয়ে দেখলুম, সমাদ্দার। উনি আমার পাশে এসে বসলেন। ওয়েটারকে ডেকে বললেন : স্কচ অন দি রকস।

তারপর আমাকে বললেন : হাউ ইজ লাইফ? শুনলাম মিসেস সেনের সঙ্গে আপনার প্রেমালাপ বেশ কুলপী বরফের মত জমে উঠেছে।

সমাদ্দারের কথা শুনে আমি একটু হকচকিয়ে গেলুম। মিসেস সেন আমার সঙ্গে দুটো মিষ্টি কথা বলেছেন, একথা যে সমাদ্দারের কান অবধি পৌঁছুবে আমি কখনও কল্পনা করিনি।

ইতিমধ্যে সমাদ্দারের ড্রিংকস এলো। উনি ওর গ্লাসটা আমার গ্লাসে ঠেকিয়ে বললেন: অল সাকসেস টু ইয়োর লভ্।

আমি একটু লজ্জা পেলুম। প্রথম ভাবলুম কোন জবাব দেবো না। হঠাৎ মনে হলো সমাদ্দারের অভিযোগ খণ্ডন করা দরকার। বললুম: প্রেম নয়, তবে মিসেস সেনকে আমার ভালো লেগেছে। জানেন সমাদ্দার সাহেব, সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র।

: চমৎকার জি-বি এম, চমৎকার। নিশ্চিন্ত মনে চোখ বুঁজে প্রেম করতে সঙ্কোচ বোধ করবেন না। কারণ পুলিশের মনের সন্দেহ ভাঙতে হবে। আপনি প্রেমিক, নাইট ক্লাবের বাবুয়ান। মেয়ে মানুষের প্রতি আপনার প্রচুর আসক্তি আছে—এই ধারণাটা ওদের মনে জন্মালে আমাদের কাজে সুবিধে হবে। ওদের ধোঁকা দিতে চাই। তাই তো আপনাকে বললুম,—মেক লভ্ এ্যাণ্ড এনজয় লাইফ। দেখবেন ভারতীয় পুলিশ একেবারে বোকা বনে গেছে।

সমাদ্দারের কথা শুনে আমার মনে হলো লোকটা পাগল হয়ে গেছে। নইলে প্রেম করার জন্য কী এমনি পিড়াপিড়ী কেউ করতে পারে। কিন্তু ভেবে দেখলুম, সমাদ্দারের কথায় কিছু যুক্তিও আছে। কারণ পুলিশের দৃষ্টি এড়াবার জন্যে জাল প্রেমের অভিনয় একান্ত আবশ্যক।

সমাদ্দার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন: মিসেস সেন আপনার মনে গভীর দাগ কেটেছেন, তাই নয় কী?

সমাদ্দারের কথায় আমি কোন রাগ প্রকাশ করলুম না! বরং জানালুম যে সমীর সেনকে আমার একেবারেই পছন্দ হয় নি। বললুম: জানেন, সমীর সেন লোকটা বড়ো দাম্ভিক। মিসেস সেনকে একেবারে আঁকড়ে ধরে বসে আছেন। তার গিন্নীর সঙ্গে নিভৃতে দুটো কথা বলারও যো নেই।

আমার কথা শুনে সমাদ্দারের মুখ বেশ গম্ভীর হলো। উনি জিজ্ঞেস করলেন: দাম্ভিক, হঠাৎ এই ধারণা আপনার জন্মালো কী করে?

: আপনার প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারবো না। কেন জানিনে আমার মন বলছে সমীর সেন খুবই দাম্ভিক প্রকৃতির লোক। আচ্ছা, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করছি—মিসেস সেনকে কী বিশ্বাস করা যায়?

: হ্যাঁ, ওকে আপনি পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেন। উনি আমাদের পার্টির লোক। ওর প্রতি আমাদের পুরো আস্থা আছে। সমীর সেন আমাদের

দলের লোক নয়। অতএব ওর ওপরে আমরা সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারিনে। ওই সেন গিন্নী কর্তার তীক্ষ্ণ নজর রাখেন।

: আশ্চর্য। স্ত্রী স্বামীর উপর নজর রাখছে! না, আপনার এই জবাব বেশ খানিকটা কৌতূহল আছে বটে, আমি বললুম।

: জি-বি-এম, আপনাকে একটি অতি গোপন কথা বলছি। সমীর সেন আর মিসেস সেনের মধ্যে বিয়ে আদপেই হয় নি। ওরা শুধু স্বামী স্ত্রীর অভিনয় করছেন। সমীর সেন আমাদের পার্টির মেম্বার নন। কিন্তু কাজের জন্য ওকে আমাদের দরকার। আজ বর্ডার কমিটির রিপোর্ট, কাল সৈন্য বাহিনীর গতিবিধি কিংবা রাশিয়া আমেরিকা থেকে কতোটা আর্মস আসছে সেই সব খবরের জন্যেই সমীর সেনকে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। শুধু কী তাই, কোন্ সরকারী কর্মচারী কোন্ ফাইল দেখছেন তার খবরাখবরও আমরা সমীর সেনের কাছ থেকে পাই। কিন্তু ওর সঙ্গে আমরা দৈনন্দিন যোগাযোগ রাখতে পারিনে। কারণ এই যোগাযোগ রাখার অনেক বিপদ আছে, পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। অতএব মিসেস সেনকে ওর সঙ্গে জুড়ে রেখেছি। বাজারে সবাই জানে ওরা স্বামী স্ত্রী। তাই কারও মনে কোন সন্দেহ জাগতে পারে না। আমরা গোপনে মিসেস সেনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখি। কিন্তু আপনাকে একটি কথা বলতে চাই জি-বি-এম। মিসেস সেনের প্রতি যেমন আপনার দুর্বলতা আছে, সমীর সেনেরও তেমন বেশ কিছুটা দুর্বলতা আছে। আপনি মিসেস সেনের সঙ্গে প্রেম করছেন দেখে ওর একটু হিংসে হয়েছে।

যাক, বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করতে চাইনে। এবার আপনার কাজ নিয়ে আলোচনা করা যাক। সমীর সেন আপনাকে নিশ্চয় বলেছেন যে উনি দু এক দিনের ভেতর এক কপি বর্ডার এরিয়া কমিটির রিপোর্ট যোগাড় করবেন। আপনার প্রথম কাজ হলো এই রিপোর্টটি মিসেস সেনের কাছ থেকে সংগ্রহ করা।

কী করে এই রিপোর্ট সংগ্রহ করবেন তার একটা প্ল্যান আপনাকে দিচ্ছি জি-বি-এম, আপনি কি সিনেমা দেখতে ভালোবাসেন?

সমাদ্দারের প্রশ্নে আমি একটু হকচকিয়ে গেলুম। স্পষ্ট বললুম যে আমার সিনেমা দেখার রুচি নেই।

: তবু আপনাকে একবার কাল রিভোলী সিনেমাতে যেতেই হবে। এই নিন আপনার সিনেমার টিকিট। তিনটের ম্যাটিনি শো। হল ঘরের বাতি নেভার সঙ্গে সঙ্গে মিসেস সেন এসে আপনার পাশের সিটে বসবেন। ওই অন্ধকারে আপনারা প্রেমের অভিনয় করবেন। আপনাদের প্রেম, কথাকে

দেখে দর্শকদের মনে ধারণা হবে যে আপনারা বাড়ী থেকে পালিয়ে সিনেমাতে বসে লুকোচুরি করে প্রেম করছেন। শো'র মাঝখানে মিসেস সেন আপনাকে বর্ডার এরিয়া কমিটির রিপোর্ট দেবেন। আপনি সেদিনকার এক কপি স্টেটসম্যান কাগজ সঙ্গে নিয়ে যাবেন। এবার সেই কাগজের ভেতর রিপোর্টটি পুরে নেবেন।

সিনেমা শেষ হবার পর আপনি কনট সার্কাসের পার্কের এক প্রান্তে গিয়ে বসবেন। দশ মিনিট বাদে আর একটি লোক আপনার কাছে আসবে। লোকটি আপনাকে জিজ্ঞেস করবে: স্যার কলকাতা ফুটবল ম্যাচের রেজাল্ট কি বলতে পারেন? ইষ্টবেঙ্গল মোহনবাগানের ভেতর কে জিতলো? আপনি এবার স্টেটসম্যানের কপিটি ওর হাতে দেবেন। ওর হাতে থাকবে হিন্দুস্থান টাইমস। আপনি ওর কাগজখানা চেয়ে নেবেন। আপনার কাগজের ভেতর বর্ডার এরিয়া কমিটির রিপোর্ট থাকবে। অতএব আপনার স্টেটসম্যান কাগজের সঙ্গে সঙ্গে বর্ডার এরিয়া কমিটির রিপোর্টও পাচার হয়ে গেলো।

তারপর ট্যাক্সী করে সোজা চলে আসুন ওবেরয় হোটেলে। বারে গিয়ে হুইস্কি নিয়ে মুখটা ভিজিয়ে নিন। খানিক বাদে পাবলিক টেলিফোন বুথে যাবেন। সেখান থেকে ৩০২৪২২ নম্বরে টেলিফোন করুন। একটানা দু'মিনিট টেলিফোন বাজতে দিন। যদি টেলিফোন এনগেজড না পান তাহলে একটা ট্যাক্সী করে ১০।১ লোদী রোডে চলে আসবেন। আর যদি লাইন এনগেজড পান তাহলে বুঝবেন যে আমি রিপোর্ট পাই নি। খানিকটা সময় দেরী করুন। তারপর আবার টেলিফোন করুন। যদি লাইন ক্লিয়ার থাকে এবং টেলিফোন বাজতে থাকে তাহলে লোদী রোডে চলে আসবেন।

এবার আমার প্রশ্ন করার পালা। রিপোর্ট সংগ্রহ করার জন্যে এতো সতর্কতার কি প্রয়োজন জানিনে। জানবার ইচ্ছে হলো। সমাদ্দারকে জিজ্ঞেস করলুম। উনি আমার প্রশ্ন শুনে একটু মৃদু হাসলেন। বললেন: জি-বি-এম পুলিশ আপনার পেছনে ঘুরছে। না, সিনেমার ভেতর আপনি মিসেস সেনের সঙ্গে যে প্রেম করেছেন সেই প্রেমের অভিনয়ে ভুলবার পাত্র নয় পুলিশ। অতএব পুলিশ ঠিকই আপনার পেছু নেবে। সুতরাং আপনার প্রথম কর্তব্য হলো রিপোর্টটাকে অন্যের হাতে পাচার করে দেয়া। রিপোর্ট পাচার করলেন, এবার পুলিশকে ধোঁকা দিতে হবে। অতএব এলেন ওবেরয়ের বারে। মদের গ্লাস নিয়ে বসলেন। কল্পনা করুন, পুলিশও আপনার মুখোমুখি বসেছে। সেখান থেকে আপনি আমাকে টেলিফোন করুন। হয়তো পুলিশ আপনার লাইন ট্যাপ করবে। তাই আমার দিক থেকে কোন জবাব পাবেন না। জবাব

না পেলে বুঝবেন আমি রিপোর্ট পেয়েছি। আর লাইন এন্‌গেজড থাকলে বুঝবেন রিপোর্ট পাইনি। অতএব খানিকটা সময় অপেক্ষা করুন। এরপর আপনার কাজ হবে পুলিশের চোখে ধুলো দেয়া। সেই কাজ কী করে করতে হয় এ আপনার বিলক্ষণ জানা আছে। আপনি স্মাগলার, কাষ্টমসকে ফাঁকি দিয়েছেন বহুবার। আপনার কাজ আপনিই ভালো জানেন।

সমাদ্দারের কথায় সত্যিই আমি আকৃষ্ট হলুম। সমস্ত প্ল্যান একেবারে নিখুঁত। না, এর পরে কারু সাধ্যি নেই যে আমাদের পাকড়াও করে।

সমাদ্দার বললেন: আমাদের জি.এ্য আওয়াজ হলো রাত বারোটা। অর্থাৎ সেই সময়ে আমরা ট্রান্সমিশন শুরু করবো। তার আগেই আপনাকে ট্রান্সমিটার বসাতে হবে। এক্স-দের কাছে সিগন্যাল পাঠাতে হবে।

এই কথাবার্তার ভেতরে আমি কিন্তু মিসেস সেনের অস্তিত্বকে একেবারেই ভুলে গিয়েছিলুম। হঠাৎ যখন ওর কথা মনে পড়লো, তখন জিজ্ঞেস করলুম: সিনেমা থেকে বেরিয়ে মিসেস সেন কী করবেন? আমার এই প্রশ্নে ছিলো উৎকণ্ঠার সুর।

: মিসেস সেনের জন্যে অনর্থক চিন্তা করছেন। আপনি মিসেস সেনের প্রেমে পড়েছেন সত্যি, কিন্তু ওর জন্যে মাথা ঘামাবেন না। আমাদের কাজে মনের দুর্বলতা থাকলে চলে না। সামান্য একটু ভুল ত্রুটির জন্যে হয়তো প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে। সিনেমা থেকে বেরিয়ে আপনি সোজা পার্কে চলে যাবেন। মিসেস সেন একখানা ট্যাক্সী করে বাড়ী ফিরে যাবেন।

সমাদ্দারের কথায় আমি বেশ খানিকটা লজ্জা পেলুম। বুঝতে পারলুম যে মিসেস সেনের প্রসঙ্গ নিয়ে আর আলোচনা করে লাভ নেই।

সমাদ্দার বলতে লাগলেন: স্পাই-এর কাজের মতো বিপজ্জনক কাজ আর নেই। এই কাজে প্রতি মুহূর্তেই যে জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন সে কথা ভুলবেন না। আপনি স্মাগলার ছিলেন এম। সেই কাজে জীবনের মূল্য যে কতোটুকু তা ঠিক বোঝা যায় না। কিন্তু যেই মুহূর্তে স্পাই হলেন, সেই মুহূর্ত থেকে আপনি প্রতি মিনিট প্রতি সেকেণ্ড গুনতে লাগলেন। কারণ, যে কোন মুহূর্তেই আপনার প্রাণ নিয়ে টান পড়তে পারে। স্মাগলিং করতে গিয়ে ধরা পড়লে সাজা বড়োজোর কয়েক বছরের জন্য কারাবাস। বলুন, আমার কথা সত্যি কিনা? যাক, এনাদার হুইস্কি? সমাদ্দার জিজ্ঞেস করলেন।

হুইস্কি অফার আমি কোন দিনই প্রত্যাখ্যান করিনে। বললুম: থ্যাঙ্কস।

হুইস্কি এলো। অনেকক্ষণ একটানা কথা বলে মাথা ধরে গিয়েছিলো। হুইস্কির গ্লাসে বেশ লম্বা চুমুক দিলুম। ভাবলুম, হুইস্কির নেশায় হয়তো মাথাটা

একটু পরিষ্কার হতে পারে।

ইতিমধ্যে আমাদের গল্পের আসর আবার জমে উঠলো। সেদিন সমাদ্দার বেশ খোসমেজাজে ছিলেন। তাই অনর্গল বেশ খানিকটা বকতে লাগলেন। তার ছাত্র জীবনের কথা বললেন। সে কাহিনীতেও সমাদ্দার বক্তা এবং আমি শ্রোতা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে সমাদ্দার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে সবগুলো পরীক্ষা পাশ করেছিলেন। পারিবারিক অবস্থা সচ্ছল ছিলো। তাই পয়সা-কড়ির চিন্তা কখনোও করতে হয় নি। চাকরী না করে সমাদ্দার গেলেন বিলেতে। অক্সফোর্ডে আরো বড়ো ডিগ্রীর সন্ধানে। সেখানে সেন্ট এন্থনী কলেজের ছাত্র হলেন। অক্সফোর্ড থেকে পাশ করে ব্যারিস্টারী পড়লেন। এই সময়ে সমাদ্দার সর্ব প্রথম দলের সংস্পর্শে আসেন। সমস্ত দুনিয়াময় তখন বামপন্থী আন্দোলনের স্রোত বইছে। সমাদ্দার এই আন্দোলনে আকৃষ্ট হলেন। দেশে ফিরে এসে সমাদ্দার রাজনীতিতে যোগ দিলেন। পার্টির ওয়ার্কার হলেন। তার জীবনের ওপর দিয়ে কতো ঝড়-ঝাপ্টা বয়ে গেলো তার কোন হিসাব রাখেন নি।

তারপর দেশ স্বাধীন হলো। সমাদ্দারও দলের একজন গণ্য মান্য সভ্য হলেন। বলতে পারেন, দলের নেতার পদ পেলেন। এবার থেকে সমাদ্দারের কাজ হলো বিদেশী সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা। এই কাজ করতে সমাদ্দার দিল্লীতে এলেন।

সমাদ্দারের জীবন কাহিনী শুনে আমি আকৃষ্ট হলুম। কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারলুম না। অক্সফোর্ড থেকে পাশ করে সমাদ্দার হলেন স্পাই। আর গোবিন্দ বড়াল মালকানী গোল্ড স্মাগলিং এর মেয়েমানুষ ঘেটে হলো স্পাই। অক্সফোর্ডের ছাত্র আর নাইট ক্লাবের বারম্যানের কী একই মূল্য? একেই বলে জীবনের পরিহাস। লাক্।

ইতিমধ্যে বেশ কয়েক পেগ হুইস্কি আমার পেটে পড়েছিলো। মদের নেশা বেশ তীব্র হলো। জানিনে হঠাৎ কেন আমার গানের নেশা চাপলো। আমার কণ্ঠে গান শুনে সমাদ্দার মৃদু হাসতে লাগলেন। কিন্তু তার পরেই হয়তো আবার বিপদের আশংকা করলেন।

তাই উনি আমাকে প্রায় জোর করেই জিমখানা ক্লাব থেকে বের করে আনলেন। বেশ রাত হয়েছিলো। প্রায় দেড়টা। আমাদের ইতিতে হলো। কোথাও ট্যাক্সির দেখা পেলুম না। সমাদ্দার আউরংজেব রোডে থাকতেন। উনি ওর বাড়ীতে চলে গেলেন। বেশ খানিকটা হাঁটার পর আমি একটা

ট্যাক্সি পেলুম। ড্রাইভার ঘুমোচ্ছিলো। আমি ওর ঘুম ভাঙালুম। বললুম: ইম্পিরিয়াল হোটেল।

*   *   *   *

আমি সিনেমার পোকা নই। কিন্তু সেদিন আমাকে কাজের খাতিরে রিভোলী সিনেমায় আসতে হলো। সিনেমা হলে আসার আর একটা গৌণ কারণও ছিলো। মিসেস সেনের সান্নিধ্য পাবার জন্যে আমি উৎকণ্ঠিত হয়েছিলুম। ম্যাটিন শো, হল ঘরে বেশ লোক হয়েছে। লাউঞ্জের চারদিকে পাবলিসিটি পোস্টার, অভিনেতা অভিনেত্রীদের কামনালুব্ধ ছবি টাঙানো। আমি লাউঞ্জের চার পাশে ঘুরে ঘুরে এই সব ছবি দেখতে লাগলুম।

একটু বাদেই ছবি শুরু হলো। আমি হলঘরে ঢুকলুম। হলের একপ্রান্তে আমার সিটে গিয়ে বসলুম।

আপনাদের আগেই বলেছি, সেদিন আমার সিনেমা দেখার কোন আকাঙ্ক্ষাই ছিলো না। মিসেস সেনের জন্যেই আমার মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলো। ছবি আরম্ভ হবার বেশ খানিকটা বাদে মিসেস সেন এলেন। অন্ধকারে ওর সাজসজ্জা ভালো করে দেখতে পাইনি। কিন্তু ওর সুরভিত দেহের গন্ধ আমার নাকে এসে ঢুকলো। মনটা তীব্র ও চঞ্চল হয়ে উঠলো সেই গন্ধে। মিসেস সেন আমার পাশের সিটে এসে বসলেন। তারপর অতি মৃদু কণ্ঠে বললেন: বড্ডো দেরি হয়ে গেলো, তাই নয় কী? কী করবো বলুন, রাস্তায় এতো ভিড় ছিলো যে জনপথ থেকে সিনেমার হলঘর অবধি হেঁটে আসতে হলো।

আমি কোনো জবাব দিলুম না। মৃদু হাসলুম। মিসেস সেন হয়তো ভাবলেন, আমি রাগ করেছি। খানিক বাদে মিসেস সেন তার একখানা কোমল হাত আমার হাতের ওপর রাখলেন।

হয়তো পেছনের সিটের ভদ্রলোক আমাদের প্রেমের এই লুকোচুরি খেলা দেখছিলেন। উনি গলা দিয়ে একটা শব্দ বের করলেন। আমি ওর পানে বেশ কঠোর দৃষ্টিতে তাকালুম।

আমার কঠোর দৃষ্টি দেখে ভদ্রলোক একটু অপ্রস্তুত বোধ করলেন।

কতোক্ষণ মিসেস সেন তার কোমল হাতটি আমার হাতের ওপর রেখেছিলেন স্মরণ নেই। আমি সুখের স্বপ্নে বিভোর ছিলুম। হঠাৎ মনে হলো উনি ভ্যানিটি ব্যাগ খুলছেন। তারপর আমার ডান হাতে একটি কাগজের বাণ্ডিল দিলেন। কোন কথা বললেন না। সেই কাগজের প্যাকেটটা হাতে নিতে আমি বেশ একটু উত্তেজিত হয়েছিলুম। তাকিয়ে দেখবারও সাহস পেলুম না। না, কোন সন্দেহ

নেই, এই হলো ভারত সরকারের টপ্ সিক্রেট ডকুমেন্ট।

ছবি শেষ হলো। আমি সিনেমা থেকে বেরিয়ে এলুম। পেছনের সিটের ভদ্রলোক দু-একবার কঠোর দৃষ্টিতে আমার পানে তাকালেন। কিন্তু আমি ওর দিকে কোন নজর দিলুম না।

সিনেমার বাইরে এসে মিসেস সেন একটা ট্যাক্সি ধরলেন। সমাদ্দারের নির্দেশ মতো আমি ওর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলুম না।

এবার আমি কনট সার্কাসের পার্কে এলুম। সিনেমাতে যাবার আগে আমার হাতে ছিলো সেদিনকার এক কপি স্টেটস্‌ম্যান। সেই কাগজের ভেতরে বর্ডার এরিয়া কমিটির রিপোর্টটি পুরে নিয়েছিলুম। স্টেটস্‌ম্যান কাগজের কপি নিয়ে আমি পার্কের এক বেঞ্চিতে গিয়ে বসলুম।

বেশ খানিকটা সময় কেটে গেলে। কিন্তু সমাদ্দারের লোকের কোন দেখা পেলুম না। ভাবতে লাগলুম কী করা যায়। সন্ধ্যা প্রায় ঘনিয়ে এসেছিলো। ধীরে ধীরে পার্ক প্রায় নির্জন হয়ে আসছিলো। অন্ধকারে একা একটা বেঞ্চিতে বসে থাকতে বেশ অসোয়াস্তি বোধ করছিলুম।

খানিক বাদে আমার পাশে একটি লোক এসে বসলেন। বুড়ো ভদ্রলোক। তার হাতে ছিলো এক কপি হিন্দুস্থান টাইমস্। ভদ্রলোক সেধে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন। বললেন,

: আপনি স্মোক করেন স্যার? হ্যাভ ম্যাচেস্?

উত্তেজনায় আমার বুক কাঁপতে লাগলো। বুঝতে পারলুম, উনিই সম্ভবত সমাদ্দারের লোক হবেন। এবার নিশ্চয় মারলবরোর প্যাকেট বের করবেন। আমার সমস্ত সন্দেহ দূর হয়ে যাবে। আমি সিগারেট লাইটার বের করে ওর হাতে দিলুম।

: থ্যাঙ্কস্। ভদ্রলোক বেশ নীরস কণ্ঠেই জবাব দিলেন। কিন্তু তারপরই পকেট থেকে এক প্যাকেট সিজারস সিগারেট বের করলেন।

না, উনি সমাদ্দারের লোক নন। আমি একটু নিরাশ হলুম। শুধু নিরাশ নয় একটু সতর্কও হলুম। কেন ভদ্রলোক আমার পাশে এসে বসলেন? কী কারণ? কী উদ্দেশ্যে জানিনে। হয়তো উনি পুলিশের লোক। হয়তো অতি সাধারণ অন্য কোন লোক, নিত্য নৈমিত্তিক সান্ধ্য ভ্রমণে বেরিয়েছেন। আমাকে পার্কের বেঞ্চিতে একা বসে থাকতে দেখে যেচে আলাপ করতে এসেছেন। ভদ্রলোক তার মুখ খুললেন। বললেন: আজ ভোরবেলায় কাগজে লোকসভার বিবরণী পড়েছেন? জনসংঘের নেতা চমৎকার বক্তৃতা দিয়েছেন। সরকারকে এতো কোণঠাসা এর আগে কেউ কখনও করতে পারেনি।

আমি চুপ করে রইলুম। কোন জবাব দিলুম না। ভাবতে লাগলুম, কী করে ভদ্রলোকের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। এক বেঞ্চি থেকে অন্য বেঞ্চিতে উঠে বসতে পারি। তাহলেই হয়তো ভদ্রলোক আমাকে সন্দেহ করবেন। না, একটা উপায় আমাকে বের করতেই হবে।

ভদ্রলোক অনর্গল বকতে লাগলেন। আমি ওর কোন কথারই জবাব দিলুম না। হয়তো আমার এই তাচ্ছিল্য ভাব দেখে ভদ্রলোকের মনে একটু সন্দেহ হলো। উনি আমাকে প্রশ্ন করলেন,

: স্যার আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ?

আমি নির্লিপ্ত কণ্ঠে জবাব দিলুম : বলুন।

: আপনার রাজনীতি, আই মীন পলিটিক্স ভালো লাগে ?

ভদ্রলোকের প্রশ্ন শুনে আমি একটু বিস্মিত হলুম। অতএব বেশ একটু নীরস স্বরে জবাব দিলুম : না, আমার পলিটিক্সে কোন রুচি নেই।

কেন হঠাৎ এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন ? আমি কৌতূহল প্রকাশ করে বললুম।

: আপনার হাতে দেখছি স্টেটসম্যানের একটা কপি। আজকের স্টেটসম্যানের এডিটোরিয়াল পড়েছেন ? কংগ্রেসকে কষে গালিগালাজ করেছে স্টেটসম্যান। আমি ভাবলুম, আপনি সেই এডিটোরিয়াল পড়েছেন। তাই ভাবলুম আপনার সঙ্গে দেশের রাজনীতি নিয়ে একটু আলোচনা করবো। যাক, আপনার স্টেটসম্যান কাগজটি দিন না একবার।

ভদ্রলোকের কথা শুনে আমি আকাশ থেকে পড়লুম। লোকটা কী পাগল না স্পাই ? কেন আমার সঙ্গে যেচে আলাপ করছেন জানিনে। আমি কোন জবাব দেবার আগেই লোকটি আমার হাত থেকে স্টেটসম্যান কাগজটি কেড়ে নিলেন। কাগজের ভেতরে ছিলো বর্ডার এরিয়া কামটির রিপোর্ট। রিপোর্টটি মাটিতে পড়ে গেলো। আমি তাড়াতাড়ি রিপোর্টটি লুফে নিলুম। আমাকে ব্যস্ত হয়ে রিপোর্টটি তুলতে দেখে ভদ্রলোক একটু বিস্মিত হলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন : জরুরী কাগজ ?

: হ্যাঁ। আমি বেশ একটু বিরক্তি মিশ্রিত কণ্ঠেই জবাব দিলুম। ভদ্রলোকের কাণ্ডকারখানা দেখে আমার বড্ডো রাগ হয়েছিলো। বিশেষ করে আমার হাত থেকে স্টেটসম্যান ছিনিয়ে নেওয়া আমি একেবারেই পছন্দ করি নি। আর একটু হলেই হয়তো বর্ডার এরিয়া কামটির রিপোর্ট এর চোখে পড়তো। উনি দেখতে পেতেন বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা আছে "টপ সিক্রেট।" সর্বনাশ! কথাটা ভাবতেই আমার মাথা ঘুরতে লাগলো।

আমি ভদ্রলোকের সঙ্গে ঝগড়া করলুম না। লাভ নেই।

বুড়ো ভদ্রলোক কিন্তু স্টেটসম্যান পড়লেন না। সন্ধ্যার স্তিমিত আলোয় কাগজ পড়া সম্ভবও ছিলো না। তাই আমার মনের সন্দেহ বাড়লো। ভাবতে লাগলুম, কী উদ্দেশ্যে ভদ্রলোক আমার হাত থেকে কাগজ ছিনিয়ে নিলেন! একটু পরেই বুড়ো ভদ্রলোক আমাকে কাগজ ফেরত দিলেন। কাগজ ফেরত দিয়ে সংক্ষেপে বললেন: ধন্যবাদ। ওর মুখ দেখে মনে হলো উনি আমাকে সন্দেহ করেছেন।

একটু বাদে ভদ্রলোক চলে গেলেন। যাবার আগে আমার পানে বেশ কঠোর দৃষ্টিতে তাকালেন।

এবার আমি কাগজের ভেতর অতি সন্তর্পণে টপ সিক্রেট ডকুমেণ্ট ভরলুম। তার পর ভাবতে লাগলুম কী করা যায়। কতোক্ষণ আর সমাদ্দারের সাগরেদের জন্যে প্রতীক্ষা করা যায়। সময় বয়ে যাচ্ছে। এই কমিটিং রিপোর্ট সমাদ্দারের অনুচরের হাতে দিয়ে আমাকে এবেরয়ের হোটেলে ফিরে যেতে হবে। তারপর সেখান থেকে ১০১১ লোদী রোডে যাবো। সেইখানে আমার কাজ শুরু হবে। আমার হাতে বিস্তর কাজ আছে। অতএব মনে চিন্তা হওয়া স্বাভাবিক।

এই কথা ভাবতে ভাবতে আমি পকেট থেকে মার্লবরো সিগারেটের প্যাকেট বের করলুম। একটি সিগারেট ধরালুম। এমনি সময় কে যেন আমাকে পেছন থেকে ডাকলো,

: সরি স্যার, আপনার হাতের ওই কাগজটা কি আজকের স্টেটসম্যান?

পেছন থেকে ডাক শুনে আমি একটু বিস্মিত হলুম। দেখলুম একটি কুড়ি পঁচিশ বছরের ছেলে সাইকেল হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেটি আমার পানে তাকিয়ে মৃদু হাসছিলো।

: হ্যাঁ, কেন বলুন তো? আমি জিজ্ঞেস করলুম।

: স্যার, কলকাতার ফুটবল ম্যাচের রেজাল্ট বলতে পারেন? আমি মোহনবাগান আর ইষ্টবেঙ্গলের খেলার রেজাল্ট জানতে চাইছিলুম, ছেলেটি বললো।

ছেলেটি কে আমি বুঝতে পারলুম? এই হলো সমাদ্দারের সাগরেদ। ছেলেটির পানে আমি তাকিয়ে দেখলুম। ছেলেটির হাতে রয়েছে হিন্দুস্থান টাইমস। আমাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে দেখে ছেলেটি বললো: আমার হাতের কাগজটা হলো হিন্দুস্থান টাইমস। এই কাগজে কলকাতার ফুটবল ম্যাচের খবর নেই। তাই একবার আপনার স্টেটসম্যান কাগজটা দেখতে চেয়েছিলুম।

আমি আর কোন ভনিতা করলুম না। স্পষ্ট বললুম : বড্ডো দেরি করে এসেছেন ?

: দেরি আমি করিনি। আপনি করেছেন। অনেকক্ষণ ধরে এই বেঞ্চিতে বসে আছেন। আমি তো আপনার দিকেই তাকিয়ে ছিলুম। কিন্তু কী করে বুঝবো যে বর্ডার এরিয়া কমিটির রিপোর্ট আপনিই নিয়ে এসেছেন। আপনি তো কোন নিশানা দেন নি।

: কেন সমাদ্দার বলেনি…

আমার কথা শেষ হবার আগেই ছেলেটি একটু তিরস্কারের সুরে বললো : কারো নাম উচ্চারণ করবেন না। নাম বলা নিষেধ। না, দেরি আপনিই করেছেন। কারণ অনেক দেরি করে আপনি মারলবরো সিগারেটে আগুন ধরালেন। আপনার হাতে মারলবরো সিগারেট দেখার পরে আমি বুঝতে পারলুম যে আপনিই রিপোর্ট এনেছেন।

সমস্ত ঘটনা এবার আমার কাছে পরিষ্কার হলো। বুঝতে পারলুম ছেলেটিকে বলা হয়েছিলো যে আমার হাতে মারলবরো সিগ্রেট থাকবে। এই সিগারেট দেখেই সে বুঝতে পারবে যে আমি ওদের দলের লোক। যাক তর্ক করে আমি আর সময় নষ্ট করলুম না। ছেলেটির হাতে স্টেটসম্যানের কপিটা দিলুম। ছেলেটি তার হাতের হিন্দুস্থান টাইমস আমাকে দিলো।

হঠাৎ আমার জানবার কৌতূহল হলো এতোক্ষণ যে বুড়ো ভদ্রলোক আমাকে জ্বালাতন করেছেন সেই লোকটি কে ? জিজ্ঞেস করলুম : আমার বেঞ্চিতে এতোক্ষণ যে লোকটি বসে ছিলো সেই লোকটি কে ?

ছেলেটি আমার কথায় বিশেষ কান দিলো না। উদাসীন কণ্ঠে বললো : জানিনে। তারপরেই সে রিপোর্ট নিয়ে চলে গেল।

ছেলেটি চলে গেল বটে কিন্তু সেই বুড়ো লোকটির কথা ভেবে আমি আতঙ্কিত হলুম। সত্যিই কী লোকটি পুলিশের কোন স্পাই না পাগল। এই ভাবনা যতোই আমার মনে উঁকি ঝুঁকি মারতে লাগলো ততোই আমার আশংকা বাড়তে লাগলো। কিন্তু আমি কী করতে পারি বলুন ? নিরুপায়। মনের আশংকা মনেই পুষে রাখা ছাড়া আর কোন উপায় ছিলো না।

*　　　*　　　*

কনট সার্কাস থেকে আমি ট্যাক্সী করে ওবেরয়ের হোটেলে এলুম। জন পথ ছাড়লে রাস্তায় আর ভিড় নেই। অতএব ওবেরয়ের হোটেলে পৌঁছুতে আমার বেশী সময় নিলো না। আমি হোটেলের বারে গিয়ে বসলুম। আমার সঙ্গে ড্রিঙ্কের পারমিট ছিলো। কাজেই বারে বসে অর্ডার দিলুম : হুইস্কি। একটু

বাদে ড্রিংকস এলো। আজকের হুইস্কি আমার কাছে অমৃত ধারা বলে মনে হলো। পার্কের বুড়োর কথা মন থেকে মুছে ফেলবার চেষ্টা করলুম। খানিকক্ষণ মদ গেলার পর মন আবার চঞ্চল হয়ে উঠলো। আমি ঘড়ির দিকে তাকালুম একবার। প্রায় আটটা বাজে। হঠাৎ আমার সমাদ্দারের কথা মনে পড়লো। আমি বার থেকে উঠে টেলিফোন বুথে গেলুম। তারপর সমাদ্দারের দেওয়া টেলিফোন নম্বরে ডায়েল করলুম। এনগেজড। বুঝতে পারলুম সেই রিপোর্ট এখনও সমাদ্দারের হাতে পৌঁছয় নি। আমার চিন্তা হলো। ভাবলুম, ছেলেটি আমাকে ধোঁকা দেয় নি তো। যদি ছেলেটি আমার সঙ্গে প্রতারণা করে থাকে তাহলে আমাকে হাঙ্গামায় পড়তে হবে। কিন্তু কী করা যায়।

বারে ফিরে এসে ওয়েটারকে বললুম: এ্যানাদার স্কচ্।

আমার কিন্তু সময় যেন আর কিছুতেই কাটতে চায় না। প্রতি মিনিট আমার কাছে এক একটা ঘণ্টা বলে মনে হলো।

বারে তখনও বেশি লোক হয়নি। যারা বসে আছে সবাই ট্যুরিস্টের দল। ওবেরয়ের বারে ম্যাজিক নেই। আনন্দ নেই কোনখানে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলুম প্রায় নটা। আবার উঠে টেলিফোন বুথে গেলুম। আবার সমাদ্দারের দেওয়া নম্বরে ডায়াল করলুম।

একটানা টেলিফোন বেজে চললো। বুঝতে পারলুম সমাদ্দার রিপোর্ট পেয়েছেন। মনের সন্দেহ মেটাবার জন্যে দ্বিতীয় বার টেলিফোন করলুম। না, কোন ভুল নেই। টেলিফোন বেজেই চলেছে। অর্থাৎ লাইন ক্লিয়ার। অতএব বারে বসে আর মদ গেলা যায় না। আমি মদের হিসেব চুকিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরলুম: বললুম এ্যাম্বাসাডার হোটেল।

আপনারা আমার মুখে এ্যাম্বাসাডার হোটেলের নাম শুনে নিশ্চয়ই বিস্মিত হয়েছেন। কিন্তু ট্যাক্সি ড্রাইভারকে এ্যাম্বাসাডার হোটেলে যাবার নির্দেশ দেবার একটি বিশেষ কারণ ছিলো। লোদী রোডের বাড়ীতে সোজাসুজি যেতে চাই নি। হয়তো ট্যাক্সীওয়ালার মনে কোন সন্দেহ জাগতে পারে। তাই ট্যাক্সীওয়ালার মনের সন্দেহ দূর করবার জন্যে আমি এ্যাম্বাসাডার হোটেলে এলুম। এ্যাম্বাসাডার হোটেলে পৌঁছে ট্যাক্সীর ভাড়া মেটালুম। তার পর রিসেপশন কাউণ্টারে গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম: ডবল রুমের ভাড়া কতো?

: ষাট টাকা উইথ ব্রেকফাস্ট, রিসেপশন ক্লার্ক জবাব দিলো।

: ধন্যবাদ। এই বলে আমি এ্যাম্বাসাডার হোটেল থেকে বেরিয়ে এলুম।

এ্যাম্বাসাডার হোটেল থেকে লোদী রোডের বাড়ী বেশী দূরে নয়। অল্প

খানিকটা পথ। আমি হেঁটেই রওনা দিলুম। পেছনে তাকিয়ে একবার দেখে নিলুম আমাকে কেউ লক্ষ্য করছে কি না। সাবধানের মার নেই। না, আমি কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করিনি। আমার মনে একটু শান্তি এলো। আমি লোদী রোডের পথ ধরে চললুম।

* * *

লোদী রোডের বাড়ীতে সমাদ্দার আমার জন্যে প্রতীক্ষা করছিলেন। একটা সিগারেট ধরিয়ে বারান্দায় তার হাঁটা দেখে বুঝতে পারলুম যে সমাদ্দার উত্তেজিত হয়েছেন।

উত্তেজিত ও চঞ্চল হবার যথেষ্ট কারণ ছিলো। ভারত সরকারের এতো মূল্যবান একটা ডকুমেন্ট হাতের মুঠোয় পাওয়া কী সহজ কথা। রিপোর্টের ওপরেই বড়ো অক্ষরে লেখা আছে 'টপ সিক্রেট'। এই দুটো শব্দ পড়লেই মন উত্তেজিত হয়ে ওঠে আপনা থেকেই।

আমাকে দেখে সমাদ্দার খুশী হলেন। আমাকে প্রায় জড়িয়ে ধরে বললেন : ডিয়ার জি বি-এম, আপনার জন্যেই দেরি করছিলুম। এবার কাজ শুরু করা যাক। অন টু দি ওয়াক।

তারপর কণ্ঠস্বর নীচু করে বললেন : চমৎকার কাজ করেছেন। এক্সেলেন্ট। আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে হবে। না জি বি এম, আপনি শুধু প্রফেশন্যাল স্মাগলার নন, আপনি হলেন প্রফেশন্যাল স্পাই। রিয়েল মাতাহরি

আমি কোন জবাব দিলুম না। আজ সমাদ্দারের কথায় মন খুশী হলো বটে কিন্তু মনের কথা ভাষায় প্রকাশ করলুম না।

আমি লোদী রোডের বাড়ীর চারদিকটা ঘুরে দেখতে লাগলুম। সামনে বেশ একটা বড়ো লন। বাড়ী খুব নির্জন। দেখলেই মনে হয় অনেক দিন বাড়ীতে কেউ বসবাস করে নি। সমাদ্দার বললেন : খালি বাড়ী, নিশ্চিন্ত মনে কাজ করা যাবে।

: বাড়ীর মালিক কে? আমি জিজ্ঞেস করলুম

: ভারত সরকার এস্টেট ডিপার্টমেন্ট। হেসে জবাব দিলেন সমাদ্দার। তার জবাবে একটু ব্যঙ্গের সুর ছিলো।

: জি বি-এম, আমরা ভারত সরকারের সব কিছুই আমাদের কাজের জন্যে ব্যবহার করছি। ভারত সরকারের গোপনীয় ডকুমেন্ট, ভারত সরকারের কর্মচারী বাড়ী আর ইলেকট্রিসিটি অবধি। বলুন, এর পর ভারত সরকারকে কি ধন্যবাদ না দিয়ে পারি?

হঠাৎ মনে পড়লো পার্কের সেই বুড়ো ভদ্রলোকের কথা। লোকটির কথা

ভাবতেই আমার মন খচখচ করে উঠলো। কেন জানিনে আমার মন বলতে লাগলো, শিগ্‌গীরই কোন একটা বিপদ ঘনিয়ে আসছে।

আমার মনের আশংকা আত্মপ্রবঞ্চনার। আমি বুড়োর কথা সমাদ্দারকে বললুম না।

এবার কাজ শুরু হলো। বিপজ্জনক কাজ করতে আমার মতো পটু এবং দক্ষ লোক কোথাও পাবেন না।

ঘরের এক প্রান্তে কিছু ওয়াল পড়েছিলো। সমাদ্দার সেই জঞ্জাল দেখিয়ে বললেন: ট্রান্সমিটার।

আমি ট্রান্সমিটারটার কাছে এগিয়ে গেলুম। অতি সন্তর্পণে প্যাকেট খুলে সেটটা বার করলুম। আমার সন্তর্পণতা দেখে সমাদ্দার একটু বিস্মিত হলেন। সেটটা ঝেড়ে পুছে পরিষ্কার করলুম।

ট্রান্সমিটার সেটটা দেখেই হতাশ হলুম। শুধু হতাশ নয়, আমার মনে একটু বিরক্তির ভাবও এলো। পুরনো সেট। বি টু মডেল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এই সেট প্রচুর ব্যবহার করা হতো। আজকাল একেবারেই অচল। হয়তো সেই হতাশার ভাব আমার মুখেও ফুটে উঠেছিলো। সমাদ্দার বেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বললেন: কী ব্যাপার জি-বি এম, ওনিথিং। মনে হচ্ছে এই সেট দেখে আপনি একটুও খুশী হন নি?

: আপনি আমার মনের কথাই বলেছেন মিঃ সমাদ্দার। হ্যাঁ, স্বীকার করবো যে এই ট্রান্সমিটার দেখে আমি একটুও খুশী হই নি। কারণ কী জানেন? আজকালকার বাজারে এই মেশিন একেবারেই অচল। না মিঃ সমাদ্দার, এই মেশিনের সাহায্যে খবর পাঠানো মানে নিজের বিপদকে ডেকে আনা।

আমার জবাব শুনে সমাদ্দারের মুখ গম্ভীর হলো। বুঝতে পারলুম, ওর মনে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়েছে।

: কেন বলুন তো? জিজ্ঞেস করলেন সমাদ্দার।

: বললুম তো, এই ধরনের মেশিন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে ব্যবহার করা হতো। কিন্তু সমাদ্দার সাহেব, আজকাল ট্রান্সমিটারের অনেক উন্নতি হয়েছে। শুধু ট্রান্সমিটারের উন্নতি নয়, কোথা থেকে ট্রান্সমিশন করা হচ্ছে তা খুঁজে বের করবারও অনেক নতুন পন্থা আবিষ্কৃত হয়েছে। এই যুগে পুরানো মেশিন ব্যবহার করা মানে শুধু কাজ ভণ্ডুল করা নয়, মৃত্যুকে বরণ করা।

: আপনি কী বলছেন জি-বি-এম? উত্তেজিত কণ্ঠে—সমাদ্দার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন।

: শুনুন সমাদ্দার সাহেব। আপনি এখান থেকে খবর পাঠাচ্ছেন, কিন্তু মনে রাখবেন যে আপনার ট্রান্সমিশনের প্রতিটি শব্দই ভারত সরকারের কর্মচারীরা টুকে নিচ্ছে। অর্থাৎ ওদের অজানা থাকছে না যে আপনি বি. টু. মেশিনের সাহায্যে খবর পাঠাচ্ছেন। আর আপনার বন্ধুরাও সেই খবর হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে হংকং-এ পাঠাচ্ছে। কিন্তু বন্ধুদের বিরুদ্ধে তো ভারত সরকার কিছু করতে পারে না। কারণ, তারা হলেন প্রিভিলেজড পার্সন। তাই ভারত সরকার আপনার আমার পেছনেই ঘুরবে। বের করার চেষ্টা করবে এই অজানা ট্রান্সমিশন কে করছে।

এই বলে আমি চুপ করলুম। সমাদ্দারও কোন জবাব দিলেন না, চুপ করে বসে রইলেন। আমি একটা সিগারেট ধরালুম। তারপর আবার বলতে লাগলুম: অজানা ট্রান্সমিশন স্টেশন খুঁজে বের করা আজকাল ছেলে খেলার কাজ। এর জন্য নতুন ধরনের এক ইলেকট্রনিক যন্ত্র বেরিয়েছে। এর নাম হলো ডিরেকশনাল ফাইণ্ডার। সংক্ষেপে বলা হয় ডি-ফিং। কোন ট্রান্সমিশন স্টেশন বের করতে হলে আপনি ডি-ফিং ব্যবহার করুন। একটি মোটরট্রাকে ডি-ফিং বসানো থাকে। আপনি যে কোন রেডিও স্টেশনের ফ্রিকোয়েন্সি নিন। ট্রাক থেকে সেই রেডিও স্টেশনের দূরত্ব আপনার জানা যাবে। দুটো পয়েন্টে লাইন কাটুন। এবার ডি-ফিং দিয়ে অনামী স্টেশনের ওয়েভ লেংথ বের করুন। বাস, এবার তিনটি পয়েন্টকে যোগ করে দিন। সাধারণ ট্রিগনোমেট্রি সমাদ্দার সাহেব, অতি সাধারণ ক্যালকুলেশন। বাস, অজানা স্টেশনের লোকেশন বেরিয়ে এলো। এবার ডি-ফিং নিয়ে লোকেশনে যান। বাড়ী খুঁজে নিতে একটুও অসুবিধে হবে না। এবার কল্পনা করুন, আমি বন্ধুদের কাছে খবর পাঠাচ্ছি। ভারতীয় পুলিশ ডি-ফিং ব্যবহার করে আমার লোকেশন বের করছে। একটু বাদেই পুলিশ আপনার দরজায় এসে পরোয়ানা নিয়ে হাজির হবে। বলুন, এবার আপনি কী করবেন। না সমাদ্দার সাহেব, এই ছেলে-খেলার কাজ করবেন না।

: কিন্তু সরকার তো যে কোন মেশিনের ট্রান্সমিশনই ডি-ফিং ব্যবহার করে লোকেশন বের করতে পারে। বি, টু, মেশিনের সঙ্গে ডি ফিং-র কী সম্পর্ক বলুন। ধরুন, আপনি সব চাইতে নতুন মডেলের কোন মেশিন ব্যবহার করলেন। সরকার ডি-ফিং ব্যবহার করে আপনার ফ্রিকোয়েন্সি বের করলো। তারপর? .....

সমাদ্দারের প্রশ্নে কৌতূহল ছিলো। সেই কৌতূহল মেটাবার জন্য আমি বললুম: আপনার কথায় যুক্তি আছে মিঃ সমাদ্দার। ডি-ফিংকে ফাঁকি

দেবার দুটো উপায় হলো প্রতি আড়াই মিনিট বাদে একবার করে ক্রুষ্টাল চেঞ্জ করা। ক্রুষ্টাল চেঞ্জ মানে ফ্রিকোয়েন্সি পাল্টানো। একটা কথা মনে রাখবেন মিঃ সমাদ্দার। ট্রান্সমিশন যদি আড়াই মিনিটের কম হয় তাহলে ডি-ফিং ব্যবহার করা যায় না। কারণ ডি-ফিং দিয়ে অজানা স্টেশনের ফ্রিকোয়েন্সি বের করতে প্রায় তিন মিনিট সময় লাগে। অতএব প্রতি আড়াই মিনিট পরে ক্রুষ্টাল চেঞ্জ করুন। ডি-ফিং আপনার লোকেশন বের করতে পারবে না।

এবার সমাদ্দারের জবাব দেবার পালা। আমার কথা শেষ হবার আগেই উনি বললেন : বি, টু, মেশিনেও আপনি ক্রুষ্টাল চেঞ্জ করতে পারেন তো ?

আমি সমাদ্দারের কথা শুনে হাসলুম। সমাদ্দার অন্য কাজে দক্ষ হতে পারেন বটে, কিন্তু রেডিও ট্রান্সমিশন ব্যাপারে তার কোন অভিজ্ঞতা নেই। উনি জানেন না কী করে খবর পাঠাতে হয়। তাই একটু দম্ভ করে বললুম : খবর পাঠানো অতো সহজ নয় সমাদ্দার সাহেব। শুধু বর্ডার এরিয়া কমিটির রিপোর্টটুকুই ষাট পাতা। দু'দিনের ট্রান্সমিশনের কাজ। প্রতি দিন ত্রিশ পাতা করে খবর পাঠাতে হবে। ত্রিশ পাতা মানে প্রায় হাজার গ্রুপের কাজ। এই হাজার গ্রুপ শব্দ পাঠাতে নিদেন পক্ষে চার ঘণ্টা লাগবে। প্রথমত গ্রুপকে কোডে পাল্টাতে হবে। তারপর কোডকে সাইফারে পরিবর্তন করুন। সিংক কোড ব্যবহার করলেই চলবে। প্রতি আড়াই মিনিট বাদে ক্রুষ্টাল পাল্টানোও সহজ কথা নয়। বলুন, চার ঘণ্টার ভেতর আপনি কতবার ক্রুষ্টাল পাল্টাবেন। আর এতো ক্রুষ্টালই বা পাবেন কোথায় ?

আজকাল ডি-ফিং'কে ফাঁকি দেবার সবচাইতে উৎকৃষ্ট পন্থা হলো টেপরেকর্ড করে খবর পাঠানো। চার ঘণ্টার কাজ আপনি চার মিনিটে শেষ করুন। দু মিনিট বাদে একবার ক্রুষ্টাল চেঞ্জ করুন। কিন্তু আপনার বি, টু, মেশিনে টেপ রেকর্ড করা সহজ নয়।

: কেন ? সমাদ্দার উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

: কারণ বি, টু, মেশিনের কী বোর্ড অতি স্লো। একবার রিপোর্টটা টেপ রেকর্ড করে ফেলতে পারলে মনে আর কোন আশংকা থাকবে না। কিন্তু টেপ রেকর্ড করা নিয়েই তো ঝামেলা।

আমার কথা শুনে সমাদ্দারের মুখ গম্ভীর হলো। বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। কোন জবাব দিলেন না। মনে হলো সমাদ্দার চিন্তা করতে শুরু করেছেন। আমি সমাদ্দারের চিন্তা দূর করলুম। বললুম : চিন্তা করবেন না সমাদ্দার সাহেব, হাতে যখন একটা ট্রান্সমিটার মেশিন আছে, আমরা খবর পাঠাতে পারবোই। আর কথা থাক, এবার আসুন কাজ আরম্ভ করা যাক।

সমাদ্দার আর কিছুই বললেন না। আমি আমার কাজ শুরু করলুম। মেশিনটাকে সযত্নে টেবিলের ওপরে বসালুম। ইণ্টারন্যাশনাল কোড। অতএব প্লাগ সকেটে বসালুম। তারপর দুভাগ করে রিপোর্টের ত্রিশ পাতা টেপ রেকর্ড করলুম। এবার বন্ধুদের কাছে সিগন্যাল পাঠালুম।

বন্ধুরা খবর দিলেন : Q R J, সিগন্যাল স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে না। আমি সিগন্যালকে আরো জোর করলুম।

বন্ধুরা বললেন Q S Z রিপোর্ট প্লিজ।

বারবার হয়ে আমাকে খবর রিপিট করতে হলো। এমনি করে বেশ খানিকক্ষণ বন্ধুদের কাছে সিগন্যাল পাঠালুম। ইতিমধ্যে দুবার ক্রিষ্টাল পাল্টে নিলুম। ক্রিষ্টাল পাল্টাতে আমি বেশ ক্লান্তি বোধ করছিলুম। হয়তো আমার চোখে মুখে এই ক্লান্তির চিহ্ন ফুটে উঠেছিলো। আমার এই মুখভাবের পরিবর্তন সমাদ্দারের দৃষ্টি এড়ালো না। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : ক্লান্তি বোধ করছেন? হ্যাভ এ হুইস্কি, সব অবসাদ দূর হয়ে যাবে।

সমাদ্দার গ্লাসে খানিকটা স্কচ ঢেলে দিলেন। আমিও এক চুমুকে সমস্তটুকু গলায় ঢাললুম। বন্ধুদের কাছে সিগন্যাল পাঠালুম, জিরো আওয়ার মিড নাইট। টপ স্পীডে টেপ রেকর্ড খবর পাঠাচ্ছি। ফর ক্লিয়ার রিসেপশন প্লে ব্যাক টেপ রেকর্ড।

টিক টিক টিক করে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে। মনে হলো যেন খুবই ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে সেই কাঁটা। সমাদ্দার একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন ঘড়ির পানে। তার মুখ দেখে মনে হলো, তার মনেও উত্তেজনার তুফান উঠেছে।

ঘড়ির কাঁটা দুটো এবার বারোটার সামনে এলো। আমি উঠে দাঁড়ালুম। টেপ রেকর্ডের আউট পুট এক্সচেঞ্জে কানেকশন করলুম। তারের আর একটি মুখ জুড়ে দিলুম ট্রান্সমিটারে।

সুইচ অন করলুম। মেশিন চলতে লাগলো। স্পীড বাড়িয়ে দিলুম। বলতে পারেন তুফান মেল ছুটলো। হঠাৎ এক দুর্ঘটনা ঘটলো। ঘরের বাতি নিভে গেলো। লাইট ফিউজড হয়েছে। আমি চীৎকার করে বললুম : সমাদ্দার সাহেব লাইট ফিউজড হয়েছে।

হঠাৎ আলো নিভে যেতে দেখে সমাদ্দারও একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। মেন সুইচ কোথায় আছে খুঁজতে গেলেন। দেখলুম মেন সুইচের ঘরটা বেশ বড়ো এবং তালা দিয়ে বন্ধ করা। সমাদ্দার বললেন : তালা ভাঙতে হবে। নইলে ফিউজ ঠিক করে আবার কনেকশন করা যাবে না।

আমি ঘড়ির পানে তাকালুম। প্রায় দেড় মিনিট কোন ট্রান্সমিশন করিনি। আমাদের কাজ দেড় মিনিট বন্ধ দেখে হয়তো বন্ধুরা চিন্তিত হবেন। হয়তো ওদের মনে সন্দেহ জাগবে যে পুলিশ আমাদের গ্রেপ্তার করেছে, না হলে হঠাৎ ট্রান্সমিশন বন্ধ হলো কেন? এই সব কথা ভেবে আমার মন বেশ খানিকটা উত্তেজিত হলো। হঠাৎ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। সমাদ্দারকে জিজ্ঞেস করলুম: আপনার গাড়ী কোথায়?

: কেন? সমাদ্দার একটু বিস্মিত হয়ে জবাব করলেন,— বাড়ীর লনেই গাড়ী আছে।

: গাড়ীটা বাড়ীর পেছনে নিয়ে আসুন সমাদ্দার সাহেব, আমি বেশ দৃঢ় কণ্ঠেই সমাদ্দারকে এই হুকুম দিলুম আর সমাদ্দার আমার হুকুম তামিল করলেন। গাড়ীটাকে বাড়ীর লনে নিয়ে এলেন আমি গাড়ীর ইঞ্জিন খুললুম। তারপর ট্রান্সমিটারের বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের একটা প্রান্ত গাড়ীর ব্যাটারীর সঙ্গে জুড়ে দিলুম। বললুম: মিঃ সমাদ্দার, বি টু মডেলের মেশিন ছয় ভোল্টের ব্যাটারীতেও চালানো যায়। দেখুন, মেশিন কাজ করে কি না। ট্রান্সমিটার কাজ করলো। খুবই স্পীডে মেশিন চলছে। আমি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিলুম। কারণ প্রতিটি মুহূর্ত প্রতিটি সেকেণ্ডই আমার কাছে মূল্যবান। আমি জানি ভারত সরকারের কর্মচারীরা আমার খবর মনিটর করছেন। আমি তাদের আমার ফ্রিকোয়েন্সি জানাতে চাইনে। অতএব আমাকে প্রথম 'রান' আড়াই মিনিটে শেষ করতে হবে। এক সেকেণ্ড বেশী সময় নিলে প্রাণ নিয়ে টানাটানির সম্ভাবনা আছে। এক মিনিট, দেড় মিনিট কাটলো। হঠাৎ টেপের অবশিষ্ট দৈর্ঘ দেখে মনে হলো পুরো খবর ট্রান্সমিট করতে আড়াই মিনিটের একটু বেশি সময় লাগবে।

হলোও তাই। প্রথম 'রান' শেষ করতে আমার দু মিনিট পঞ্চাশ সেকেণ্ড নিলো। অর্থাৎ কুড়ি সেকেণ্ড বেশি লাগলো। আমি একটু চিন্তিত হলুম। ভাবলুম, হয়তো এই কুড়ি সেকেণ্ডের ভেতর ডি-ফিং আমার ফ্রিকোয়েন্সি বের করতে পারেনি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিলো না।

সেকেণ্ড 'রান' শুরু করলুম। ব্যাটারী দিয়ে মেশিন চালাতে হলো। ইতি-মধ্যে সমাদ্দার দু-একবার মেন সুইচ রুমের দরজা খুলবার চেষ্টা করেছিলেন। ঘর খুলতে পারেন নি। ভাবলুম, যদি ইলেকট্রিক মেন-এর কারেন্ট ব্যবহার করা যায় তাহলে দ্বিতীয় 'রান' হয়তো আড়াই মিনিটে শেষ করা যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আড়াই মিনিটে কাজ শেষ করতে পারলুম না। আরও একটু বেশি সময়

নিলুম। প্রায় তিন মিনিট। সর্বনাশ! বুঝতে পারলুম যে এবার কোন প্রকারেই আর বিপদের হাত থেকে রেহাই পাবো না। ভারত সরকারের পুলিশ তো আর মূর্খ গবেট নয়। আমার মুখে এই বিপদের চিহ্ন বেশ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠলো। সমাদ্দার আমার মনের উত্তেজনা লক্ষ্য করলেন। প্রশ্ন করলেন: এনিথিং রং? কিছু গোলমাল হয়েছে নাকি?

: হ্যাঁ, এক্ষুণি আমাদের এ বাড়ী ছেড়ে পালাতে হবে। কারণ আর পাঁচ মিনিট এখানে থাকলে পুলিশ এসে আমাদের গ্রেপ্তার করবে।

সমাদ্দারকে সমস্ত কথা বুঝিয়ে বলতে হলো না। উনি এক মুহূর্তে বিপদের গুরুত্ব আন্দাজ করতে পারলেন। তাড়াতাড়ি ট্রান্সমিটারটা বাক্সে পুরলাম। অন্যান্য জিনিসপত্রও গাড়ীতে তোলা হলো। এমন কি সামান্য কাগজের টুকরোগুলোও অতি সন্তর্পণে তুলে নিলেন সমাদ্দার। তারপর বাড়ীর দরজা জানালা বন্ধ করলেন। তিন মিনিটের মধ্যে আমরা সেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলুম।

বাড়ীটা থেকে বের হবার খানিক বাদেই দেখতে পেলুম খান মার্কেটের সামনে দুটো পুলিশের গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। পুলিশের গাড়ীর দিকে সমাদ্দারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলুম। সমাদ্দার একটুও বিচলিত হলেন না। আমরা লোদী কলোনীর দিকে গাড়ী চালালুম। একটু বাদেই লোদী রোডের সেই বাড়ীটাতে পুলিশ ঢুকলো। সমাদ্দারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি বললুম: বড্ডো ফাঁকার হাত থেকে রেহাই পেলুম আজ। উত্তেজনায় আমার গলার স্বর কাঁপছিলো। কপালে ঘামের বিন্দু দেখা দিয়েছিলো। আমি মন শান্ত করার জন্য একটা সিগারেট ধরবার চেষ্টা করলুম। পকেটে হাত দিলুম। দেখলুম পকেট খালি। আমার মনে পড়লো যে মারলবরো সিগারেটের প্যাকেটটা ট্রান্সমিটারের পাশে রেখেছিলুম. উত্তেজনায় ও তাড়াহুড়োয় প্যাকেটটি তুলে আনতে ভুলে গিয়েছি।

সর্বনাশ! হঠাৎ আমার মনে হলো পুলিশ এখন সেই বাড়ীর ভেতর ঢুকছে। একটু বাদেই বাড়ী খুঁজে মারলবরো সিগারেটের প্যাকেটটি বের করবে। তারপর? তারপরের ঘটনা চিন্তা করতে আমার মন চাইলো না।

এবার আমি সমাদ্দারকে বললুম খুলে: মিঃ সমাদ্দার একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটে গেছে।

: কী ব্যাপার? গাড়ী চালাতে চালাতে সমাদ্দার জিজ্ঞেস করলেন আমাকে।

: আমার মারলবরো সিগ্রেটের প্যাকেটটি লোদী রোডের বাড়ীতে ফেলে

এসেছি।

আমার কথা শুনে সমাদ্দার হতভম্ব হয়ে পড়লেন। সেই মুহূর্তে-ই ব্রেক করলেন গাড়ীর। তীব্র আর্তনাদ করে থেমে গেলো গাড়ীটা। তারপর নিষ্ঠুর কর্কশ দৃষ্টিতে তিনি আমার পানে তাকালেন। তার সেই চাউনি দেখে আমি একটু আতঙ্কিত হলুম। বুঝতে পারলুম আমার এই ভুল উনি কখনই মার্জনা করবেন না। কিন্তু বলুন, আমি কী করতে পারি।

: জি-বি-এম, আমরা বর্তমানে পুলিশের হাত থেকে রেহাই পেয়েছি বটে কিন্তু আপনার এক সামান্য ভুলের জন্যে আমরা আরো অনেক বড়ো বিপদ ডেকে এনেছি। জানেন, আপনি কী মারাত্মক ভুল করেছেন? দিল্লীর এবং ভারতের কেউ সাধারণত মার্লবরো সিগারেট পান করে না। এই শহরে যে কজন লোক মার্লবরো সিগারেট পান করে, হাত গুনে তাদের সংখ্যা বলে দেয়া যায়। ক'জন ডেণ্ডর এই সিগারেট বিক্রি করে—তাও জানা কঠিন নয়। পুলিশ এবার আপনার মার্লবরো সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে বাজারে তদন্ত শুরু করবে। কে এই সিগারেট বিক্রি করে আর কে কেনে তা জানার চেষ্টা করবে। কনট সার্কাসে মাত্র দুটো পানওলা এই সিগ্রেট বিক্রি করে। আমাদের এজেণ্টরা তাদের কাছ থেকেই এই সিগারেট কেনে। জি-বি-এম আপনার সামান্য ভুলের জন্য আমাদের এজেণ্টদের জীবন বিপন্ন হয়েছে। আমি হলপ করে বলতে পারি আর তিন ঘণ্টার ভেতর আমাদের জনা তিনেক এজেণ্টকে পুলিশ পাকড়াও করবে। সত্যিই স্ক্যাণ্ডালাস।

সমাদ্দারের কণ্ঠে ছিলো বিরক্তি ও রাগের সুর। আমি যে একটা মারাত্মক ভুল করেছি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। স্পাইং-এর কাজে শুধু সাহস নয়, বুদ্ধি বিবেচনারও প্রয়োজন হয়।

সমাদ্দারের রাগ বেশিক্ষণ রইলো না। একটু বাদেই আবার সহজ কণ্ঠে তিনি বলতে লাগলেন: ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করে লাভ নেই। বর্তমানে আমাদের হাতে প্রচুর কাজ। শুনুন, আবার কালই আমাদের ট্রান্সমিশন করতে হবে। একই সময়ে।

: ট্রান্সমিশন কিন্তু অন্য কোন বাড়ী থেকে করতে হবে। আজকের ঘটনার পর আর লোদীর রোডের বাড়ীতে ফিরে যাওয়া যায় না, আমি বললুম।

সমাদ্দার আমার কথা শুনে হাসলেন। বললেন: সেই চিন্তা করবেন না জি-বি-এম। আপনি কী ভাবছেন ঐ বাড়ী আর কতোক্ষণ খালি পড়ে আছে? পুলিশ নিশ্চয় এখন ঐ বাড়ী খানাতল্লাসী করছে। সমস্ত জিনিসপত্র উল্টে তছনচ করছে।

: ঐ বাড়ীটা কার সমাদ্দার সাহেব? আমি একটু কৌতূহল প্রকাশ করলুম।

: এখন ঐ বাড়ীতে কেউ থাকে না। তবে এককালে হোম সেক্রেটারী থাকতেন। তাইতো ঐ বাড়ীই সিলেক্ট করেছিলুম।

কথা বলতে বলতে আমরা আর একটা বাড়ীতে এলুম। ডিফেন্স কলোনীর এলাকা। সবই নতুন হালফ্যাশানের বাড়ী। আমাদের এই বাড়ীটা বেশ একটু ছোট। দোতলা একতলা মিলিয়ে পাঁচখানা ঘর। সমাদ্দার বললেন: আমার এক বন্ধুর বাড়ী, সাময়িক ব্যবহার করছি এখন। কাল আমাদের ট্রান্সমিশন এইখান থেকেই করবো।

আমি বাড়ীটার চারদিকে ঘুরে দেখলুম। বাড়ীটার মোটর গ্যারেজটা আমার কাছে ট্রান্সমিশনের জন্যে বেশি উৎকৃষ্ট জায়গা বলে মনে হলো। নির্জন বেশ একটু অন্ধকার। ট্রান্সমিটার সেট গ্যারেজে নিয়ে বসালুম।

পরের দিন আবার আমাদের ট্রান্সমিশনের কাজ শুরু হলো। সিগন্যাল পাঠালুম। বন্ধুরা জবাব দিলেন: খবর ঠিক মতো পাচ্ছি। কিন্তু সমস্ত রিপোর্ট যেন পরে মাইক্রোফিল্ম করে হংকং-এ পাঠানো হয়।

সমাদ্দারকে জানালুম যে বন্ধুরা রিপোর্টের মাইক্রোফিল্ম চাইছেন। এই খবর শুনে সমাদ্দারের মুখ বেশ একটু গম্ভীর হলো। আমাকে শুধু বললেন: কাজ শুরু করুন জি বি এম। সময় নষ্ট করবেন না। দেখবেন, আজকে যেন কালকের মতো হাঙ্গামায় পড়তে না হয়।

আমি কোন জবাব দিলুম না। ভাবলুম আজকের সমস্ত ট্রান্সমিশন চার মিনিটে শেষ করতে হবে। দু মিনিট বাদে ক্রিস্টাল পাল্টে নেবো। তাহলে ডি-এফ আমাদের ট্রান্সমিশনের ফ্রিকোয়েন্সি বের করতে পারবে না।

কাজ শুরু করার আগে ফিউজ বেশ শক্ত করে নিলুম। তারপর লীড সকেটে বসালুম। টেপ রেকর্ড করতে ঘণ্টা দুই নিলো। ঠিক রাত বারোটার সময় খুব জোরে টেপ রেকর্ডার চালালুম। আজকের কাজে কোন ব্যাঘাত ঘটলো না। প্রথম 'রান' ট্রান্সমিট করতে দু মিনিট কুড়ি সেকেণ্ড নিলো। না, কোন প্রকারে ডি এফ-এর হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেছে। দ্বিতীয় 'রান' ট্রান্সমিট করতে ঠিক আড়াই মিনিট নিলো। আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললুম।

সমাদ্দার এক দৃষ্টিতে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ট্রান্সমিশন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বললেন: এক্সেলেণ্ট। খুব ভালো কাজ করেছেন। তবে আমাদের কাজ এখনো শেষ হয়নি। এবার মাইক্রোফিল্ম করতে হবে। চলুন আমার সঙ্গে ডার্ক রুমে।

সমাদ্দার আমাকে নিয়ে অন্য একটা ঘরে গেলেন। বেশ একটা অন্ধকার ঘর। এবার উনি হাজার ওয়াটের একটা বাতি জ্বালালেন। সেই বাতির নীচে রাখলেন বর্ডার এরিয়া কমিটির রিপোর্ট। ষাট পাতার রিপোর্টকে এবার মাইক্রোফিল্ম করা হল। বললেন: জি-বি-এম, কাল আমাদের মাইক্রোফিল্ম ডেভেলাপ করা হবে। এবার আপনার কাজ হবে এই মাইক্রোফিল্মকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেওয়া।

কাল বিকেলে তিনটের সময় একবার কনট-সার্কাসের ইনার সার্কেলে রেডিও এম্পোরিয়মে যাবেন। রেডিওর স্পেয়ার পার্টস বিক্রি করে রেডিও এম্পোরিয়ম। নিজেকে হানজ উনথ মারিয়া রেডিও ফার্মের প্রতিনিধি বলে পরিচয় দেবেন। রেডিও এম্পোরিয়মের কর্তার সঙ্গে ট্রান্সমিটার এবং ক্রিষ্টাল নিয়ে আলোচনা করবেন। আপনি ওকে সিগারেট অফার করবেন। মার্লবরো সিগারেট। কিন্তু শিগগীরই আমাদের মার্লবরো সিগারেটের নিশানা পাল্টাতে হবে। কারণ আজ কালের মধ্যেই পুলিশ কনট সার্কাসের সমস্ত সিগারেট বিক্রেতাদের জেরা করবে, গ্রেপ্তার করবে। অতএব আমাদের কাজের জন্যে নতুন নিশানা বের করা একান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়বে। যাক্ এবার আমাদের কাজের কথা বলা যাক্। রেডিও এম্পোরিয়মের কর্তার সিগারেট ধরিয়ে দিতে আপনি আপনার লাইটার বের করবেন। এই লাইটারের ভেতর আমাদের মাইক্রোফিল্ম ভরা থাকবে। ভদ্রলোক আপনার কাছ থেকে লাইটারটি চেয়ে নেবেন। আপনি তার লাইটার দিয়ে নিজের সিগারেট ধরাবেন। ব্যস লাইটার অদল বদল হয়ে গেলো। মাইক্রোফিল্ম সহ আপনার লাইটার ওর কাছে চলে গেলো।

সমাদ্দার কিছুক্ষণের জন্যে চুপ করলেন। একটু পরে আমাকে একটা সিগারেট দিয়ে বললেন: হ্যাভ এ স্মোক প্লিজ। তারপর শুনুন বাকিটা। রেডিও এম্পোরিয়মের কর্তা আমাদের দলের লোক। বলতে পারেন ওর মারফৎ আমরা বিদেশে জিনিসপত্র পাঠাই। বিদেশী পাইলট ও ডিপ্লোম্যাটিক ক্যুরিয়ারের সঙ্গে উনিই যোগাযোগ রাখেন। মাইক্রোফিল্ম উনিই লোক মারফৎ হংকং-এ বন্ধুদের কাছে পাঠাবেন।

এবার আপনার পরবর্তী কাজের নির্দেশ শুনুন। রেডিও এম্পোরিয়মের নিকটেই ভোলগা রেস্তোরাঁ। মিসেস সেন আপনার জন্যে ভোলগা রেস্তোরাঁয় প্রতীক্ষা করবেন। এরপর ওর সঙ্গে গিয়ে দেখা করবেন। ওর সঙ্গে গিয়ে দু চারটে প্রেমের কথা বলুন। তারপর সুবিধে বুঝে মিসেস সেনের ভ্যানিটি ব্যাগে রিপোর্টটা পুরে দিন। আপনার সমস্ত চিন্তা ভাবনা দূর হয়ে গেলো। মিসেস সেন রিপোর্ট সমীর সেনের হাতে তুলে দেবে।

আমি চুপ করে সমাদ্দারের কথা শুনলুম। কোন জবাব দিলুম না। সমীর সেন আমাকে বার বার বলেছেন যে তার নির্দেশ পালন করাই হবে আমার কাজ। বাদ প্রতিবাদ বা কৌতূহল যেন না প্রকাশ করি। তাহলে বিপদ ঘনিয়ে আসবে। আমি একবার সমাদ্দারের মুখের পানে তাকালুম। ভাবলুম, সত্যিই কী সমাদ্দার আমার কোন অনিষ্ট করতে পারেন। না ওর, মুখ দেখলে কখনই মনে হয় না উনি কাউকে কষ্ট দিতে চান।

সমাদ্দার বললেন: পুলিশের চোখকে ধুলো দেবার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হলো প্রেমের অভিনয় করা। আমি জানি পুলিশ আপ্রাণ জানবার চেষ্টা করছে জি বি এম,-এর আসল পেশা কী। জি-বি-এম, কী উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে এসেছে। অতএব আপনি ওদের মনে কোন সন্দেহ জন্মাতে দেবেন না। ভাবতে দিন আপনি প্রেমিক গোবিন্দ বিহারী মালকানি। বেটী এবং নাদিয়ার লাভার। একবার ওদের মনে এই ধারণ জন্মাতে পারলে আমাদের কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটবে না। আর সত্যিই আপনার তো মিসেস সেনের প্রতি বেশ খানিকটা দুর্বলতা আছে। মনের আকাঙ্ক্ষাকে এবার পরিপূর্ণ করুন। বলুন জি-বি-এম, আমার প্রস্তাবে কী কোন খুঁত্ আছে?

আমি হাসলুম। বললুম: আপনাকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। আজকের ট্রান্সমিশনের শেষে বন্ধুরা বলেছেন যে আমার নামে একটা চিঠি হোটেলের ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে।

আমার কথা শুনে সমাদ্দারের মুখের রং পরিবর্তন হলো। বুঝতে পারলুম কথাটা শুনে উনি একটুও খুশী হন নি। শুধু বললেন: জি-বি-এম, সত্যিই মাঝে মাঝে বন্ধুদের বোকামি দেখে অবাক হই। ওদের বোঝা উচিত পুলিশ আপনার উপর নজর রাখছে। অতএব আপনার প্রত্যেকটি চিঠি এবং টেলিফোন লাইনও ট্যাপ করা হচ্ছে। প্রতি জায়গায় আপনার পেছনে পুলিশের গোয়েন্দা ঘুরছে। বলুন, এই সব কথা জানা সত্বেও আপনার সঙ্গে চিঠিপত্রের মারফৎ যোগাযোগ স্থাপন করা কী বোকামির কাজ নয়? আমাদের সমস্ত কাজের ভণ্ডুল করবে আমাদের বন্ধুরাই। এই সব গবেটদের নিয়ে আর কী করতে পারি বলুন।

আমি কিন্তু সমাদ্দারের কথায় কান দিলুম না। বরং জিজ্ঞেস করলুম: মিঃ সমাদ্দার, আপনি বারবার আমাকে বলছেন যে পুলিশ আমার পেছনে ঘুরছে, আমার চিঠি খুলছে, আমার টেলিফোন লাইন ট্যাপ করছে। কিন্তু এতো সন্দেহ থাকা সত্বেও পুলিশ কেন আমাকে গ্রেপ্তার করছে না?

আমার কথা শুনে সমাদ্দার হাসলেন। বললেন: না আপনাকে গ্রেপ্তার করবার এখনও কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পায়নি। বলুন, সেক্ষেত্রে কেন পুলিশ

আপনাকে গ্রেপ্তার করবে। আপনি তো আমাদের দেশের আইন কানুন কিছু এখনও ভাঙেন নি। ব্রেক মিসেস সেনের সঙ্গে প্রেম করছেন। পরস্ত্রীর সঙ্গে প্রেম করে আপনি সমাজের আইন কানুন ভাঙছেন বটে, কিন্তু দেশের আইন কানুন বজায় রেখেই তা করছেন। আর একটা কথা মনে রাখবেন জি বি-এম, পুলিশ আপনাকে সন্দেহ করলেও শুধু আপনাকে নয় দলের সবাইকেই পাকড়াও করতে চায়। তাই পুলিশ আপনার পেছনে ঘুরবে, কোথায় যাচ্ছেন, কার সঙ্গে মেলামেশা করছেন সবই জানতে চেষ্টা করবে। আমাদের পুলিশকে অতো বোকা ভাববেন না।

সমাদ্দারের কথা চুপ করে শুনলুম। ঠিকই বলেছেন সমাদ্দার। আমিতো এখনো দেশের আইন-কানুন ভাঙিনি। তাহলে আমার ভয় কিসের? মেয়েমানুষের সঙ্গে প্রেম করছি। প্রেম করাটা কী অন্যায়? আপনারাই বলুন? লাভ ইজ ইউনিভার্সাল।

*　　　*　　　*

পরের দিন নির্দিষ্ট সময়ে কনট সার্কাসে মাইক্রোফিল্ম নিয়ে গেলুম। রেডিও এম্পোরিয়ম খুঁজে নিতে অসুবিধে হলো না। দোকানীর কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় দিলুম। গোবিন্দ বিহারী মালকানি, সেলসম্যান। হানজ উনথ মারিয়া কোম্পানীর পক্ষ থেকে এসেছি। দোকানী আমার পরিচয় পেয়ে খুশী হলেন। আদর আপ্যায়ন করলেন।

: আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুশী হলুম। বলুন, আপনার জন্যে কী করতে পারি।

: আমি রেডিও ট্রান্সমিটার বিক্রি করতে এসেছি।

: বিদেশী মাল? দোকানী জিজ্ঞেস করলেন।

: হাঁ, ইংরেজি মাল।

: অসম্ভব। আমাদের বিদেশী জিনিস আমদানী করার অধিকার নেই। ফরেন এক্সচেঞ্জ নেই।

আমি একটু গাম্ভীর্য দেখালুম। ভাবে প্রকাশ করলুম যে তার জবাবে আমি একেবারেই সন্তুষ্ট হইনি। তারপর বললুম: ক্যান আই স্মোক?

: নিশ্চয়, নিশ্চয়।

এই বলে উনি নিজেই এক প্যাকেট সিগারেট খুললেন। গোল্ডফ্লেক সিগারেট। আমি বললুম: থ্যাঙ্কস। আমি মারলবরো সিগারেট পান করি।

দোকানীর মুখ একটু গম্ভীর হলো। বললেন: আমি ভেবেছিলুম যে কোডওয়ার্ড পাল্টানো হয়েছে। মারলবরোর বদলে গোল্ডফ্লেক ব্যবহার

করা হচ্ছে।

: এখনও হয়নি, শিগ্‌গীরই হবে।

: মাল এনেছেন ?

: ইয়েস, ইয়েস, বলে আমি ওর সিগারেটে আগুন ধরাবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু প্রথম বারে ওর সিগারেটে আগুন ধরাতে পারলুম না। উনি আমার হাত থেকে সিগারেট লাইটারটা চেয়ে নিলেন। আমিও ওর লাইটারটা হাতে নিলুম। মুহূর্তের ভেতর আমাদের লাইটারের অদলবদল হলো। ক্ষণিকের ভেতর আমাদের সমস্ত কাজের সমাধান হলো। এই কাজ করতে যে আমি কোন উত্তেজনা বোধ করিনি একথা বলবো না। সত্যি কথা বলতে কী স্পাই-এর কাজে সব সময়েই উত্তেজনা আছে, মাদকতা আছে। সোনা বা কারেন্সী স্মাগল করে কোনদিনই এতো উত্তেজনা অনুভব করিনি।

: থ্যাঙ্কস। এই বলে দোকানী ওর সিগারেটে আগুন ধরালেন। তারপর বললেন,—মাবলবরো সিগারেট ছাড়ুন। বড্ডো পুরানো মার্ক হয়ে গেছে। অনেকেই আজকাল এই সিগারেট পান করতে শুরু করেছে। এমন কি পুলিশের কর্তারাও আজকাল মাবলবরোর সন্ধানে কনেষ্টবল পাঠাতে শুরু করেছেন।

ওর কথার তাৎপর্য বুঝতে আমার একটুও অসুবিধে হলো না।

: চেষ্টা করবো মাবলবরো ত্যাগ করতে। থ্যাঙ্কস। আপনার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে সুখী হলুম।

এই বলে আমি রেডিও এম্পোরিয়ম থেকে বেরিয়ে এলুম। বাইরে এসে যেন বেশ নিশ্চিন্ত হলুম।

*   *   *

রেডিও এম্পোরিয়ম থেকে ভোলগা রেস্তোরাঁ বেশি দূরে নয়। খানিকটা পথ হাঁটতে হলো। রেস্তোরায় মিসেস সেন আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমি গিয়ে ওর পাশে বসলুম।

মিসেস সেন আমাকে দেখে হাসলেন। সেই মৃদু হাসি যেন আমার কাছে অপরূপ হাসি বলেই মনে হলো। জানিনে কেন মিসেস সেনের প্রতি আমার প্রেমও যেন আরো তীব্র হলো। আমি বললুম,

: আপনাকে আজ ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে।

এই সর্বপ্রথম মিসেস সেনের সৌন্দর্যের তারিফ করলুম। হয়তো আমার মুখে তার রূপের প্রশংসা শুনে উনি একটু লজ্জিত হলেন। কিন্তু উনি কিছু বলবার আগেই আমি আবার বললুম: আপনাকে কী অফার করবো বলুন ?

আইসক্রীম না কফি।

: কফি।

আমি ওয়েটারকে ডেকে দুটো কফির অর্ডার দিলুম।

এবার বেশ জাঁকিয়ে গল্প শুরু করলুম। জিজ্ঞেস করলুম: আপনি কোনদিন অভিনয় করেছেন?

আমার প্রশ্ন শুনে মিসেস সেন হয়তো একটু বিস্মিত হলেন। কিন্তু তার এই বিস্ময় ক্ষণিকের।

: সত্যি জি-বি-এম, মাঝে মাঝে আপনার অদ্ভুত কৌতূহলে বেশ বৈচিত্র্য থাকে। বলুনতো হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন করলেন?

: কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ নেই। শুধুই জানতে চাইলুম অভিনয়ে আপনার কোন পারদর্শিতা আছে কিনা। আমার কী মনে হয় জানেন? আপনি যে কোন অভিনয়ই করুন না কেন, সেই অভিনয়ের যে কোন পার্টে আপনাকে চমৎকার মানাবে।

: আপনার পরামর্শের জন্যে ধন্যবাদ। বর্তমানে আমার অভিনয় করার কোন সংকল্প বা ইচ্ছে নেই।

আমি বুঝতে পারলুম আমার আলোচনার বিষয়টা মিসেস সেনের একেবারেই পছন্দ হয়নি। তাই তখনই আবার আলোচনার মোড় ঘোরালুম। বললুম: আপনি বেড়াতে ভালোবাসেন?

মিসেস সেন কৌতূহল প্রকাশ করে আমাকে বললেন: জি-বি-এম, আজ আপনার কথাগুলো বড্ডো অসংলগ্ন লাগছে। কী ব্যাপার বলুন তো? মন ভালো আছে তো?

মিসেস সেনের প্রশ্নে আমি একটু হকচকিয়ে গেলুম। ভাবতে লাগলুম কী অবাস্তব প্রশ্ন করেছি। অসংলগ্ন এমন কিছুই বলিনি, তাহলে মিসেস সেন হঠাৎ রাগ করলেন কেন?

হঠাৎ মিসেস সেন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন: প্যাকেট এনেছেন?

আমি মৃদুস্বরে জবাব দিলুম: হ্যাঁ।

: বেশ আমার কথা শুনুন এবার। এই প্যাকেট নিয়ে সোজা বাথরুমে চলে যান। জেন্টস-এর টয়লেটের পাশেই লেডীজ ক্লোকরুম। একটু এগিয়ে ওই ক্লোকরুমের ওয়াটার ট্যাঙ্কের সামনে রিপোর্টটা রেখে আসুন। আমি একটুবাদে গিয়ে ঐ রিপোর্ট সংগ্রহ করবো। যান, দেরি করবেন না। কারণ এখানে আমার বেশিক্ষণ বসে থাকা সম্ভব নয়। প্লিজ।

মিসেস সেনের কণ্ঠে অনুনয়ের সুর ছিলো। অতএব তার অনুরোধ উপেক্ষা

করতে পারলুম না।

মিসেস সেন যতো সহজে এই প্রস্তাব করতে পারলেন আমি ততো সহজে এই কাজ করতে পারলুম না। কারণ, মেয়েদের ক্লোকরুমে ঢোকার অভ্যাস আমার কোনদিনই নেই। তারপর প্রকাশ্য দিবালোকে কোন রেস্তোরাঁয় একাজ কী কখনও করা যায়? মিসেস সেনের প্রস্তাব শুনে আমার মাথা ঘুরতে লাগলো। আমি এক মনে চিন্তা করতে লাগলুম এবার কী করা যায়? অসম্ভব, একাজ আমাকে দিয়ে কখনই সম্ভব হবে না।

আমার মনের সংকোচ দেখে মিসেস সেন বললেন: আর দেরি করবেন না জি-বি-এম। সময় বয়ে যাচ্ছে। যে কোন মুহূর্তে অন্য অপরিচিত কেউ ক্লোক-রুমে ঢুকতে পারে। অন্য কেউ ঐখানে গেলে আমি আর রিপোর্ট পাবো না।'

মিসেস সেনের এই অনুরোধ যেন আমার কাছে আদেশ বলেই মনে হলো। আমি উঠে জেন্টস বাথরুমের দিকে গেলুম। জেন্টস বাথরুমের পাশেই লেডীজ ক্লোকরুম। একবার এদিক ওদিক তাকালুম। তারপর হঠাৎ ঐ ঘরে ঢুকলুম।

এক মুহূর্তের ভেতর আমার কাজ শেষ হয়ে গেল। জলের কলের ট্যাঙ্কের পাশে অতি সন্তর্পণে রিপোর্টটি রাখলুম। তারপর বাইরে চলে এলুম।

ক্লোকরুম থেকে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে কে যেন আমার গালে এক থাপ্পড় মারলো। এমন প্রচণ্ড থাপ্পড় আমি অনেকদিন খাইনি। সমস্ত বিশ্বজগৎ যেন আমার কাছে টলতে লাগলো। আমি গোটা দুনিয়াকে অন্ধকার দেখলুম। মনে হলো,' কে যেন অস্পষ্টকণ্ঠে বললো: বদমাস, লোকটা মেয়েদের বাথরুমে ঢুকেছিলো।

এই অভিযোগ যেন আমি বিশ্বাস করতে পারলুম না। তাই একটু ক্ষীণ প্রতিবাদ করতে গেলুম। আমাকে যিনি থাপ্পড় মেরেছিলেন তিনি তার কণ্ঠস্বর আরও একটু সপ্তমে চড়িয়ে বললেন: অন্যায় করে আবার দোষ ঢাকা হচ্ছে। শেমলেস ক্রীচার।

আমার মনে হলো, আমার চারদিকে বহুলোক এসে জড়ো হয়েছে। ভিড়ের মধ্যে একজন বললো: লোকটাকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেওয়া উচিৎ।

আমি আতঙ্কিত হলুম। জনতার হাতে কীল চড় খেতে আমার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু পুলিশের হাতে যেতে আমার ঘোরতর আপত্তি আছে।

হঠাৎ জনতার ভেতর থেকে একজন মধ্যবয়সী লোক এগিয়ে এলেন।

: কী ব্যাপার? উনি জিজ্ঞেস করলেন।

একজন বললেন: লোকটা বদমাস স্যার। মেয়েদের ক্লোকরুমে ঢোকবার

চেষ্টা করেছিলো।

: চেষ্টা করেছিলো মানে, রীতিমতো ঢুকেছিলো। আমি নিজের চোখে কী আর ভুল দেখলুম।

: পুলিশে দিয়ে দিন, আর একজন বললেন।

এবার আমার মুখ থেকে একটু ক্ষীণ আওয়াজ বের হল। এই কণ্ঠস্বর আমার না অন্য কারও, বুঝতে পারলুম না।

: স্যার, এবারকার মতো মাপ করে দিন। জীবনে এমন কাজ আর করবো না।

ভদ্রলোক বেশ দয়ালু ছিলেন। উনি বললেন : টাকা আছে আপনার পকেটে? প্রশ্নটি অবিশ্যি আমাকেই করা হলো।

: হ্যাঁ, কতো টাকা চাই বলুন, আমি দুখানা একশো টাকার নোট বের করে দিলুম।

: এতেই চলবে। এই বলে ভদ্রলোক একশো টাকার নোট একখানা ভোলগার ম্যানেজারের হাতে দিলেন। বাকি একশো টাকা দিলেন প্রথম ভদ্রলোককে, যিনি আমাকে লেডীজ ক্লোকরুমের সামনে দেখেছিলেন। তারপর আমার পানে তাকিয়ে বললেন : আসুন আমার সঙ্গে, কোথায় যাবেন?

: ইম্পিরিয়াল হোটেলে, আমি বললুম।

: ওবে বাবা! এদিকে রাস্তায় বদমাইসী করা হচ্ছে অন্য দিকে ইম্পিরিয়াল হোটেলে থাকা হচ্ছে। আরে এ যে একেবারে বিলেত ফেরৎ লোফার, মন্তব্য করলেন প্রথম ভদ্রলোক।

জনতা এই কথা শুনে বেশ জোরে হেসে উঠলো।

আমি কিছু বললুম না। ভদ্রলোকের সঙ্গে আমি ভোলগা রেস্তোরাঁর বাইরে চলে এলুম। এতোক্ষণ হৈ হুল্লোড়ে মিসেস সেনের পানে তাকাতে পারিনি। রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে যাবার আগে একবার আমাদের বসবার জায়গাটার দিকে তাকালুম। জনতার ভেতর একজন বেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার পানে তাকালেন। বললেন : মেয়ে পালিয়েছে। বাবা, এমন নচ্ছার লোক আর দেখিনি। একটা নিরীহ গোবেচারী মেয়েকে ভুলিয়ে এনে রেস্তোরাঁয় বসে প্রেম করা হচ্ছিল। স্কাউণ্ড্রেল।

আমি এরও কোন জবাব দিলুম না। কিন্তু রিপোর্টের কথাটা মনে হতেই আমার মন বেশ একটু চঞ্চল হয়ে উঠলো। এই রিপোর্ট পাচার করতে গিয়েই আজ আমাকে এতো বিপদে পড়তে হলো। কেন আমি মিসেস সেনের কথা শুনলুম। প্রকাশ্যেই একটা কাগজের বাণ্ডিল ওর হাতে দিলে এমন কী মহাভারত

অশুদ্ধ হতো। এই সমস্ত বিভ্রাটের মূল কারণ হচ্ছেন সমাদ্দার।

এই সব কথা যতোই ভাবতে লাগলুম ততোই ওদের প্রতি আমার মনটা বিষিয়ে উঠলো।

কনটসাকাসে একটি শেভ্রলে গাড়ী দাঁড়িয়ে ছিলো। কিন্তু আজ আমার গাড়ীর পানে নজর দেবার সময় ছিলো না। কারণ, তখনও সেই প্রচণ্ড থাপ্পড়ের ব্যথা আমার গালে যেন লেগেছিলো। মনে হলো, আমার মাথা যেন তখনও প্রকৃতিস্থ হয়নি।

: উঠুন গাড়ীতে, আপনাকে হোটেলে পৌঁছে দিচ্ছি, ভদ্রলোক বললেন।

আমি কোন প্রতিবাদ করলুম না। গাড়ীতে গিয়ে বসলুম। রেস্তোরাঁর জনতা আমাকে দেখতে বাইরে চলে এলো।

গাড়ী স্টার্ট দিলে। যে ভদ্রলোক আমাকে নিয়ে এসেছিলেন, তিনি স্টিয়ারিং-এ বসেছিলেন। আমি তাকে বললুম: ধন্যবাদ, অশেষ ধন্যবাদ। আজ আপনি না থাকলে এই ক্ষিপ্ত জনতার হাতে আমাকে প্রাণ দিতে হতো। জানেন

কিন্তু আমার কথা শেষ হবার আগেই কে যেন পেছন থেকে বললেন: এক্সেলেণ্ট এ্যাকটিং জি বি-এম, চমৎকার অভিনয়। না, আজকের এই ঘটনার পর পুলিশের মনে আর একটুও সন্দেহ থাকবে না যে আমাদের গোবিন্দ বিহারী মালকানি সত্যিকারের নির্ভেজাল প্রেমিক ছাড়া অন্য কিছু নয়। প্রেমের জন্যে জি বি-এম সব করতে পারে। সারা দুনিয়াকে ভুলতে পারে। তাই নয় কী?

এই কণ্ঠস্বর আমার অতি পরিচিত মিঃ সমাদ্দারের গলা। এবার আমার কাছে সমস্ত ঘটনা স্বচ্ছ পরিষ্কার হলো। বুঝতে পারলুম যে আজকের ঘটনার মূলে ছিলেন সমাদ্দার। কিন্তু কেন যে সমাদ্দার সবার সামনে আমাকে এভাবে বেইজ্জতি করালেন তাই ভাবতে লাগলুম। সমাদ্দার নিজেই আমার ভাবনা দূর করলেন।

: এই সামান্য অভিনয়ের একান্তই প্রয়োজন ছিলো জি-বি-এম। পুলিশের মনের সন্দেহকে দূর করবার চেষ্টা করছিলুম। তাদের একথাটাই স্পষ্ট বুঝিয়ে দিতে চাইছিলুম যে গোবিন্দ বিহারী মালকানি সামান্য প্রেমিক ছাড়া অন্য কিছু নয়। নইলে আজ আপনাকে বড্ডো বিপদে পড়তে হতো। জানেন, আজ পুলিশ আপনাকে পাকড়াও করবার মতলবে ছিলো। আপনি যখন মিসেস সেনের সঙ্গে খোস গল্প করছিলেন তখন পুলিশও পাশের কেবিনে বসে আপনার উপর নজর রাখছিলো। পুলিশের এই কীর্তিকলাপ কিন্তু মিসেস সেনের দৃষ্টি

এড়ায় নি। উনি একটা বিপদের আশংকা করেছিলেন। উনি জানতেন এই বিপদের পরিণাম কী। তাই ই আজ আমাদের এই অভিনয় করতে হলো। ইঙ্গিতে মিসেস সেন আমাদের দলের একজনকে এই বিপদের কথা জানালেন। তারপর আপনাকে বললেন লেডীজ ক্লোকরুমে যেতে। এর পরবর্তী ঘটনা আপনার অজানা নেই। না, আজ এই নাটক করার একান্তই প্রযোজন হয়ে পড়েছিলো।

এবার আমার প্রতিবাদ করার পালা। আমি যন সমাদ্দারের কৈফিয়থক সহজ মনে গ্রহণ করতে পারছিলুম না। তাই প্রতিবাদ জানিয়ে বললুম,

: সমাদ্দার সাহেব, আমার মনে হয় আপনাদের এই অভিনয় বেশ একটু অতিরিক্ত হয়েছিলো। এতোটা বাড়াবাড়ি করার ঠিক প্রয়োজন ছিলো কিনা বলতে পারিনে। আজকের এই হাঙ্গামার দরুণ হয়তো আমাকে থানায় যেতে হতো।

আমার জবাব শুনে সমাদ্দার হাসলেন। উনি একটুও বিচলিত হলেন না। এমন কণ্ঠস্বরে কথা বললেন যেন আমার কোন বিপদই হয়নি। বললেন : না জি-বি-এম, আজ আর পুলিশের মনে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে আপনি হলেন প্রেমিক প্রবর, প্রেমের দেবতা। আপনি মিসেস সেনের প্রেমে পড়েছেন। ওদের মনে যটুকু সন্দেহ ছিলো আজকের এই ঘটনার পর সেই সন্দেহ দূর হয়ে যাবে।

আমি একটু রাগ প্রকাশ করলুম। বললুম : আজ আমার জীবনই বিপন্ন হয়েছিলো। অথচ আপনি আমার এই বিপদকে কোন আমল দিলেন না।

সমাদ্দার আমাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন : নেভার মাইণ্ড জি-বি-এম, অতীতকে ভুলবার চেষ্টা করুন। ফরগেট দি পাস্ট। ভবিষ্যতের কথা ভাবুন। গতকাল কী হয়েছে সে কথা নিয়ে এখন আর অনর্থক চিন্তা করে লাভ নেই। আগামীকাল কী হবে এখন তাই ভাবুন।

ইতিমধ্যে আমাদের গাড়ী ইম্পিরিয়াল হোটেলে পৌঁছলো। দরজা খুলে আমি গাড়ী থেকে বের হলাম। তারপর বেশ একটু বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে জবাব দিলাম : থ্যাঙ্কস্। আপনার উপদেশের কোন প্রয়োজন নেই।

*　　*　　*　　*

সারাটা দিন বেশ উত্তেজনার ভেতর দিয়ে কেটেছে। আমার দেহ মন দুই-ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো। আলসেমিতে শরীর ভেঙ্গে পড়ছিলো। একটু বাদে তন্দ্রায় চোখ বুঁজে এলো। ক্লান্ত দেহ বিছানায় এলিয়ে দিলাম। ঘুম আসতে বেশিক্ষণ সময় নিলো না।

পরের দিন টেলিফোনের তীব্র আর্তনাদে আমার ঘুম ভাঙলো। টেলিফোন তখনও একটানা বেজে চলেছে। আমি চুপ করে বিছানায় শুয়ে রইলুম। টেলিফোনের রিসিভার ধরলুম না। আমি বুঝতে পারলুম, সমাদ্দারই আমাকে স্মরণ করেছেন। হঠাৎ এতো সকালে কেন আমাকে টেলিফোন করলেন? কী কারণ, কী তার প্রয়োজন? আমি এতো সকালে টেলিফোন করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পেলুম না।

খানিক বাদে টেলিফোনের আওয়াজ বন্ধ হলো। আমি বুঝতে পারলাম, সমাদ্দার আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। টেলিফোনের মারফৎ উনি আমাকে যাবার সঙ্কেত জানিয়েছেন। কোথায়? সেই নির্দেশ পাবার জন্যে আমি আরও কিছুক্ষণ চুপ করে বিছানায় শুয়ে রইলাম। একটু বাদে আবার টেলিফোন বাজবে।

পাঁচ মিনিট বাদে আবার টেলিফোন বাজলো। আমি চুপ করে রইলুম। খানিক বাদে আবার টেলিফোনের আওয়াজ বন্ধ হলো। বুঝতে পারলুম, সমাদ্দার আমার সঙ্গে কোয়ালিটির বাস স্টপে দেখা করতে চান।

সমাদ্দার আমাকে একদিন বলেছিলেন, স্থি-বি-এম, হোটেলের টেলিফোনকে বিশ্বাস করবেন না। আমি হলপ করে বলতে পারি পুলিশ আপনার লাইন ট্যাপ করছে। তাই কখনও যদি টেলিফোন বাজে তবে রিসিভার ধরবেন না। প্রথমবার বাজবার পর পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন। আবার টেলিফোন বাজবে। চুপ করে থাকবেন। আবার খানিকটা সময় অপেক্ষা করুন। যদি তৃতীয় বার টেলিফোন না বাজে তাহলে ঠিক আধ ঘণ্টা বাদে কোয়ালিটির বাস স্টপে এসে দাঁড়াবেন। সেখানে থেকে নয় নম্বর বাস ধরবেন। আমি ঠিক আপনার পেছনেই থাকবো। আপনি লালকিল্লার টিকিট কাটবেন। আমি আপনার বাসেই উঠবো। সম্ভব হলে আপনার পাশের সিটে বসবো। বাসে বসে আমাদের কথাবার্তা হবে। যদি তিনবার টেলিফোন বাজে তা হলে এক ঘণ্টা বাদে আমার সঙ্গে কোয়ালিটি রেস্তোরাঁয় দেখা করবেন।

আরো বেশ খানিকটা সময় অপেক্ষা করলুম। দুবার বাজবার পর টেলিফোন আর বাজলো না। আমার মনে সন্দেহ রইলো না যে আমাদের দেখা করবার স্থান হলো কোয়ালিটির বাস স্টপ।

ঘড়ির দিকে তাকালাম। আধ ঘণ্টা বাদে আমাকে বাস স্টপে যেতে হবে। কেন জানিনে আজ আমার বিছানা ছেড়ে উঠতে একেবারেই ইচ্ছে করছিলো না। তাই বিছানায় গড়াগড়ি দিতে লাগলুম। হঠাৎ আমার আগের দিনের মারপিটের কথা মনে পড়লো। সারাটা মন বিরক্তিতে ভরে উঠলো।

কিন্তু মন খারাপ করে আমার সমস্যার কোন সমাধান হবে না। আধ ঘন্টা বাদে আমার জন্যে বাস স্টপে সমাদ্দার অপেক্ষা করবেন। অতএব বিছানায় শুয়ে থেকে আর আলসেমি করা যায় না। তাই শয্যার মায়া ত্যাগ করতে হলো। জামা কাপড় পরে কোয়ালিটি রেস্তোরাঁর পথে রওনা দিলুম।

হোটেল থেকে বের হবার আগে রিসেপশন ক্লার্ক আমার হাতে একখানা চিঠি দিলো। : গোবিন্দ বিহারী মালকানি।

: ইয়েস প্লিজ, আমি সংক্ষিপ্ত জবাব দিলুম।

: আপনার নামে একখানা চিঠি আছে।

: চিঠি? বেশ বিস্মিত হয়েই আমি জিজ্ঞেস করলুম।

রিসেপশন ক্লার্ক আমার মনের চঞ্চলতা লক্ষ্য করলো। কিন্তু কোন জবাব দিলো না। শুধু আমার হাতে একখানা চিঠি এগিয়ে দিলো।

আমি দিল্লীতে একেবারেই অপরিচিত। এই শহরে আমাকে কে চিঠি লিখতে পারে ভেবে পেলুম না। আমার একমাত্র বন্ধু মানিকলাল কিছুদিন আগে মারা গেছে। আমি জানি সমীর সেন আমাকে চিঠি লিখবেন না। তা হলে কে চিঠি লিখলো?

কিন্তু এ চিঠি নয়। সামান্য এক লাইনের বিজ্ঞাপন। আমি বিজ্ঞাপনটি পড়লুম। বিজ্ঞাপনটির ভেতর বেশ বৈচিত্র্য ছিলো। প্রতিটি লাইনের শেষে একটি করে বড়ো বড়ো বিন্দু। ইংরেজীতে যাকে বলা হয় ফুলস্টপ। বুঝতে পারলুম যে এগুলো কোন সামান্য ফুলস্টপ বা বিন্দু নয়। এ হলো মাইক্রো ডট। বন্ধুরা নিশ্চয় কোন গোপন নির্দেশ পাঠিয়েছে। তারা এই চিঠি আমার কাছে পাঠালো কেন? সমাদ্দার হলো এই অপারেশনের লোক্যাল বস। আমি হলুম তার হুকুমের তাবেদার। কাজের নির্দেশ তাকেই পাঠাতে হবে, আমাকে নয়। কিন্তু আমি বাইরে যাবার জন্যে তাড়াহুড়া করছিলুম। তাই বিজ্ঞাপনটি আপাতত পকেটেই ভরলুম। কারণ মাইক্রোডট ডেভেলপ না করলে বন্ধুরা কী নির্দেশ পাঠিয়েছেন তা জানা যাবে না।

কোয়ালিটির বাস স্টপ বেশি দূরে নয়। সামান্য পথ। পৌঁছতে বেশিক্ষণ সময় নিলো না। বাস স্টপে বেশি লোকজনও ছিলো না। আমি লাইনে কিউ করে দাঁড়ালুম। এদিকে ওদিকে তাকিয়ে দেখলুম। সমাদ্দারকে কোথাও দেখতে পেলুম না। খানিক বাদে নয় নম্বর বাস এলো। আমি বাসে উঠলুম। বাস একেবারেই ফাঁকা। এতো সকালে ভিড় হয় নি। তাই বসবার জায়গা পেতে কোন অসুবিধে হলো না।

হঠাৎ কে জানি পেছন থেকে জিজ্ঞেস করলেন: আপনার পাশে বসতে

পারি কী?

না, এ হলো সমাদ্দারের গলা। আমি কোন ভুল করিনি। আমি একটু বিস্মিত হয়ে পেছনে তাকালুম। দেখলুম, আমার পেছনে এসে সমাদ্দার দাঁড়িয়েছেন।

আজ সমাদ্দারকে চিনতে আমার কষ্ট হলো। কারণ, তার চোখে ছিলো একটি রঙিন পুরু চশমা। মাথায় বালাক্লাভা ক্যাপ। দেখলে কে বলবে ভদ্রলোক আমারই বিশেষ পরিচিত বন্ধু সমাদ্দার।

আমি মৃদু কণ্ঠে জবাব দিলুম: নিশ্চয়। প্লিজ বসুন।

সমাদ্দার আমার পাশের সিটে এসে বসলেন। দু একটা বাস স্টপ পার হবার পর আমরা আলাপচারী শুরু করলুম: আশ্চর্য! আমি আপনাকে চিনতে পারিনি,

: মাঝে মাঝে চেহারার ভোল পাল্টাতে হয়। আমাদের প্রতি সরকারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। তাই চেহারার অদল বদল না করলে পুলিশ আমাদের পেছু নেবে। কথা বলতে বলতে সমাদ্দার তার কণ্ঠস্বর আরো নীচু করে বললেন, —এতো সকালে আপনার ঘুম ভাঙালুম। আপনাকে বিরক্ত করার কোন ইচ্ছেই ছিলো না। কিন্তু আজকের কাজটি এতো জরুরী এবং প্রয়োজনীয় যে আপনার সঙ্গে শলা পরামর্শ করা একান্তই আবশ্যক ছিলো।

আমার যেন বিস্ময়ের বাঁধ ভাঙলো। বিচলিত ও উত্তেজিত হলুম। কী গোপন ব্যাপার নিয়ে সমাদ্দার আমার সঙ্গে আলোচনা করতে চাইছেন? সমাদ্দার নীরব শান্ত প্রকৃতির মানুষ। সচরাচর বিচলিত হন না। আজ তার মুখ দেখে মনে হলো তিনি যেন এক বিশেষ জটিল সমস্যায় জড়িয়ে পড়েছেন। আমার মনে হলো নিশ্চয় কোন গুরুতর কিছু ঘটেছে।

আমি নীচু স্বরে জিজ্ঞেস করলুম: কী ব্যাপার?

সমাদ্দার কোন জবাব দেবার আগেই টিকিট চেকার এলো। আমি বললুম: লালকিল্লা প্লিজ।

সমাদ্দার দরিয়াগঞ্জের টিকিট কাটলেন। টিকিট হাতে নিয়ে সমাদ্দার বললেন: একটা বিশেষ কাজে দরিয়াগঞ্জ যাচ্ছি। আপনি লালকিল্লার বাস স্টপ নামুন। আমি আপনার জন্যে দরিয়াগঞ্জ বাসস্টপে অপেক্ষা করবো। সেইখানে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন।

: কী ব্যাপার? আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে বিশেষ কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে?

: হাঁ, কালরাত্রে এক বিশেষ দুর্ঘটনা ঘটেছে। খুবই মারাত্মক ঘটনাটা। বিশেষ করে আমাদের পক্ষে। মনে হচ্ছে আমরা এতোদিন যে পরিশ্রম করেছি

সবই যেন ব্যর্থ হতে চলেছে।

: কেন? আমি বেশ একটু কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করি। সমাদ্দার চুপ করে থাকলেন। আমি তার মৌনতা দেখে আবার বললুম,—সমাদ্দার সাহেব রহস্য রাখুন। বলুন কী ব্যাপার?

আমার কণ্ঠস্বরে একটু উত্তেজনার রেশ ছিলো। তাই আমার কণ্ঠস্বর পাশের দু একজন সহযাত্রীকে সজাগ করে তুললো। তারা বেশ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার পানে তাকালেন। আমি তাকিয়ে দেখলুম যে সমাদ্দারের মুখ বেশ গম্ভীর হয়েছে। বুঝতে পারলুম আমার প্রশ্নে সমাদ্দার বেশ একটু অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

সমাদ্দার আমাকে একটু তিরস্কারের সুরেই বললেন: নো নেম প্লিজ।

সমাদ্দারের ধমকে আমি একটু লজ্জা পেলুম। সমাদ্দার বলতে লাগলেন: গতরাত্রের কাহিনীটাই আগে শোনাই। কাল ক্যুরিয়ারের মারফৎ তিনটে মাইক্রোফিল্ম হংকং-এ পাঠাচ্ছিলুম। আমাদের ক্যুরিয়ার ছিলো এক বিদেশী এয়ার কোম্পানীর পাইলট। সাধারণত তার মারফৎই আমরা বিদেশে গোপনীয় সংবাদ ও ডকুমেন্ট পাঠাই। এয়ারপোর্টে আমাদের এক সহকর্মী গিয়ে তার হাতে এই সব ডকুমেন্ট পৌঁছে দেয়। এবারও সেই বন্দোবস্ত করেছিলুম। কিন্তু বিধাতা বাদ সাধলেন।

সিগারেট লাইটারের কথা নিশ্চয় আপনার মনে আছে। কাল যে লাইটারটি আপনি রেডিও এম্পোরিয়মের কর্তার হাতে দিয়েছিলেন, জানেন তো সেই লাইটারের ভেতরে ছিলো তিনটি মূল্যবান মাইক্রোফিল্ম। ভারত সরকারের দুষ্প্রাপ্য ডকুমেন্ট। আমাদের এক সহকর্মী এই সিগারেটের লাইটারটা নিয়ে পালাম বিমান বন্দরে যাচ্ছিলো। কথা ছিলো, সহকর্মী ক্যুরিয়ারের হাতে লাইটারটি তুলে দেবে।

পালাম বিমান বন্দরের সামনে এসে সহকর্মী ট্যাক্সি থেকে নামে। কিন্তু এয়ার টার্মিন্যালে ঢুকবার আগেই হঠাৎ এক লরীর ধাক্কায় গুরুতররূপে জখম হয়। তারপর হাসপাতালে যাবার পথে মারা যায়।

রাত বারোটা অবধি ক্যুরিয়ার আমাদের সহকর্মীর জন্য অপেক্ষা করেছিলো। কারণ রাত একটায় তার প্লেন ছাড়ে। কিন্তু তখন পর্যন্ত সহকর্মীর দেখা না পেয়ে তার চিন্তা হলো। খোঁজ করবার পর জানতে পারলো যে সহকর্মীটি অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে।

সিকিউরিটির আইন কানুন ভেঙে গভীর রাতে ক্যুরিয়ার আমাকে টেলিফোন করলো। বললো, আমাদের সহকর্মীটি অ্যাকসিডেন্টে মারা যায়নি। তাকে

খুন করা হয়েছে।

স্যারিয়ারের মুখে এই ঘটনার কথা শুনে আমি বেশ বিচলিত হলুম। সহকর্মীর মৃত্যুর জন্যে নয়, আমাদের প্রফেশনে মৃত্যু আকছারই ঘটছে। কিন্তু আমার চিন্তা মাইক্রোফিল্ম তিনটের জন্যে। মূল্যবান মাইক্রোফিল্ম। কতো দিন কতো পরিশ্রম ও বিপদকে তুচ্ছ করে এই তিনটে মাইক্রোফিল্ম করা হয়েছিলো। এক অ্যাকসিডেন্টের জন্য সেই মূল্যবান মাইক্রোফিল্ম তিনটেই আজ খোয়া গেলো। একবার ভাবলুম পুলিশই তাকে খুন করেছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হলো পুলিশ কেন তাকে খুন করতে যাবে। সে কি মাইক্রোফিল্মের জন্যে? না, তা অসম্ভব। প্রয়োজন বোধ করলে তারা অনায়াসেই তাকে গেপ্তার করতে পারতো। গ্রেপ্তার করলেই সব হাঙ্গামা মিটে যেতো। তাই আমি বারবার ভাবতে লাগলুম কে তাকে খুন করলো। না, স্রেফ খুন এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।

সমাদ্দার এবার একটু চুপ করলেন। বেশ গভীর মনোযোগ দিয়ে আমি তার কথা শুনছিলুম। তার কথায় কোন বাধা দিই নি। ব্যাপারটি যে গুরুতর সে বিষয়ে আমারও কোন সন্দেহ নেই। আমিও চিন্তা করতে বসলুম। কেবল চিন্তা করেই তো কোন সমস্যার সমাধান করা যায় না। তাই চিন্তা আরও বাড়লো।

সমাদ্দার আবার বলতে শুরু করলেন। বললেন: বর্ডার এরিয়া কমিটির রিপোর্টের জন্যে আমি কোন চিন্তা করছিনে। রেডিও মারফৎ এই রিপোর্টের সারাংশ আমরা ইতিপূর্বেই পাঠিয়েছি। কিন্তু মাইক্রোফিল্মে আরো দুটো জরুরী এবং মূল্যবান ডকুমেন্ট ছিলো: কিছুদিন আগে আমরা আগ্রার ইণ্ডিয়ান এয়ারফোর্সের বিমান বন্দর ও রাণওয়ের প্লানের ফটো করেছিলুম। মাইক্রোফিল্মের মারফৎ সেই সব জরুরী ডকুমেন্টও পাঠানো হচ্ছিলো। নাউ এভরিথিং ইজ লস্ট।

জানিনে কেন আমার মন বলতে লাগলো যে পুলিশ হয়তো এতোক্ষণে সেই মাইক্রোফিল্ম এনলার্জ এবং ডেভেলপ করতে শুরু করেছে। আমার মনের সেই আশংকা এখন সমাদ্দারের কাছে প্রকাশ করলুম।

সমাদ্দার মাথা নাড়লেন। অসম্ভব। উহুঁ, অতো সহজে পুলিশ এই মাইক্রোফিল্ম খুঁজে বের করতে পারবে না: কারণ মাইক্রোফিল্ম ছিলো আমাদের সহকর্মীর কোটের লাইনিং-এর ভেতর, যে খবর শুধু আমরাই জানি।

সমাদ্দারের কথা শুনে আমার হাসি পেলো। আমি কোনদিনই পুলিশ

বা কাস্টমস অফিসারদের নিরেট বা গবেট ভাবিনে। কারণ, আমি হলুম প্রফেশনাল স্মাগলার। অতএব পুলিশ এবং কাস্টমস অফিসারদের ওপরে আমার শ্রদ্ধা আছে।

সমাদ্দার কিছুতেই স্বীকার করতে চাইলেন না যে পুলিশ সেই মাইক্রোফিল্ম উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছে। এবং এ নিয়ে আমিও আর অহেতুক তর্ক করলুম না।

সমাদ্দার বললেন: আজ সকালে হাসপাতালে টেলিফোন করেছিলুম। সহকর্মীর নাম করে বললুম যে আমি তার ভাই। হাসপাতালের কর্তারা আমার প্রতি তাদের সহানুভূতি জানালেন। বললেন: জল যানের অ্যাকসিডেন্টে আমার ভাই মারা গেছে। আজ সকাল দশটায় তার ডেড বডির পোস্টমর্টেম হবে। তারা আমাকে আরও বললেন যে পোস্টমর্টেম-এর সময়ে আমার হাসপাতালে উপস্থিত থাকা একান্ত আবশ্যক। না, ওরা যদি সেই মাইক্রোফিল্ম উদ্ধার করতে পারতো তাহলে আমাকে হাসপাতালে যাবার জন্য নিশ্চয় অনুরোধ করতো না। আমি জানি ওরা আমার জন্যে জাল পেতেছে। আমার মন বলছে যে সেই মাইক্রোফিল্ম এখনও আমাদের সহকর্মীর কোটের লাইনিং-এর ভেতরেই রয়েছে। আমাদের বর্তমান কাজ হলো এই কোটটি উদ্ধার করা। সেই কাজ হাসিল করবার জন্যেই আজ দারয়াগঞ্জে যাচ্ছি। আমাদের এক পুরানো বন্ধুকে আজ দশটার সময়ে হাসপাতালে পাঠাবো। বন্ধুটি নিজেকে মৃত সহকর্মীর ভাই বলে পরিচয় দেবে। তারপর পোস্টমর্টেমের শেষে সে তার ভাই-এর মৃতদেহ ও পোষাক পরিচ্ছদ সংগ্রহ করে আনবে।

: বন্ধুটি বিশ্বস্ত তো? আমি এই প্রশ্নটি না করে পারলুম না। কিন্তু সমাদ্দার আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন না। চুপ করে রইলেন। মনে হলো আমার প্রশ্ন তার মনে সন্দেহের তুফান তুলেছে।

খানিকবাদে সমাদ্দার আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন। বললেন: আমাদের বিচিত্র জীবন। এই জীবনে কাউকে বিশ্বাস করতে নেই। আপনি জানতে চান বন্ধু বিশ্বস্ত কিনা? আমাদের কাজ উদ্ধারের জন্যে বন্ধুকে বিশ্বাস করতে হবে বৈ কি? বহুদিনের বন্ধু। বিপ্লবী জীবনে আমরা দুজনে একসঙ্গে দেশের জন্যে সংগ্রাম করেছি। দেশ স্বাধীন হবার পর আমাদের পার্টির নীতি নিয়ে মত বিরোধ ঘটে। বন্ধু দলের নীতিকে সমর্থন করে নি। কারণ তার বক্তব্য ছিলো পার্টির নীতি জনপ্রিয় হবে না। সম্প্রতি মাস ছয়েক হলো বন্ধু তার মত পাল্টেছে। নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে। তাই আজ আবার সেই বন্ধুর

কাছে যাচ্ছি। হয়তো আমাদের জন্যে এই সামান্য কাজটুকু সে আজ করে দিতে রাজী হবে।

খানিকটা সময় চুপ করে থেকে সমাদ্দার বলতে লাগলেন : সব দিক থেকে বন্ধুকে হাসপাতালে পাঠানোই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কারণ বন্ধুর নাম এখনও পুলিশের খাতায় ওঠেনি। এখন একমাত্র এই বন্ধুকেই আমাদের বিশ্বাস করতে হবে। না করে কী আর করি বলুন ?

আমরা দুজনে হেঁটে দরিয়াগঞ্জের একপ্রান্তে এলুম। বন্ধু দরিয়াগঞ্জের এক সরু গলির ভেতরে থাকে। বাড়ীর সামনে এসে সমাদ্দার দরজার কড়ায় নাড়া দিলেন। জীর্ণ বাড়া। বাড়ী দেখে আমি একটুও আকৃষ্ট হলুম না। আমার মনে হলো, বাড়ীর মালিকের অবস্থা স্বচ্ছল নয়। দুর্দিনের ভেতর দিয়েই তার সময় কাটছে। বাড়ীর ভেতরে ঢুকে আমার মনের ধারণা আরও দৃঢ় হলো।

একটি পাঞ্জাবী মেয়ে এসে দরজা খুলে দিলো। সমাদ্দার আমাকে বললেন : আমার বন্ধুর গার্ল ফ্রেণ্ড। ওর সঙ্গেই থাকে। তারপর মেয়েটির দিকে ঘুরে জিজ্ঞেস করলেন : রতন প্রিজ।

মেয়েটি বললো : ভেতরে আসুন। তার এই জবাবে কোন কোমলতা ছিলো না। আমরা মেয়েটির পেছু পেছু বাড়ীর ভেতরে ঢুকলুম। একটা তীব্র ঠাণ্ডা হাওয়া যেন আমাদের দেহের ওপর দিয়ে বয়ে গেলো। মুহূর্তের জন্যে আমার মনে হলো, আমরা যেন বিশ্বজগৎ ছেড়ে অন্য কোথাও এসে ঢুকেছি। এই নতুন পরিস্থিতিতে আমি অসোয়াস্তি অনুভব করতে লাগলুম।

মেয়েটি আমাদের একটি ঘরে নিয়ে বসালো। বসবার না শোবার ঘর তা ঠিক বলতে পারবো না। কারণ সেই ঘরে বসবার মত কোন আসন ছিলো না। বাধ্য হয়ে আমরা দুজনে একটা খাটিয়ার ওপর বসলুম। মেয়েটি বললো : একটু বসুন। আমি রতনকে খবর দিচ্ছি। এখুনি আসবে।

মেয়েটি বাড়ীর ভেতরে চলে গেলো। আরও খানিকটা সময় আমরা দুজনে বসে রইলুম। দুজনের ভেতরে কোন কথাবার্তা হলো না। সমাদ্দার তখন গভীর চিন্তায় মগ্ন।

একটু বাদে সমাদ্দারের বন্ধু রতন এলো। চোখে বেশ পুরু পাওয়ারের চশমা। তার পরনে খদ্দরের পায়জামা ও পাঞ্জাবী। আমি রতনের চেহারা দেখে তার বয়স যাচাই করতে পারলুম না। বন্ধুর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে সমাদ্দার বললেন : জি-বি-এম, পুরো নাম গোবিন্দ বিহারী মালকানি, ওভারসিজ ইণ্ডিয়ান।

: ওভারসিজ ইণ্ডিয়ান? রতনের এই প্রশ্নে খানিকট যেন ব্যঙ্গ ছিলো।

: হ্যাঁ, আমাদের বিদেশী বন্ধু। আমাদের সঙ্গে কাজ করতে সম্প্রতি ভারতবর্ষে এসেছেন।

: কী কাজ? আবার রতন জিজ্ঞেস করলো। রতনের এই প্রশ্নবাণে আমি বেশ বিরক্তি বোধ করলুম। আমার জীবন ইতিহাস জানবার তার কী প্রয়োজন। মনে হলো, সমাদ্দারের বন্ধু আমার জীবন কাহিনী জানবার জন্য অহেতুক উৎসাহ প্রকাশ করছেন। রতনের প্রশ্নে সমাদ্দার একটুও বিচলিত হলেন না। মৃদু হেসে জবাব দিলেন: জি-বি-এম আমাদের জন্যে বেশ দায়িত্ব পূর্ণ কাজ করছেন। কাজ এতো গুরুত্বপূর্ণ যে এই সব কাজ আমার পার্টির সাধারণ মেম্বরদের জানাতে পারিনে।

এই কথা বলে সমাদ্দার উঠে দরজার কাছে গেলেন। তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার চারদিকে তাকিয়ে বললেন: রতন, আশা করি আমাদের আলাপ আলোচনা কেউ শুনবে না। আজ একটা বিশেষ জরুরী ও গোপনীয় ব্যাপার নিয়ে তোমার সঙ্গে শলা পরামর্শ করতে এসেছি। এই কাজে আমরা তোমার সাহায্য চাই।

রতন হাসলো। তার পর বললো: সমাদ্দার, গুড লাই ফক্স। তোমার শেয়ালী বুদ্ধি দেখছি এখনো কমে নি। নো মাই ডিয়ার, আমার বাড়ীতে তোমার কথা শুনবার মতো একমাত্র আমার বান্ধবী ছাড়া আর কেউ নেই। আর আমার বান্ধবীর কাছে আমি কিছুই গোপন রাখিনে। ওকে আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করি। অতএব নিশ্চিন্ত মনে তুমি কথাবার্তা বলতে পারো।

আমার মনে হলো রতনের জবাবে সমাদ্দার একটু ভরসা পেলেন। তবুও তিনি আবার বললেন: রতন, দেয়ালেরও কান আছে। তাই অতি সতর্ক হয়েই আমাকে কাজ করতে হয়। থাক্, আমাদের আলোচনা শুরু হবার আগে আর একটা অনুরোধ করবো।

: কী অনুরোধ? রতন প্রশ্ন করলো। তার কণ্ঠে ছিলো অপরিমিত কৌতূহলের সুর।

: আমাদের এই আলাপ-আলোচনা গোপন রাখতে চাই। এই প্রতিশ্রুতি তোমাকে দিতে হবে।

রতন বললো: হেঁয়ালী ছাড়ো সমাদ্দার। অযথা কাসুন্দী ঘেঁটে লাভ নেই। এবার বলো, তোমার পুরো কাহিনীটাই আগে শুনি। আর রতন তার জীবনে কাউকে কোন ব্যাপারে কোন প্রতিশ্রুতি দেয়নি। যদি তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো তাহলেই তোমার কথা বলো।

: রতন আমাদের এই কাহিনী তুমি তোমার বান্ধবীকেও জানাবে না, সমাদ্দার বললেন।

: আমার বান্ধবীকে আমি বিশ্বাস করি সমাদ্দার।

: মেয়ে মানুষকে কোন ব্যাপারেই বিশ্বাস করতে নেই।

: দেন য়্যু মাস্ট ফরগেট মী। কোন কথাই বলো না। একটু রূঢ় কণ্ঠেই রতন জবাব দিলো।

: রতন, এই ব্যাপার নিয়ে তোমার সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করে অনর্থক সময় নষ্ট করবো না। কারণ, আমাদের কাজের জন্যে এই অতিরিক্ত সতর্কতার প্রয়োজন হয়। না, তোমার প্রতি আমার বিশ্বাস আছে বলেই আজ তোমার কাছে এসেছি। এবার কাজের কথা শুরু করা যাক্।

এই জবাব শুনে রতনের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। বললো: উপন্যাসের ভূমিকা শুনলুম এতোক্ষণ। এবার পুরো ঘটনাটা শোনা যাক্।

: কাল রাতে আমাদের এক সহকর্মী মোটর অ্যাকসিডেণ্টে মারা গেছে, সমাদ্দার তার গল্পের ভূমিকা শুরু করলেন।

: অ্যাকসিডেণ্টে, না তাকে খুন করা হয়েছে? না সমাদ্দার, তোমার কাজ কর্মে অ্যাকসিডেণ্ট বলে কোন শব্দই নেই, বেশ গম্ভীর চালে রতন বললো।

: তোমার কথা স্বীকার করলুম রতন। অ্যাকসিডেণ্ট নয়, আমাদের সহকর্মীকে খুন করা হয়েছে। কিন্তু কেন? সেইটে বলবার জন্যেই আজ তোমার কাছে এসেছি।

তুমি জানো রতন, কয়েক মাস হলো আমরা আমাদের বন্ধুদের জন্যে কাজ করছি। তাদের জন্যে আমরা সরকারের দুষ্প্রাপ্য গোপনীয় ডকুমেণ্ট সংগ্রহ করছি। এই কাজে বিস্তর হাঙ্গামা। অনেক বিপদ। তবু আমরা কাজে বেশ কিছুটা সফল হয়েছি।

এবার সমাদ্দারের কথায় বাধা দিলো রতন। বললো: বন্ধুরা কে, শুনতে পারি কী?

সমাদ্দার জোরে হেসে উঠলেন। বললেন: সত্যি, তোমার এই ছেলেমানুষী প্রশ্ন শুনে আমার হাসি পাচ্ছে। তুমি বিলক্ষণ জানো আমাদের বন্ধু কে? তুমি এও জানো, আমরা কার হয়ে কাজ করছি। আমাদের বন্ধুদের আড্ডাখানা হলো হংকং-এ, বাইজিং-এ। যাক্ এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করে লাভ নেই। এবার পুরানো কথা শুরু করা যাক্। ভারত সরকারের গোপনীয় ডকুমেণ্টের মূল্যবান সংবাদ আমরা ক্যারিয়ার এবং রেডিও ট্রান্সমিশন মারফৎ বন্ধুদের কাছে পাঠাই। কিছুদিন আগে আমরা কতকগুলো মূল্যবান ডকুমেণ্ট সংগ্রহ

করেছিলুম। সেই সব ডকুমেণ্ট মাইক্রোফিল্ম করা হয়েছিলো। বন্দোবস্ত করেছিলুম যে এই সব মাইক্রোফিল্ম ক্যুরিয়ার মারফৎ বন্ধুদের কাছে হংকং-এ পাঠাবো। কাল রাত্রে আমাদের একজন সহকর্মী এই সব মাইক্রোফিল্ম নিয়ে পালাম বিমান বন্দরে রওনা হয়েছিলো। ঠিক এয়ার টার্মিনালের সামনে গিয়ে এক লরীর ধাক্কায় তার মৃত্যু ঘটে।

রতন, সহকর্মীর কোটের লাইনিং-এর ভেতরে ছিলো তিনটি দুষ্প্রাপ্য মাইক্রোফিল্ম। আজ আমরা এই মাইক্রোফিল্মগুলি উদ্ধার করবার জন্যেই তোমার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছি।

: কী ধরনের সাহায্য? রতন বেশ একটু ঔৎসুক্য দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

: হাসপাতালে টেলিফোন করেছিলুম। হাসপাতালের কর্তারা বলেছেন, আজ সকাল দশটার সময়ে আমাদের সহকর্মীটির ডেড বডির পোস্টমর্টেম করা হবে। আমার অনুরোধ এই পোস্টমর্টেমের সময়ে তুমি হাসপাতালে উপস্থিত থাকবে। নিজেকে মৃত ব্যক্তির ভাই বলে পরিচয় দেবে। তারপর ওর পোষাক পরিচ্ছদগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে আসবে। কারণ ওর কোটটি আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। ঐ কোটের লাইনিং-এর ভেতরে মাইক্রোফিল্মগুলো আছে।

রতন সমাদ্দারের কথা শুনে হাসলো। বললো: তুমি পাগল হয়েছো সমাদ্দার। মাইক্রোফিল্ম এতোক্ষণে আর কোটের লাইনিং এর ভেতর নেই। পুলিশ সেগুলো নিয়ে ডেভেলপ করতে শুরু করেছে।

আমি রতনের কথায় সায় দিলুম। বললুম: মিঃ রতন সাচ্চা কথাই বলেছেন। এতোক্ষণে পুলিশ এই সব মাইক্রোফিল্ম নিশ্চয় তাদের জিম্মায় নিয়ে নিয়েছে।

সমাদ্দার হাসলেন। বললেন: না, এ কখনও সম্ভব নয়। আমার মন বলছে, মাইক্রোফিল্ম এখনও কোটের লাইনিং-এর ভেতরেই আছে। না, এই উপকারটুকু আজ তোমাকে করতেই হবে রতন। সহকর্মীর ভাইয়ের পরিচয় দিয়ে তুমি হাসপাতাল থেকে তার পোশাক পরিচ্ছদগুলো সংগ্রহ করে আনবে। জানি এই কাজে বিপদের ঝুঁকি আছে। তাই তো আজ তোমার শরণাপন্ন হয়েছি, সমাদ্দার জবাব দিলেন।

রতন গম্ভীর হয়ে সমাদ্দারের কথাগুলো শুনলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো,

: একটা প্রশ্ন করতে পারি কী?

: একটা কেন হাজার প্রশ্ন করতে পারো, জবাব দিলেন সমাদ্দার।

: কী ধরনের গোপনীয় এইসব ডকুমেণ্ট তার একটু আভাস পেতে পারি কী? রতনের এই প্রশ্নে বেশ খানিকটা কৌতুহল ছিলো।

সমাদ্দার চুপ করে রইলেন। বুঝতে পারলুম কী ধরনের গোপনীয় ডকুমেন্ট, উনি তার আভাস দিতে প্রস্তুত নন। তাই রতনের প্রশ্নকে এড়াবার চেষ্টা করলেন। তার প্রশ্নের জবাবে তাই আবার প্রশ্ন করলেন: তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারলুম না রতন?

: আমার প্রশ্ন অতি সহজ ও সরল। আমি যে বিপদের ঝুঁকি নিতে যাচ্ছি, সে বিপদ কতোটা তার খানিকটা আভাস পেতে চাই। সম্পূর্ণই অন্ধকারের ভেতরে ঝাঁপ দিতে আমি প্রস্তুত নই।

সমাদ্দার বুঝতে পারলেন যে রতনের প্রশ্নকে এড়াবার উপায় নেই। যদি তাকে দিয়ে কাজ করাতে হয় তবে ডকুমেণ্টের খানিকটা আভাস তাকে দিতেই হবে। তবু এই প্রশ্নের জবাব দিতে তার সঙ্কোচ হলো। হয়তো রতনও তার এই সঙ্কোচ লক্ষ্য করলো। তাই বললো: না সমাদ্দার, সময়ের হের ফেরে তোমার চরিত্রের একটুও পরিবর্তন হয় নি। পুরানো দিনের সমাদ্দার ও আজকের সমাদ্দারের ভেতর কোন পার্থক্য নেই। সমাদ্দার, বিয়াল্লিশের কুইট ইণ্ডিয়া আন্দোলনের কথা মনে পড়ে? আমরা দুজনে একই সঙ্গে সেই বিপ্লবে যোগ দিয়েছিলুম। সেই আন্দোলনের প্রতি পদে তুমি আমাদের ধোঁকা দিয়েছিলে। কেন, আজও তার সঠিক কারণ খুঁজে বার করতে পারিনি। সমাদ্দার, হয় তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না নতুবা আমার কাছ থেকে কিছু গোপন করার চেষ্টা করছো। বলো কোনটা সত্যি?

রতনের এই অভিযোগের পর সমাদ্দার আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। তার মুখ খুলতে হলো। বললেন: রতন, আমি তোমাকে অবিশ্বাস করছিনে। কিন্তু আজ ওসব কথা খুলে বলা যায় না। তাই খুবই হুঁশিয়ার হয়েই কাজ করছি। যাক্, এবার তোমার প্রশ্নের জবাব দেবো। জানতে চাইছো আমরা কী ধরনের ডকুমেন্টকে মাইক্রোফিল্ম করেছিলুম। শোন আমার কথা।

রতন, ভারত সরকার সম্প্রতি দেশের সীমান্ত রক্ষার ব্যাপারটাকে আরও শক্তিশালী করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন। এই নিয়ে ডিফেন্স কমিটির বহু বৈঠক হয়েছে। সৈন্য বিভাগের কর্তারা অনেক গবেষণা করেছেন। এই সব আলাপ আলোচনাও সিদ্ধান্ত আমাদের কাছে বিশেষ মূল্যবান, জরুরী। আগেই বলেছি যে আমরা ভারত সরকারের দুষ্প্রাপ্য সংবাদ সংগ্রহ করি এবং সেগুলো বিভিন্ন উপায়ে আমাদের বন্ধুদের কাছে পাচার করি। কিছুদিন আগে আমরা বর্ডার এরিয়া কমিটির একটি রিপোর্ট এই উপায়ে সংগ্রহ করেছিলুম। এই রিপোর্টে অনেক মূল্যবান সংবাদ ছিলো। আমরা এই রিপোর্টটিকে মাইক্রোফিল্ম করেছিলুম।

তুমি জানো আজকাল ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স বিভিন্ন ধনের ফাইটার প্লেন ব্যবহার করছে। কোনটা মিগ টুয়েন্টি ওয়ান, কোনটা বা মিষ্টিয়ার। এই সব প্লেনের জন্যে আবার বিভিন্ন ধরনের রানওয়ের প্রয়োজন হয়। রানওয়ের দৈর্ঘ্যের মাপ দেখেই এক্সপার্টরা বলতে পারেন ভারত সরকার কোন ধরনের ফাইটার প্লেন ব্যবহার করার সঙ্কল্প করেছেন। আমরা আগ্রার ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের রানওয়ের একটা প্ল্যানের মাইক্রোফিল্ম করেছিলুম। শুধু রানওয়ের নয় সমস্ত এয়ার পোর্টের নকশাটাকেই আমরা মাইক্রোফিল্ম করেছিলুম। এবার তুমি বুঝতে পারছো রতন, আমাদের কাজ কতোটা গুরুত্বপূর্ণ।

অনেকক্ষণ একটানা কথা বলে সমাদ্দার থামলেন। হয়তো ক্লান্ত বোধ করছিলেন। রতন ও আমি বেশ গভীর মনযোগ দিয়ে তার কথা শুনছিলুম। কোন প্রশ্ন বা কৌতূহল প্রকাশ করিনি।

রতন এবার একটু হাসলো। তারপর বললো : ধন্যবাদ সমাদ্দার, এতো দিনে তবু খানিকটা মন খুলে কথা বলতে পেরেছো। এবার বলো আমাকে কী কাজ করতে হবে ?

: অর্থাৎ তুমি আমাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত আছো, এই তো ? সমাদ্দার জিজ্ঞেস করলেন।

: নিশ্চয়, নইলে তোমার কাছে কাজের চার্ট চাইতুম না।

: এই কাজে যে বিপদের আশংকা আছেই এই কথাটি তোমাকে আগেই বলে দিতে চাই, সমাদ্দার বললেন।

: জানি, বিপদ আছে বলেই তুমি আমার শরণাপন্ন হয়েছো। নইলে নিশ্চয় তুমি আমাকে স্মরণ করতে না। আর বিপদ আছে বলেই আমিও এই কাজ করতে প্রস্তুত আছি। সামান্য টাকার লোভে আমি কোন কাজ করি না।

: এ হলো দলের কাজ। সমাদ্দার আবার বললেন।

: দলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক অনেক দিন আগেই যে চুকেছে তা তুমি ভালো করেই জানো।

: একমাত্র বিপদের আকর্ষণেই কী তুমি এই কাজ করতে রাজী হচ্ছো ? সমাদ্দার আবার জিজ্ঞেস করলেন।

: না, শুধুই বিপদের আকর্ষণে নয়, আরো কারণ আছে। তা নিয়ে বর্তমানে তোমার সঙ্গে কোন তর্ক করবো না। এবার কাজের কথাটাই বল।

: দশটার সময় ডেড বডির পোস্টমর্টেম হবে। তোমার কাজ হবে সহকর্মীর পোষাক পরিচ্ছদগুলো নিয়ে আসা। কারণ ওর কোটের লাইনিং-এর ভেতর মাইক্রোফিল্ম ভরা লাইটারটি লুকানো আছে। আমাদের কাছে বর্তমানে সেই

লাইটারটিই বিশেষ মূল্যবান। আমরা তোমার সঙ্গে বিকেল চারটের সময় কনটসার্কাসের কফি হাউসে দেখা করবো। কোনো কারণে যদি চারটের সময় দেখা না হয় তাহলে ঠিক পাঁচটার সময় আমরা আবার কফি হাউসে উপস্থিত থাকবো। রাজী?

: রাজী। কিন্তু আরও একটা প্রশ্ন তোমাকে করতে চাই, রতন বললো।

: বল, কী তোমার প্রশ্ন? সমাদ্দার বললেন।

: মৃতদেহ নিয়ে আমি কী করবো? হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের কাছে মৃতব্যক্তির ভাই বলে পরিচয় দিলে নিশ্চয় তার মৃতদেহটাও তারা আমার হাতে তুলে দেবেন।

: সেই চিন্তা তোমাকে করতে হবে না। কারণ, আমি একটা সংকার সমিতির সঙ্গে বন্দোবস্ত করে রেখেছি। তারাই তার দেহ সংকারের বন্দোবস্ত করবে। রতনের প্রশ্নের জবাব দিয়ে সমাদ্দার আবার চুপ করলেন।

: দেন উই শ্যাল মীট এগেইন এ্যাট ফোর, রতন বললো।

: থ্যাঙ্কস। সমাদ্দার অতি সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন।

* * *

রতনের বাড়ী থেকে বের হয়ে বেশ খানিকটা পথ আমরা নিঃশব্দে হাঁটলুম। লক্ষ্য করলুম সমাদ্দার আবার ভাবতে শুরু করেছেন। আমি বুঝতে পারলুম সমাদ্দার রতনকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছেন না।

খানিকবাদে সমাদ্দার নিস্তব্ধতা ভাঙলেন। বললেন: জি-বি-এম, আসুন একটা ট্যাক্সি নেওয়া যাক।

: ট্যাক্সি? আমার প্রশ্নে ছিলো বিস্ময়।

: হ্যাঁ জি-বি-এম, আমরা ট্যাক্সি করে আরউইন হাসপাতালে যাবো।

: কেন? এইতো খানিক আগে বললেন আরউইন হাসপাতালে রতন যাবে।

: হ্যাঁ, রতন যাবে সহকর্মীর কোট সংগ্রহ করতে। আমি যাবো রতনের উপর নজর রাখতে।

আমার মনে কোন সন্দেহ রইলো না সমাদ্দার রতনকে বিশ্বাস করেন না। ওর মনের কথা বুঝতে পেরে বললুম: আপনি কি রতনকে অবিশ্বাস করেন? তাহলে যার প্রতি আপনার বিশ্বাস নেই তাকে এতো গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দিলেন কেন?

: এর কারণ, এই কাজের জন্য রতনই সবচাইতে যোগ্য ব্যক্তি। আর একটা কারণ, এই ব্যাপারে আমি আপনাকে জড়াতে চাইনে। কারণ, তাহলে আপনি অহেতুক পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। একটা কথা সদাসর্বদাই

মনে রাখবেন, স্পাইং-এর কাজে কাউকে বিশ্বাস করতে নেই, রতনতো দূরের কথা।

আমি এ ব্যাপার নিয়ে সমাদ্দারকে আর কোন প্রশ্ন করলুম না। আমার মনে হলো সমাদ্দার এই আলোচনা আর টানতে চান না! অতএব আমিও চুপ করলুম।

সমাদ্দার ট্যাক্সি ডাকলেন। ড্রাইভারকে বললেন: আরউইন হাসপাতাল।

গাড়ী আরউইন হাসপাতালের দিকে ছুটে চললো।

* * *

লোক গিস গিস করছে আরউইন হাসপাতালে। রুগীর চাইতে দর্শকের ভিড় বেশী। নিশ্চিন্ত মনে চলা ফেরার জো নেই। ডাক্তার নার্স এদিক ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে। আয়োডোফর্মের গন্ধে হাসপাতাল ভরপুর। লাউঞ্জে বিস্তর লোক দাঁড়িয়েছিলো। হয়তো রুগীদের আত্মীয়স্বজন হবে। তাদের কেউ কেউ বা ডাক্তারের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে।

হাসপাতালের এই দৃশ্য সত্যিই আমার কাছে বিচিত্র লাগলো। এই আবহাওয়ার ভেতরে আমি বেশ অসোয়াস্তি বোধ করলুম। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখে চাপা দিলুম।

সমাদ্দার আমার পানে তাকালেন। বুঝতে পারলেন যে আমি খুবই অসোয়াস্তি বোধ করছি। তাই বললেন: জি-বি-এম, আমরা আর হাসপাতালের ভেতরে ঢুকবো না। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। এখান থেকেই আমরা রতনের ওপর নজর রাখবো। জি-বি এম, রতনকে আমরা চোখের আড়াল করতে চাইনে।

সেদিন আমরা আরউইন হাসপাতালের সামনে বৃথাই সময় কাটালুম। সময় বয়ে গেল দ্রুত বেগে। বিস্তর লোক এলো গেলো। ঠিক দশটার খানিকটা আগে রতন এলো। হাসপাতালে ঢুকবার আগে সে একবার চারদিকটায় খুব ভালো করে তাকিয়ে দেখে নিলো। আমি বুঝতে পারলুম যে রতনের মনেও সন্দেহ জেগেছে যে তার পেছনে ফেউ লেগেছে। কে সেই ফেউ? নিশ্চয় সমাদ্দার। রতন সমাদ্দারকে বিশ্বাস করে না। সমাদ্দারও রতনকে বিশ্বাস করেন না। মাণিক মাণিককে চেনে। কিন্তু আজ রতন আমাদের দেখতে পেলো না। প্রথম পরীক্ষায় সমাদ্দারই যে জিতলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

দশটা, এগারোটা বেজে গেলো কিন্তু রতন তখনও হাসপাতাল থেকে বের হলো না। আমি সমাদ্দারের মুখের দিকে তাকালুম। হ্যাঁ, তার মুখ গম্ভীর

হয়েছে। আমিও একটু চিন্তিত হলুম। হাসপাতাল থেকে কেন রতন এখনও বের হলো না তার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পেলুম না।

হাসপাতালের ঘড়িতে বারোটার ঘণ্টা বাজলো, তবুও দেখা নেই রতনের। খানিক বাদে সৎকার সমিতির ভ্যানটাও বেরিয়ে গেলো। এবার সমাদ্দার বেশ একটু হতাশার সুরে বললেন: আশ্চর্য। স্ট্রেঞ্জ। আমাদের পাখীটি, কেন এখনও হাসপাতাল থেকে বের হলো না। এর কারণ কী বলতে পারেন?

আমি বললুম: সমাদ্দার সাহেব, আমার মন কী বলছে জানেন? হয়তো হাসপাতালের কর্তারা রতনকে সন্দেহ করেছেন। কিংবা হয়তো পুলিশই তাকে এতোক্ষণে পাকড়াও করেছে।

সমাদ্দার আমার কথা মানলেন না। উনি স্বীকার করলেন না যে পুলিশ রতনকে পাকড়াও করতে পারে। রতনের বুদ্ধির ওপরে তার বিশ্বাস আছে। বললেন, এর চাইতেও অনেক বিপদজনক কাজ রতন করেছে। কখনও কাজে ত্রুটি হয় নি। আজই বা হবে কেন?

: তাহলে রতন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, আমি বললুম। আমার কণ্ঠে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের স্বর ছিলো।

আমার কণ্ঠস্বর শুনে সমাদ্দার চুপ করে গেলেন। আমি এবার দেখতে পেলুম সমাদ্দারের মুখের রং পাল্টাচ্ছে। হয়তো উনি বুঝতে পেরেছেন যে আমার কথার ভেতরে যুক্তি আছে। তাই হয়তো ওর মনেও সন্দেহের তুফান উঠেছে।

আমি বললুম: মিঃ সমাদ্দার, চলুন কোথাও থেকে টেলিফোন করা যাক্। হাসপাতালের কর্তাদের কাছে খোঁজ করে দেখা যাক্ রতনের কী হলো।

: ফরগেট ইট জি-বি এম। রতনকে নিয়ে চিন্তা করে লাভ নেই। আজ বিকেল চারটে অবধি আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে। আমি হলপ নিয়ে বলতে পারি রতন ঠিকই চারটের সময় কফি হাউসে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করবে। আমার কী মনে হচ্ছে জানেন? হয়তো পুলিশ রতনের পেছু নিয়েছে। তাই রতনও গা ঢাকা দিয়েছে। জি বি-এম, আমরা অনর্থক মাথা ঘামাচ্ছি। চলুন, এবার যাওয়া যাক্।

: কোথায়? আমি জিজ্ঞেস করলুম।

: কনটসার্কাসের কোয়ালিটি রেস্তোরাঁয়। লাঞ্চ খেতে হবে তো? সমাদ্দার বললেন।

দশ মিনিটের মধ্যে আমরা কনটসার্কাসে চলে এলুম। লাঞ্চ খেতে আমাদের

বেশিক্ষণ সময় নিলো না। খাবার সময় আমাদের মধ্যে কোন কথাবার্তাও হলো না। কারণ সে সময়ে আমরা দুজনেই গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলুম।

লাঞ্চের শেষে আমি হোটেলে চলে এলুম। সমাদ্দার আমাকে বললেন: জি-বি-এম, আমার একটা বিশেষ জরুরী কাজ আছে। চারটের সময় আমাদের আবার কফি হাউসে দেখা হবে। এক্সাটলি এ্যাট ফোর উই শ্যাল মীট এগেইন।

সমাদ্দারও বিদায় নিলেন তার পর।

*　　　*　　　*

হোটেলে এসে খানিকটা সময় আমি জিরিয়ে নিলুম। কতোক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলুম বলতে পারবো না। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো। ঘড়িতে তাকিয়ে দেখলুম তখনও চারটে বাজে নি। আমার মনে পড়লো চারটের সময় আমাকে কফি হাউসে সমাদ্দারের সঙ্গে দেখা করতে হবে। সমাদ্দার আমার জন্যে সেখানে প্রতীক্ষা করবেন। তার পর রতন আসবে। কিন্তু আমার মন বলতে লাগলো আজ আমরা রতনের দেখা পাবো না।

হঠাৎ আমি কোটের পকেটে হাত দিলুম। সকালে যে চিঠিখানা না পড়েই পকেটে পুরে রেখেছিলুম সেই চিঠি তখনও আমার পকেটেই ছিলো। সারাটা দিনের উত্তেজনায় চিঠিখানা পড়বার মোটেই সময় পাইনি। এবার চিঠিখানা হাতে নিলুম। কে লিখেছে এই চিঠি জানবার কৌতূহল হলো। আমি চিঠিখানা খুললুম।

এ চিঠি নয়। কোনও সংস্থার একটা সামান্য বিজ্ঞাপন। বার বার বিজ্ঞাপনটি পড়লুম। আমার কাছে এই বিজ্ঞাপনটি পাঠাবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পেলুম না। চিঠিখানা পড়তে পড়তেই কিন্তু আমার নজরে পড়লো যে এর প্রতিটি লাইনের শেষেই একটি করে ফুলস্টপ দেওয়া আছে। আমি এই ফুলস্টপের উপরে হাত বুলালুম। আমার মনে হলো এ সামান্য ফুলস্টপ নয়। মাইক্রোডট। বন্ধুরা নিশ্চয় আমার কাছে কোন গোপনীয় সংবাদ পাঠিয়েছেন এই মাইক্রোডট মারফৎ।

মাইক্রোডট ডেভেলপ না করলে এই গুপ্ত সংবাদ জানা যাবে না। এই কাজ করতে বেশ খানিকটা সময় নেবে। অথচ আমার হাতে তখন বেশি সময় নেই। অতএব আবার চিঠিখানা পকেটে ভরলুম। মাইক্রোডটের মারফৎ চিঠির ভেতরে যে গুপ্ত সংবাদ লুকানো ছিলো সেই সংবাদ আমার জানা হলো না। ইতিমধ্যে ঘড়ির কাঁটাও প্রায় চারটের দাগে গিয়ে দাঁড়ালো। তাই আমি আর দেরি না করে কফি হাউসের দিকে রওনা দিলুম।

আজ কফি হাউসের সামনে আসতেই আমার মনের উত্তেজনা বাড়তে লাগলো। ভাবলুম, হয়তো একটু বাদেই আমার মনের সমস্ত উদ্বেগ দূর হবে। কিন্তু চেষ্টা করেও আমার মনের উত্তেজনাকে দূরে রাখতে পাবলুম না।

*　　　*　　　*

কফি হাউসের সামনে এক পানওয়ালা বসেছিলো। সমাদ্দার তার কাছ থেকে পান কিনছিলেন। আমিও পানওয়ালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। কিন্তু সমাদ্দার আমার প্রতি নজর দিলেন না। ভাবটা এমন করলেন যেন আমাকে দেখতেই পান নি। তারপর পানওয়ালার পয়সা চুকিয়ে দিয়ে কফি হাউসের ভেতরে ঢুকলেন।

বিস্তর লোক কফি হাউসের ভেতর বসেছিলো। তাদের কলরবে কফি হাউস মুখরিত। আমরা দুজনেই ঘরের চারদিকে তাকাতে লাগলুম। কিন্তু কোথায় রতন? সারা ঘরে কোথাও রতনের দেখা পেলুম না। আমি তাকিয়ে দেখলুম, সমাদ্দার বেশ বিচলিত হয়েছেন। তার মুখটা বেশ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। উত্তেজনায় তার হাত কাঁপছে।

কিন্তু এই উত্তেজনা কেন? রতন মাইক্রোফিল্ম নিয়ে গেছেই বলে কি? কিন্তু রতন কে, তার পূর্ব ইতিহাস কি, সবই তো সমাদ্দার জানতেন! উনি তো ইচ্ছে করেই মাইক্রোফিল্ম উদ্ধারের ভার রতনকে দিয়েছেন। অতএব এখন উত্তেজিত বা বিচলিত হবার কোন সঙ্গত কারণ নেই।

আমিও খানিকটা উত্তেজিত হয়েছিলুম ঠিকই। কিন্তু সে উত্তেজনা হয়েছিলো অন্যান্য বিভিন্ন কারণের জন্য। এই ঘটনার রহস্য ভেদ করার জন্যই আমার উত্তেজনা হয়েছিলো।

এবার সমাদ্দার বেশ একটু হতাশার কণ্ঠে বললেন: জি-বি এম, খানিকটা সময় ঘুরে আমরা আবার পাঁচটার সময় কফি হাউসে আসবো। হয়তো কোন কারণবশতই রতন চারটের সময় আসতে পারেনি। পাঁচটার সময় নিশ্চয় সে আসবে।

অতএব আবার আমরা কনটসার্কাস দিয়ে হাঁটলুম। দুজনের মনের মধ্যেই তখন সন্দেহের ঝড় উঠেছিলো। ভাবছিলুম, রতন কি আমাদের ফাঁকি দিলো!

ঠিক একঘণ্টা বাদে আবার আমরা কফি হাউসে ফিরে এলুম। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলুম ঠিক পাঁচটা বাজে। কফি হাউসের ভেতর ঢুকলুম। এবারও রতনকে কোথাও দেখতে পেলুম না। আমি সমাদ্দারকে বললুম: সমাদ্দার সাহেব, রতন আসবে না। আমি দিব্যি কেটে বলতে পারি, রতন আপনার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। অবশ্যি এর জন্যে সম্পূর্ণ দোষ আপনারই।

কারণ আপনি জেনে শুনেই রতনকে এই কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন। এবার দেখুন, কী ফ্যাসাদে পড়া গেলো!

আমার অভিযোগ শুনে সমাদ্দারের মুখ আরো গম্ভীর হলো। নিজের ভুল যেন তিনি বুঝতে পারলেন। অতএব কোন জবাব দিলেন না।

: এবার কী করবেন? আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম।

: আমার মন কিন্তু বলছে আমি রতনের দেখা পাবোই। খানিকটা সময় আরো দেরি করে দেখা যাক্। জবাব দিলেন সমাদ্দার।

: কোথায়? কফি হাউসে? আপনি কি পাগল হয়েছেন মিঃ সমাদ্দার! আমরা এখানে অনর্থক বসে থাকলে বিস্তর লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো।

: বেশ, তাহলে চলুন বাইরেই ঘোরা যাক্ খানিকটা। একটু পরে আর একবার কফি হাউসে ঢু মেরে দেখা যাবে।

আমরা দুজনেই এরপর আবার কফি হাউস থেকে বেরিয়ে এলুম। রাস্তায় বেরিয়ে ফুটপাথ ধরে হাঁটতে লাগলুম। হঠাৎ একটি ছোট ছেলে এসে আমাদের বাধা দিলো।

: আপনারা কাউকে খুঁজছেন স্যার? ছেলেটি জিজ্ঞেস করলো।

ছেলেটির প্রশ্ন শুনে আমরা দুজনেই খুব বিস্মিত হলুম।

: হ্যাঁ, এই প্রশ্ন করছো কেন? সমাদ্দার ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলেন।

: এক ভদ্রলোক এখন আপনাদের জন্যে আল্লস রেস্তোরাঁয় বসে আছেন। তিনিই আমাকে বললেন আপনাদের ডেকে আনতে। চলুন আমার সঙ্গে।

সমাদ্দার আমার মুখের দিকে তাকালেন। তারপর একবার একটু মৃদু হাসলেন। তার এই হাসির অর্থ হলো যে তার অনুমান ভুল হয় নি। হ্যাঁ, রতনই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

আমরা ছেলেটির সঙ্গ ধরে আল্লস্ রেস্তোরাঁয় এলুম।

রেস্তোরাঁ ঘরটার এক প্রান্তে রতন বসেছিলো। আমাদের দেখে বললো: গুড ইভনিং জেন্টেলমেন। স্বাগতম।

রতনের কণ্ঠে ছিলো ঠাট্টার সুর। সমাদ্দার তার কথার কোন জবাব দিলেন না।

* * *

: ওল্ড কমরেড সমাদ্দার, সত্যিই তোমার প্রতিভার তারিফ করতে হয়, রতন বললো।

: মিঃ সমাদ্দার যে প্রতিভাবান এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, আমি ফোড়ন কাটলুম। আমার মন্তব্যে হয়তো সমাদ্দার সন্তুষ্ট হলেন না। তাই বেশ একটু

ভ্রূকুটি করে আমার দিকে তাকালেন। অতএব আমি চুপ করে গেলুম।

: হঠাৎ আমার প্রশংসা করছো কেন রতন? বেশ একটু গম্ভীর কণ্ঠেই প্রশ্ন করলেন সমাদ্দার।

: এই সংসারে জিনিয়াসের তারিফ কয়জনে করে, রতন জবাব দিলো। তারপর সে একটা সিগারেট ধরালো।

: কমরেডস, এবার আসুন আগে আপনাদের পুরো কাহিনীটা শোনা যাক্, হাতের সিগরেটটায় একটা লম্বা টান দিয়ে রতন আবার বললো।

: আমাদের কাহিনী নয় রতন, তোমার কাহিনী শুনতেই আমরা এখানে এসেছি। সমাদ্দার বললেন।

: দি আইডিয়া। সত্যিই আমি ভেবেছিলুম আজ তুমিই আমাকে রামায়ণ মহাভারতের গল্প শুনিয়ে তোমার প্রতিভার পরিচয় দেবে। না সমাদ্দার, তুমি আমাকে একেবারেই নিরাশ করলে। রতনের কথার ভেতর প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ ছিলো।

: সমাদ্দার তুমি হলে ওল্ড ফক্স, রতন আবার বললো,—মানে একেবারেই একটি ধূর্ত শেয়াল। এবার তুমি আমার একটি কথার জবাব দাও। বলো, আজ সকালে কী উদ্দেশ্যে আমাকে আবউইন হাসপাতালে পাঠিয়েছিলে? কি ছিলো তোমার মতলব? আমাকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে না সত্যিই তুমি তোমার সহকর্মীর জামা কাপড় উদ্ধার করতে আমাকে সেখানে পাঠিয়েছিলে?

: তোমার এই হেয়ালী কথা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিনে রতন, সমাদ্দার বললেন।

: আমার কথা অতি সহজ সরল কমরেড সমাদ্দার। বেশ একটু কর্কশ কণ্ঠেই রতন বললো,—কারণ আমি জানি তুমি আমাকে বিপদে ফেলতে চেয়েছিলে? কিন্তু কী জন্যে আমাকে বিপদে ফেলতে চাইছিলে? হ্যাঁ, তার কারণও বলছি শোন। সমাদ্দার, তুমি তোমার নিজের ওপরে পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাওনি। কারণ, তুমি জানতে সহকর্মীর জামা কাপড় যে-ই সংগ্রহ করতে যাক্ না কেন, পুলিশ তার পেছু নেবে। অতএব তুমি এক মতলব ঠাওরালে। আমাকে খুঁজে বের করলে। আর আমাকে অনুরোধ করলে তোমার সহকর্মীর জামা কাপড় খুঁজে আনতে। তুমি আমাকে মিথ্যে কথা বলেছিলে যে তোমার সহকর্মীর কোটের লাইনিং-এর ভেতরে মাইক্রোফিল্ম লুকানো আছে। তুমি ভালো করেই জানতে মাইক্রোফিল্ম কোটের লাইনিং-এর ভেতরে নেই। তাহলে কোথায় ছিলো সে মাইক্রোফিল্ম? এই রহস্য তো শুধু তুমিই জানতে

যাক্, আজ তুমি সকালে আমার সঙ্গে দেখা করবার পর হঠাৎ আমি ভাবতে লাগলুম, সমাদ্দার আজ আবার আমার স্মরণাপন্ন হলো কেন ? কী তার উদ্দেশ্য ? হঠাৎ কেন আমাকে এই বিপদে ফাঁসাতে চায় ? অনেক ভেবে চিন্তে দেখলুম সমাদ্দার, তুমি পুলিশকে এড়াতে চাও। তুমি চাও পুলিশ অন্য কারও উপরে নজর রাখুক আর এদিকে তুমি গোপনে মাল উদ্ধার করবে। মতলবটা তুমি ভালোই করেছিলে কিন্তু আসলে কাজে খাটলো না। আমি তোমার প্রস্তাবের ভেতর যে এক চাতুরী আছে তা ঠিকই বুঝতে পেরেছিলুম। কিন্তু মাইক্রোফিল্ম যে কোথায় লুকানো আছে তা ঠিক বুঝতে পারি নি।

আশ্চর্য ! ভাবছো আমি কী করে মাইক্রোফিল্মের সন্ধান পেলুম। কমরেড সমাদ্দার, সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। ডাক্তার পোস্টমর্টেম শুরু করলো। হঠাৎ আমাকে বললো : আপনার ভাই-এর নকল দাঁতের পাটী ছিলো। নকল দাঁতের কথা শুনেই আমি তোমার কারসাজী বুঝতে পারলুম। বুঝতে পারলুম মাইক্রোফিল্ম কোটের লাইনিং-এর ভেতর লুকানো নেই, লুকানো আছে এই দাঁতের পাটীর ভেতর। কিন্তু সমাদ্দার আজ সকালে তুমি কেন আমাকে ধাপ্পা দিলে। কেন আমার সঙ্গে চারশ' বিশের খেলা খেললে। কারণ, তুমি ভেবেছিলে যে আমি হাসপাতাল থেকে তোমার সহকর্মীর জামা কাপড় নিয়ে বের হবো আর পুলিশ আমার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে। ইতিমধ্যে সৎকার সমিতির ভ্যান এসে মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাবে। এবং শ্মশানে গিয়ে এই নকল দাঁতের পাটীর ভেতর থেকে তুমি এই মাইক্রোফিল্ম উদ্ধার করবে। ওয়াণ্ডারফুল আইডিয়া। এ জন্যেই সমাদ্দার আজ আমি তোমার বুদ্ধির তারিফ করছিলুম। পুলিশের খাঁচায় যাবে কে ? শ্রীমান রতন। আর মাইক্রোফিল্ম নিয়ে মজা করবে কে ? না, সমাদ্দার। বন্ধুত্ব ! সমাদ্দার তোমার এই বন্ধু প্রীতির জন্যে অশেষ ধন্যবাদ।

কিন্তু সমাদ্দার, আমি দুঃখিত যে বিধাতা তোমার সঙ্কল্প পূরণ করেন নি। কারণ, যেই মুহূর্তে আমি তোমার চাতুরী বুঝতে পারলুম সেই মুহূর্তেই তোমার উপর টেক্কা দিলুম। নকল দাঁতের পাটী ডাক্তারের হাত থেকে নিজেই নিয়ে নিলুম। দাঁতের পাটী নিয়ে বাথরুমে গেলুম। তারপর সবার অজ্ঞাতসারে সেই মাইক্রোফিল্ম ওখান থেকে সরিয়ে নিলুম। তুমি শ্মশানে গিয়ে দাঁতের পাটীর ভেতর মাইক্রোফিল্মের সন্ধান করলে। গরু খোঁজা খুঁজলে। কিন্তু কোথায় মাইক্রোফিল্ম ! সেই সময়ে ঐ মাইক্রোফিল্ম ছিলো আমার হাতের মুঠোয়।

যাক্, এবার তোমার কী প্রস্তাব তাই বল শুনি ? রতন তার শেষের কথা দুটি বেশ জোরেই বললো।

: কীসের প্রস্তাব ? ওল্ড পার্টি কমরেড তুমি আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করতে

পারো না। সমাদ্দারও বেশ একটু জোরেই বললেন।

: কিন্তু এই গুড পার্টি কমরেডকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে একটুও দ্বিধা বা সংকোচ তোমার হয় নি। তুমি আমার কাছে কোন প্রস্তাব না করলেও আমি তোমার কাছে একটা প্রস্তাব করবো। সমাদ্দার, আমি তোমার কাছে এই মাইক্রোফিল্মের রোলটি বিক্রি করবো। হ্যাঁ, বেশ একটু চড়া দামে। বেশী নয়, নিদেন পক্ষে এক লাখ টাকা পেলেই আমি সন্তুষ্ট হবো।

: রতন, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, সমাদ্দার একটু উত্তেজিত হয়ে বলেন।

: তোমার সঙ্গে কাজ করলে কার না মাথা খারাপ হয় সমাদ্দার। একটু বিদ্রূপের সুরেই রতন কথাটা বললো।

: নট এ পেনী। না রতন, এই মাইক্রোফিল্মের প্রকৃত মালিক হলুম আমি কিংবা আরো সংক্ষেপে বলতে পারো পার্টি। এই মাইক্রোফিল্মের ওপরে তোমার কোন অধিকার নেই। নট এ বাঁট। অতএব এর জন্যে তোমাকে একটি পয়সাও দিতে আমি রাজী নই।

: তাহলে আমাকে অন্য খরিদ্দার দেখতে হবে কমরেড সমাদ্দার। ভারত সরকারের টপ সিক্রেট ডকুমেণ্ট নিশ্চয় আরো চড়া দামেই বিক্রি হবে। চাণক্য পুরীতে গিয়ে একবার ফেরি করলেই নিশ্চয় বিস্তর ক্লায়েণ্ট মিলবে।

থাক্, আজ তুমি উত্তেজিত এবং বলতে পারি, বেশ খানিকটা নিরাশও হয়েছো। অতএব আমার প্রস্তাব ভেবে দেখার জন্য তোমাকে পনের দিনের সময় দিলুম। এর মধ্যে হয় তুমি আমার কাছ থেকে এক লাখ টাকা দিয়ে এই মাইক্রোফিল্ম কিনে নাও নতুবা অন্যের কাছেই আমি এই ফিল্ম বিক্রি করবো। জাস্ট থিংক ওভার দি ম্যাটার। আমার সন্ধান কোথায় পাবে তা তুমি জানো সমাদ্দার। গুড বাই, বলেই রতন চলে গেলো।

সমাদ্দার আর আমি দুজনে বোকার মতো বসে রইলুম।

খানিকটা বাদে সমাদ্দার মৃদু কণ্ঠে বললেন: স্কাউণ্ড্রেল, সুইণ্ডলার!

এরপরে কফির পয়সা দিয়ে আমরা দুজনে রাস্তায় বেরিয়ে এলুম।

তখনও সন্ধ্যা হয় নি। রাস্তার বাতি জ্বলে ওঠেনি। আমি দেখতে পেলুম সমাদ্দার খুব গভীর চিন্তা করছেন। চিন্তার অবিশ্যি কারণ ছিলো। রতন পনের দিন সময় দিয়েছে। বলেছে, হয় টাকা দাও নতুবা মাইক্রোফিল্ম অন্যের কাছে বিক্রি করবো।

হঠাৎ আমার মনে সমস্ত দিনের ঘটনা এসে জড়ো হলো। মনে মনে আমি সমাদ্দারের বুদ্ধির প্রশংসা করলুম। মাইক্রোফিল্ম উদ্ধারের যে পন্থা তিনি

বাতলে ছিলেন তা যে সত্যিই প্রশংসনীয় এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কপালের দুর্ভোগে সমস্ত প্ল্যান বানচাল হয়ে গেলো। রতনকেও প্রশংসা করতে হয় বৈকি। স্বীকার করতে হবে যে শয়তানের ওপরেও সে টেক্কা মেরেছে। মূল্যবান মাইক্রোফিল্ম হস্তগত করেছে। আর সেই মাইক্রোফিল্ম এখন একটা বিরাট অঙ্কের টাকার বিনিময়ে বিক্রি করবার চেষ্টা করছে।

ব্ল্যাক মেলিং—না, সমাদ্দারের এই অভিযোগ আমি স্বীকার করবো না। রতন সুইগুলার স্কাউণ্ড্রেল একথা আমি স্বীকার করতে রাজী নই। স্পাইং-এর কাজে ভালোমন্দর বিচার করা চলে না, সৎ অসতের কথা ওঠেন না।

অনেকক্ষণ আমরা দুজনে একমনে হাঁটছিলুম। কনটসার্কাসে পুরো এক চক্কর ঘুরলুম। তবু আমাদের ভেতর কোন কথাবার্তা হলো না। সমাদ্দারের গাম্ভীর্য আমাকে বিচলিত করলো। অতএব আমিই প্রথমে কথা বললুম।

: তারপর ?

আমার প্রশ্নে সমাদ্দার যেন চমকে উঠলেন। তাঁর সমস্ত চিন্তাধারা ছিন্ন হলো। মুহূর্তের ভেতর তিনি আবার নিজেকে সামলে নিলেন। মনের অস্থিরতাকে ভাষায় বা ভাবে ব্যক্ত করলেন না। আমার প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন : তারপর কী জি-বি-এম ?

: এই নাটকের পরবর্তী দৃশ্য কবে এবং কখন শুরু হবে ? আমি আবার প্রশ্ন করলুম।

আমার কথায় খানিকটা ব্যঙ্গ ছিলো। এই বিদ্রূপ যেন সমাদ্দারের গায়ে বিঁধলো। উনি বেশ খানিকটা সময় আমার পানে একদৃষ্টে তাকালেন। তারপর বললেন : নাটক আবার প্রথম থেকেই শুরু করতে হবে।

: মানে ? আমি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলুম।

: জি-বি-এম, আমাদের কাছে বর্তমানে দুটো পথ খোলা আছে। হয় আমরা এক লাখ টাকা দিয়ে এই সব মূলবান মাইক্রোফিল্ম খরিদ করবো নতুবা আবার ঐ সব ডকুমেন্ট নতুন করে মাইক্রোফিল্ম করবো।

আমার মন বলছে যে রতন এই সব মাইক্রোফিল্মের কপি পাকিস্তানের হাইকমিশনে বিক্রি করবে। অর্থাৎ আমাদের কাছ থেকে যেমন এক লাখ টাকা নেবে তেমন পাকিস্তানের কাছ থেকেও লাখ খানেক টাকা বাগাবে।

: তা হলে এখন আপনি কী করবেন ? আমি জিজ্ঞেস করলুম।

: পুরানো মাল কিনে লাভ নেই। আমাদের সমস্ত ডকুমেন্ট আবার নতুন করে মাইক্রোফিল্ম করতে হবে।

: এক কথায় আপনি এই-ই বলতে চাইছেন যে বর্তমান নাটকের অভিনয়

এইখানেই সমাপ্ত হলো। আবার আমরা নতুন করে নাটক করবো?

: দ্যাট্‌স্ রাইট জি-বি-এম, আপনি ঠিক বলেছেন। আবার আমাদের নতুন করে নাটক শুরু করতে হবে।

: মানে আবার সমীর সেনের মারফৎ এই সব গোপনীয় কাগজ সংগ্রহ করতে হবে। এই তো?

: না, সমীর সেনকে আমাদের আর প্রয়োজন নেই।

: আপনি কী বলছেন সমাদ্দার সাহেব? আমি বেশ একটু উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করলুম।

: সত্যি কথা বলছি জি-বি-এম, আমাদের কাজে কারও পরিচয় একবার জানাজানি হয়ে গেলে সেই এজেন্টকে আর কাজে লাগানো যায় না। না মাইক্রোফিল্ম চুরি যাবার পর থেকেই আমাদের কাছে সমীর সেনের মূল্য কমে গেছে। কারণ, আজ না হয় কাল, কোন প্রকারে ভারত সরকার এই মাইক্রোফিল্মের অস্তিত্ব জানতে পারবে। আর ভারত সরকার জানতে পারলে পুলিশের দৃষ্টিও অবশ্যই সমীর সেনের ওপরে পড়বে। না, জি-বি-এম, সমীর সেনকে দিয়ে আর আমাদের কাজ চলবে না। আমাদের নতুন পথ আবিষ্কার করে নিতে হবে। নতুন শিকার খুঁজে নিতে হবে।

আজ আমাদের কাছে সমীর সেনের মূল্য শুধু কমে যায় নি, আমাদের কাছে সে এখন এক বিপজ্জনক লোক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

: কেন? আমি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করলুম।

: কারণ, যদি পুলিশ একবার সমীর সেনের সন্ধান পায় তাহলে আপনার আমার বিপদও বাড়বে।

: আপনার কথার মানে ঠিক বুঝতে পারলুম না। আমি বললুম। আমার কাছে সমাদ্দারের কথা খুব হেঁয়ালী ও অস্পষ্ট বলে মনে হলো।

: মানে অতি সহজ ও সরল। ধরুন, পুলিশ সমীর সেনকে গ্রেপ্তার করলো। তাহলেও কী পুলিশ জানতে পারবে না যে আপনি কী উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে এসেছেন? সমাদ্দার কে, একথাও তারা জানতে পারবে। এক কথায় আমাদের কাজের সমস্ত আভাসই তারা পেয়ে যাবে।

: এই বিপদের হাত থেকে রেহাই পাবেন কী করে? আমি আবার জিজ্ঞেস করলুম।

: মানিকলালের কী হয়েছিলো মনে আছে তো? যেই আপনি তার বাড়ী থেকে ট্রান্সমিশন করার প্রস্তাব করলেন অমনি লোকটা ভয় পেলো। মানিকলাল ভয় পেয়ে ঠিক করলো যে পুলিশের কাছে যাবে। ভাগ্যিস আমরা

ঠিক সময়ে এই খবরটা পেয়েছিলুম যে মানিকলাল পুলিশের কাছে যাবার সংকল্প করেছে, তাই ঠিক সময়েই আমরা আমাদের পথের কাঁটা দূর করতে পেরেছিলুম।

মানিকলালের মৃত্যু যে রাস্তার সামান্য দুর্ঘটনা নয় সেই খবর আমি আগেই অনুমান করেছিলুম। অনুমান করেছিলুম যে তাকে হত্যা করা হয়েছে। আজ সমাদ্দারের কথায় আমার সমস্ত সন্দেহ দূর হলো। আমি আবার জিজ্ঞেস করলুম: অর্থাৎ মানিকলাল হ্যাজ বীন মার্ডার্ড, তাই না?

: না না, মার্ডার শব্দটা বড্ডোই তীব্র জি বি-এম। বরং বলুন, মানিকলালকে কাজের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

: বেশ, এবার বলুন, সমীর সেনের ব্যাপারে কী করবেন? আপনার মনে আশংকা হয়েছে যে সমীর সেন আজ আপনার কাছে বিপজ্জনক ব্যক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনার কথাই মানলুম। কিন্তু আপনি কী সমীর সেনকেও খুন করতে চান নাকি?

: পাগল হয়েছেন। সমীর সেনকে খুন করার কোন প্রয়োজন হবে না। পৃথিবী থেকে কাউকে সরাতে হলে সব সময়েই তাকে খুন করার দরকার হয় না। তার স্বাভাবিক মৃত্যুও হতে পারে।

: অর্থাৎ? আমার কণ্ঠে ছিলো বিস্ময় ও কৌতূহল।

: মানে অতি সহজ ও সরল। সমীর সেনের হার্টের অসুখ আছে। কোন কারণে সামান্য কোন শক্ খেলেই সমীর সেনের স্বাভাবিক মৃত্যু হবে।

: আপনি সত্যিই জিনিয়াস সমাদ্দার সাহেব। না, আপনার বুদ্ধির প্রশংসা আমাকে করতেই হবে। কিন্তু বলুন, এবার কী ধরনের শক্ সমীর সেনকে দিতে চান?

সমাদ্দার আমার দিকে তাকালেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন: আপনি মেয়ে মানুষ ভালোবাসেন জি বি এম?

এবারে আবার আমার বিস্মিত হবার পালা। আমি সমাদ্দারের মুখের দিকে তাকালুম।

: হ্যাঁ জি বি-এম, আপনি সুন্দরী মেয়ে ভালোবাসেন। তাই অতো সহজে মিসেস সেনের প্রেমে পড়েছেন। সমীর সেনও মিসেস সেনকে ভালোবাসে। কিন্তু ওরা বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী নয়। তাই সমীর সেনের সর্বদাই ভয় যে মিসেস সেন হয়তো তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। কারণ, মেয়ে মানুষকে সমীর সেন একেবারেই বিশ্বাস করে না। আমিও করি না। আপনার মতো আমার মন অতো দুর্বল প্রকৃতির নয়। থাক্, এবার কাজের কথায় আসা যাক্। ধরুন

সমীর সেন একদিন বিকেলে বাড়ী ফিরে দেখলো যে আপনি আর মিসেস সেন নিভৃতে একঘরে বসে প্রেমালাপ করছেন। তাহলে কী হবে? সমীর সেন মনে প্রচণ্ড আঘাত পাবে। নিশ্চয় এর পরবর্তী ঘটনা আর আপনাকে ব্যাখ্যা করে বলতে হবে না।

সমাদ্দারের প্ল্যানে যে অভিনবত্ব আছে একথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু আমার মনে ভয় হলো এই ভেবে যে, মিসেস সেন কেন আমার সঙ্গে প্রেম করবেন। সমীর সেনের হার্ট দুর্বল। কোন শক পেলে যে কোনো মুহূর্তে তার মৃত্যু হতে পারে। এ কথা জানা থাকা সত্ত্বেও কেন মিসেস সেন আমার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করবেন?

কিন্তু গোবিন্দ বিহারী মালকানি কখনও মেয়ে মানুষের লোভ সামলাতে পারে না। বিশেষ করে মিসেস সেনের সান্নিধ্য পাবার জন্যে আমি আগেই ব্যাকুল হয়েছিলুম। আজ বিধাতা না চাইতেই আমাকে সেই সুযোগ ঘটিয়ে দিলেন। না, এমন সুযোগ কখনই প্রত্যাখ্যান করা যায় না।

সমাদ্দার বললেন: জি-বি-এম, আপনি বলেছিলেন যে ভারতবর্ষে জীবন নেই। আপনার সে কথাটা একটুও ঠিক নয়। এদেশের সর্বত্রই গোপনে আনন্দের ফল্গুধারা বয়ে চলেছে। সে আনন্দ পাবার জন্যে চোখ কান খোলা রেখে চলতে হয়। বেরুটে যে আনন্দ আপনারা প্রকাশ্যে করেন, ত হয়তো আমরা এখানে লোকচক্ষুর আড়ালে করি। যাক্, আমার প্রস্তাবে কোন প্রতিবাদ করবেন না।

সমাদ্দারের কথায় আমি কোন প্রতিবাদ করলুম না ঠিকই, কিন্তু একটা প্রশ্ন না করে পারলুম না। তাকে জিজ্ঞেস করলুম,

: মিঃ সমাদ্দার, আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন। সমীর সেনকে এই সংসার থেকে চিরদিনের জন্যেই সরিয়ে দেবার সত্যিই কী কোন প্রয়োজন আছে? সত্যিই কী সমীর সেন জীবিত থাকলে আমাদের কোন বিপদ ঘটতে পারে?

আমার প্রশ্ন শুনে সমাদ্দার ম্লান হাসলেন। বললেন: বিপদ শুধু আমাদের নয়। সমস্ত দলের পক্ষেই বিপদ ঘনিয়ে আসবে। কারণ, সমীর সেন আমাদের সব কার্যকলাপ জানে। মাইক্রোফিল্মের কথা পুলিশ জানতে পারবেই। তার পরবর্তী অবস্থাটা ভেবে দেখুন। এনকোয়ারী, খানাতল্লাশী। পুলিশের এই তদন্ত আমাদের বন্ধ করতেই হবে। সেই জন্যেই সমীর সেনকে আজ পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

আমি চুপ করে থাকলুম। কেন জানিনে সমাদ্দারের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ

একমত হতে পারলুম না। আমার মনে হল সমীর সেনের দিক থেকে বিপদ আসবার কোনই সম্ভাবনা নেই। সমীর সেনকে মিঃ সমাদ্দার অনর্থক ভয় পাচ্ছেন।

তবু আর একটি নতুন নারীর সঙ্গ লাভের প্রলোভন আমি কিছুতেই এড়াতে পারলুম না। তাই সমাদ্দারকে বললুম যে পরের দিন আমি মিসেস সেনের সঙ্গে দেখা করতে যাবো।

* * *

পরের দিন বিকেল পাঁচটায় সময় আমি মিসেস সেনের বাড়ীতে গেলুম। বাড়ীর ঠিকানা আমাকে সমাদ্দারই দিয়েছিলেন। অতএব বাড়া খুঁজে নিতে আমার একটুও কষ্ট হয় নি।

মিসেস সেন বিড়লা মন্দিরের সামনে ডালহাউসী স্কোয়ারে থাকেন। বাড়ীর নম্বর মিলিয়ে আমি গিয়ে দরজায় নক করলুম।

মিসেস সেন দরজা খুলে দিলেন। আমাকে দেখে বেশ কিছুটা বিস্মিতও হলেন। আমি যে ওর বাড়ীতে গিয়ে হানা দিতে পারি এ কল্পনা উনি কখনও করেন নি। ওর মুখে সেই বিস্ময়ের চিহ্ন স্পষ্ট ফুটে উঠলো। মিসেস সেন কিছু বলবার আগেই আমি একটি ছোট নমস্কার দিয়ে বললুম: অনেক দিন আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি, তাই একবার দেখা করতে এলুম।

: কেন, মাত্র দুদিন আগেই তো ভোল্‌গা রেস্তোরাঁয় আমাদের দেখা হয়েছিলো, মিসেস সেন জবাব দিলেন। আমি তাকিয়ে দেখলুম, মিসেস সেনের মুখের গাম্ভীর্য তখনো সম্পূর্ণ দূর হয়নি।

: হ্যাঁ, শুধু দেখা নয়। সেদিন ভোল্‌গা রেস্তোরাঁয় আমাকে বিস্তর হাঙ্গামাও সামলাতে হয়েছিলো। আপনি চলে গেলেন আর সেই মুহূর্তেই এক পাল লোক এসে আমাকে ঘেরাও করে দাঁড়ালো। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ যে আমার কোন বদ মতলব ছিলো।

আমরা এতোক্ষণ দরজায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিলুম। হয়তো আমাদের আলাপ আলোচনা অন্য লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলো। তাই মিসেস সেন এবার একটু সতর্ক হলেন। মৃদু স্বরে বললেন: বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বললে দৃষ্টি কটু দেখায়। ভেতরে আসুন।

ছোট বাড়ী, মাত্র তিন খানা ঘর। একখানা বসবার ঘর। আমরা সেই ঘরে গিয়ে বসলুম।

খানিকটা সময় আমরা চুপ চাপ বসে রইলুম। আমি বেশ অস্বোয়াস্তি বোধ করে কথা বলবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু মিসেস সেন আমাকে বাধা দিলেন।

বেশ একটু কর্কশ স্বরেই বললেন : বলুন জি-বি-এম, হঠাৎ আমার বাড়ীতে এলেন কেন ?

মিসেস সেনের কর্কশ কণ্ঠস্বরে আমি বেশ একটু হকচকিয়ে গেলুম। বুঝতে পারলুম, আমাকে দেখে উনি বেশ একটু বিরক্তি অনুভব করছেন। আর ওর কথায় সেই বিরক্তির ভাবটা বেশ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে।

: বললুম তো, আপনার সঙ্গে কয়েকদিন দেখা হয় নি। তাই ভাবলুম, যাই আপনাকে একবার দেখেই আসি।

: দেখা করা কী একান্তই প্রয়োজন ছিলো ? আমাদের এই দেখা সাক্ষাতে হয়তো কোন বিপদ ঘটতে পারে।

বুঝতে পারলুম মিসেস সেনও কোন বিপদের আশঙ্কা করছেন। কিন্তু কী সেই বিপদ ?

আমি কোন জবাব দিলুম না। দেবার প্রয়োজনও হলো না। মিসেস সেনই আবার বললেন : আজ কয়েকদিন হলো সমীরের শরীরটা খুব ভালো যাচ্ছে না। আজ সে অফিসেও যায় নি।

আমি এবার অভিনয় শুরু করলুম। বললুম : মিসেস সেন, আপনিই আন্দাজ করুন কেন আজ আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি ?

: কেন ? আমার প্রশ্ন শুনে বেশ একটু বিস্মিত হয়েই মিসেস সেন এই সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করলেন।

: কারণ, আজকাল সময় খুব ভালো যাচ্ছে না বলে আপনাকে সতর্ক করে দিতে এসেছি। শুধু আপনাকে নয় সমীর সেনকেও একথা জানাতে এসেছি যে এবার থেকে আরও বেশী হুঁসিয়ার হয়ে আমাদের কাজ করা উচিত হবে।

: আপনার হেয়ালী কথা বুঝতে পারলুম না। আর একটু স্পষ্ট করে আপনার বক্তব্য বলুন।

: ব্যাপার অতি সামান্য হলেও বেশ গুরুতর। সম্প্রতি মিঃ সেন আমাদের জন্যে যে তিনটি মূল্যবান ও গোপনীয় কাগজ সংগ্রহ করেছিলেন সেই তিনটি ডকুমেন্টকে আমরা মাইক্রোফিল্ম করে ক্যুরিয়ার মারফৎ হংকং-এর বন্ধুদের কাছে পাঠাবার চেষ্টা করেছিলুম। কিন্তু যে লোকটি মাইক্রোফিল্ম নিয়ে পালাম বিমান বন্দরে যাচ্ছিলো, সে হঠাৎ একটা পথ-দুর্ঘটনায় নিহত হলো। সংক্ষেপে তার পরবর্তী খবর হলো এই যে, তার সঙ্গে যে তিনটি মাইক্রোফিল্ম ছিলো এখন আর তার কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। এই মাইক্রোফিল্ম যদি পুলিশের হাতে পড়ে থাকে তাহলে মিঃ সেনের বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

আমার কথা শুনে মিসেস সেন কোন জবাব দিলেন না। চুপ করে রইলেন।

আমি বুঝতে পারলুম উনি ভাবতে শুরু করেছেন। কিসের ভাবনা? সমীর সেনের জন্যে না গোপনীয় ডকুমেণ্ট খোয়া গেছে বলে? হাজার হোক মিসেস সেন আমাদের দলের লোক, পার্টির হয়ে কাজ করছেন। একটু বাদে উনি বললেন: আপনার সংবাদ যে সত্যিই গুরুতর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ওকে এই খবর দেবার মতো সাহস আমার নেই। আজ কদিন হলো অফিসে বিস্তর হাঙ্গামা চলছে। বড়ো বড়ো কর্তারা সমস্ত সিক্রেট, টপ সিক্রেট ফাইল চেক করছেন। এই সময়ে মাইক্রোফিল্ম খোয়া যাবার কাহিনী শুনলে সমীর আরো ভয় পাবে। না, জি-বি-এম, আপনার খবর অতি অপ্রিয় সত্যি। অতএব এই খবর বর্তমানে চেপে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

জানিনে আমার মনে কেন যেন শয়তানী বুদ্ধি চাপলো। আমি ইচ্ছে করেই বললুম: কিন্তু আমার মনে হয় সমীর সেনকে এই খবর জানানো একান্ত দরকার। কারণ, ওর কাছ থেকেও এই খবর গোপন করলে হয়তো ভবিষ্যতে বিপদ আরো বাড়তে পারে।

: ওকে এই খবর দেয়া মানে ওর মৃত্যুকে আরও ঘনিয়ে আনা, বললেন মিসেস সেন।

: খবরটা সময় মত না দিলে পরে হয়তো পুলিশের হাতেই ওর মৃত্যু ঘটবে। আমাদের কাছ থেকে খবর পেলে উনি হয়তো একটু বিচলিত হতে পারেন ঠিকই, কিন্তু ওর মৃত্যু হবার কোন সম্ভাবনা নেই। একটু অসতর্ক হলেই পুলিশ ওকে গ্রেপ্তার করবে। আর গ্রেপ্তারের পরিণাম যে কী, তাও জানেন? স্পাই-এর সাজা হলো মৃত্যুদণ্ড। বলুন মিসেস সেন, আপনি ওকে এই খবর দেবার ঝুঁকি নেবেন না, ওকে পুলিশের হাতে তুলে দেবেন। আগে আমাদের কাছ থেকে এই খবর পেলে হয়তো উনি আরও সতর্ক হতে পারবেন। আর এই ক্ষেত্রে আরো সতর্ক হওয়া একান্তই আবশ্যক।

মিসেস সেন এক মনে আমার কথা শুনলেন। কোন জবাব দিলেন না। আমি এবার একটু বিদ্রূপ মিশ্রিত কণ্ঠে বললুম: মিসেস সেন, আমি দিব্য চোখেই দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের সকলেরই বিপদ ঘনিয়ে আসছে। যেদিন থেকে আমি ভারতবর্ষের বুকে পা দিয়েছি সেদিন থেকেই আমার মনে বিপদের শঙ্কা জেগেছে। শেষ অবধি আমাদের সকলেরই হয়তো শেষ মোলাকাৎ হবে পুলিশের কারাগারে।

: আপনি কী ঠিক জানেন যে পুলিশ সেই মাইক্রোফিল্ম তিনটি হাতে পেয়েছে? মিসেস সেন জিজ্ঞস করলেন।

: এখনো পায়নি, তবে শিগগিরই পাবে আশঙ্কা করছি। একেই বলে

ভাগ্য মিসেস সেন, কাজের ব্যাঘাত না ঘটলে এতোক্ষণে হংকং-এ আমাদের বন্ধুরা সেই মাইক্রোফিল্ম ডেভেলপ করে আমাদের রিপোর্ট পড়তো, আমি জবাব দিলুম।

: ভাগ্য নিয়ে অনুতাপ করে লাভ নেই, মিসেস সেন আবার বললেন,—যা হবার তা হবেই।

মিসেস সেনের জবাব যেন আমার কাছে কেমন বেসুরো লাগলো। বুঝতে পারলুম উনি ভাগ্য বিশ্বাস করেন না। উনি বাস্তববাদী। অতএব আমি খানিকটা সময় চুপ করে বইলুম। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে মিসেস সেন আবার বললেন : বলুন জি-বি এম, আমার একটা কথার জবাব দিন ?

: বলুন কী আপনার প্রশ্ন ?

: আপনাকে আজ আমার বাড়ীতে কে পাঠিয়েছে ? সমাদ্দার, না আপনি নিজেই ইচ্ছে করে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন ? আর যদি এলেনই, তাহলে এই দুঃসংবাদ নিয়ে এলেন কেন ?

আমি সত্যি কথা গোপন করে গেলুম। কেন ? কী উদ্দেশ্যে আমি আজ মিসেস সেনের কাছে এসেছি সে কথা খুলে বললুম না। কারণ, আমার মনে হলো, মিসেস সেন আজ সমীর সেনকে বাঁচাবার চেষ্টা করছেন।

মিসেস সেনের প্রশ্নে আমি একটু নিরাশও হলুম। আমি এসেছিলুম ওর সঙ্গে নিভৃতে বসে খানিকটা প্রেমালাপ করতে। কিন্তু ওর কথায় এখন বুঝতে পারলুম যে আজ আর প্রেমের আসর জমাবার কোনও সম্ভাবনা নেই। অতএব আমার মনটা বিরক্তিতে ভরে গেলো :

: এই খবরটা খুবই জরুরী মনে করে আমি আজ নিজেই মিঃ সেনের কাছে এলুম। সমাদ্দার আমাকে এখানে আসবার কোন নির্দেশ দেন নি। আমি মিথ্যে কথা বললুম।

: একটু আগেই তো বললেন যে আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন ?

: মিথ্যে কথা বলিনি। আপনার কাছে আসবারও একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিলো।

আমি এবার আরও একটু গলা পরিষ্কার করে আবার বললুম : মিসেস সেন, আজকের এই ব্যাপারটা সত্যিই গুরুতর। সময় মতো আমরা যদি সতর্ক না হই তাহলে অবশ্যই বিপদে পড়তে হবে। বিপদ একা মিঃ সেনের নয়, আমাদের সকলেরই। আপনি, আমি, সমীর সেন বা সমাদ্দার এবং দলের বন্ধুরা কেউই বাদ যাবো না। সকলের বিরুদ্ধেই চার্জ দেয়া হবে।

: বিপদকে আমি ভয় করিনে জি-বি-এম। প্রতিদিনই বিপদের মুখোমুখি

হয়ে চলতে হয়। সমস্ত বিপদ এখন আমার গা সওয়া হয়ে গেছে।

: স্পষ্ট করেই বলুন, আপনি সতর্ক হবেন কি না? আমি বেশ জোর দিয়েই প্রশ্নটা করলুম।

মিসেস সেন আমাকে ইশারা করে বললেন: আপনি আস্তে কথা বলুন। সমীর এখন ঘুমুচ্ছে।

এবার আমার বিস্মিত হবার পালা। কারণ সমাদ্দার আমাকে বলেছিলেন যে এই সময়ে সমীর সেন সচরাচর অফিসেই থাকেন। আমি ফাঁকা বাড়ী পাবো। অতএব আমার প্রেম করতে কোনই অসুবিধে হবে না। কিন্তু আজ এ সময়ে সমীর সেন যে বাড়ীতে বসে ঘুমুবেন এ আমি কখনই কল্পনা করিনি।

হঠাৎ আমার মনে হলো যে সমাদ্দার আমার সঙ্গেও এক বিরাট কারসাজী করেছেন। জানিনে কার জন্যে সমাদ্দার এই ফাঁদ পেতেছেন। কাল সমাদ্দার রতনের জন্যে ফাঁদ পেতেছিলেন। কিন্তু সময় মতো রতন সমাদ্দারের চালাকী বুঝতে পেরে বিপদ থেকে বেরিয়ে আসে। আজ উনি হয়তো আমাকেও কোন বিপদে ফেলার চেষ্টা করছেন। আমাকে না সমীর সেনকে? এইটেই এখন আমার জানবার প্রশ্ন। সেই মুহূর্তে আমি কিন্তু সমাদ্দারের চালাকী বুঝতে পারলুম না। তবুও নিজের মনের কথা মিসেস সেনের সামনে ভাষায় প্রকাশ করলুম না। শুধু বললুম: আমি ভেবেছিলুম সমীর সেন অফিসে গেছেন, আর···

আমার কথা শেষ হবার আগেই মিসেস সেন বললেন: আপনি ভেবেছিলেন আমি একা বাড়ীতে বসে আছি। এই মারাত্মক ভুল খবর আপনি কার কাছ থেকে সংগ্রহ করলেন?

আমি চুপ করে রইলুম। কোন জবাব দেবার চেষ্টা করলুম না। মিসেস সেনের কথায় প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ ছিলো। সেই বিদ্রূপ আমাকে হজম করতে হলো।

মিসেস সেন বললেন আবার: আমি ভাবছি আর কতো দিন আমাদের চোরের মতো লুকিয়ে থাকতে হবে। জি-বি-এম, আজকাল বাইরে বেরুবারও উপায় নেই। কারও সঙ্গে কথা বলতে গেলেই ভয় হয়। সমাদ্দারকে বলুন যে আমরা আর খাঁচায় বসে থাকতে পারছিনে।

আমি ঠাট্টা করলুম। বললুম: আপনারা দুজনেই জেনে শুনে এই কাজের ভার নিয়েছেন। অতএব আপনাদের মুখে কোন প্রতিবাদ বা অনুযোগ ভালো শোনায় না।

হঠাৎ আমাদের আলাপ আলোচনায় বাধা পড়লো। আমি তাকিয়ে দেখলুম, দরজার প্রান্তে সমীর সেন এসে দাঁড়িয়েছেন। তার পাণ্ডুর মুখ ও চোখ দুটো বসে গেছে। দেখলেই বুঝতে কষ্ট হয় না যে তার জীবনের ওপর দিয়ে একটা

বিরাট ঝড় হয়ে গেছে।

: আপনি এখানে? সমীর সেনের প্রশ্নে শুধু বিস্ময় নয়, খানিকটা আতঙ্কও মিশ্রিত ছিলো।—জি-বি-এম, আপনি কী করে আমার বাড়ীতে এলেন? আর কেনইবা এলেন?

আমি উঠে দাঁড়ালুম। ওর প্রশ্নের মোকাবিলা কোন জবাব দিলুম না। জিজ্ঞেস করলুম: কেমন আছেন এখন? মিসেস সেনের মুখে শুনলুম এই মাত্র যে আজকাল আপনার শরীর খুব ভালো যাচ্ছে না।

আমার কথায় কোন কান দিলেন না সমীর সেন। বেশ একটু ঝাঁঝালো গলায় আবার বললেন: আমার বাড়ীতে আপনাকে কে পাঠিয়েছে জি-বি-এম? সমাদ্দারকে তো আমি বেশ স্পষ্টই বলে দিয়েছি যে আমার বাড়ীতে কেউ কোনদিন আসবে না। আমি কোন প্রকারেই পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইনে। তবু আমার নিষেধ অনুরোধ অগ্রাহ্য করে কেন আমার বাড়ীতে এলেন?

একটা অস্বস্তিকর অবস্থায় এবার আমি মিসেস সেনের মুখের দিকে তাকালুম। মিসেস সেনও তার মুখটা নীচু করলেন। বুঝতে পারলুম, উনি আর অতিরিক্ত আলাপ আলোচনাকে সেখানেই বন্ধ করতে চান। অর্থাৎ সমীর সেনকে মাইক্রোফিল্ম চুরি যাবার কথাটা জানাতে চান না।

সমীর সেন আমার কাছ থেকে জবাবের প্রত্যাশা করছেন। অতএব চুপ করে থাকা আমার পক্ষে মূর্খামি হবে। তবুও আমি চট করেই সমীর সেনের মনে আঘাত দিতে চাইলুম না। ধীরে ধীরে বললুম: আজ একটা বিশেষ কাজেই আপনার কাছে এসেছি। নইলে আপনার বাড়ীতে এসে আপনাকে বিরক্ত করার কোন ইচ্ছে ছিলো না।

আমার কথায় বেশ দৃঢ়তা ছিলো। তাই সমীর সেন আবার আমাকে প্রশ্ন করলেন: আপনার আগমনের কারণ শুনতে পারি কী?

: তার আগে কয়েকটি প্রশ্নের জবাব চাই, আমি বললুম।

: যদি আপনার প্রশ্ন যুক্তিসঙ্গত মনে করি নিশ্চয় জবাব দেবো।

: আমার প্রশ্নের জবাব দেয়া একান্ত আবশ্যক। কারণ আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা এবং আপনার ভবিষ্যতও এই জবাবের উপর নির্ভর করছে।

: প্রশ্ন করুন?

: বর্ডার এরিয়া কমিটির রিপোর্টের ফাইলের ক্লাসিফিকেশন কী?

আমার প্রশ্ন শুনে মিসেস সেন ও সমীর সেন দুজনেই হকচকিয়ে গেলেন। মুখে যেন উৎকণ্ঠা ফুটে উঠলো। কেন আমি এই প্রশ্ন করছি? কী

তাদের মানসিক উত্তেজনা আমি স্পষ্টই বুঝতে পারলুম।

: ক্লাসিফিকেশন ? জি-বি-এম, আপনার প্রশ্ন আমি ঠিক বুঝতে পারছিনে ? সমীর সেন বললেন।

মিসেস সেন বললেন : জি-বি-এম, আপনাকে আগেই বলেছি ওর শরীরটা ভালো নেই। অনর্থক এই ধরনের বাজে প্রশ্ন করে ওর শরীর খারাপ করা কী যুক্তিসঙ্গত কাজ হবে ?

আমি ওদের দুজনের কথারই কোন জবাব দিলুম না। কারণ, শয়তান তখন আমার কাঁধে চেপে বসেছিলো। সেদিন আমি যে উদ্দেশ্য নিয়ে মিসেস সেনের বাড়ীতে এসেছিলুম, আমার সেই উদ্দেশ্য তখনো হাসিল হয়নি।

: এই প্রশ্ন করার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে, বললুম আমি,—আপনার জবাবের ওপর আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ভর করছে মিঃ সেন। অতএব ছেলেমানুষী করবেন না। বর্ডার এরিয়া কমিটির রিপোর্টের ক্লাসিফিকেশন কী তাই আমাকে খুলে বলুন।

খানিকটা সময় চুপ করে রইলেন সমীর সেন, তারপর মৃদু কণ্ঠে বললেন : টপ সিক্রেট।

: অর্থাৎ এই ফাইলের মুভমেণ্ট সীমাবদ্ধ ছিলো অল্প কয়েকজনের ভেতর, এই তো ?

: হ্যাঁ, রেস্ট্রিকটেড মুভমেণ্ট। কারণ এটা হলো এন-জি-ও সেকশনের ফাইল।

: এন-জি-ও ? বিস্ময় মিশ্রিত কণ্ঠে আমি প্রশ্ন করি। সমীর সেন বুঝতে পারলেন যে আমি ভারত সরকারের অফিসিয়াল কোডে অভ্যস্ত নই। অতএব জবাব দিলেন,

: এন-জি-ও'র পুরো নাম হলো নট টু গো টু অফিস।

: এই ধরনের ফাইল কারা দেখতে পারে ?

: মিনিস্টার, সেক্রেটারী, জয়েন্ট সেক্রেটারী-ইন-চার্জ এবং সেকশন অফিসার ইন-চার্জ অব এন-জি-ও।

: সার্কুলেশন লিস্টে আপনার নাম ছিলো ?

: হ্যাঁ, কারণ আমিই হলুম সেকশন অফিসার অব এন-জি-ও।

: আপনিই সমস্ত ফাইল মাইক্রোফিল্ম করেছিলেন ?

আমার প্রশ্ন শুনে সমীর সেনের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। আমি বুঝতে পারলুম ওর মনের উত্তেজনা বেড়েছে। কিন্তু সেই উত্তেজনা ক্ষণিকের। নিজের মানসিক উত্তেজনা দমিয়ে নিয়ে সমীর সেন আবার উত্তর দিলেন : হ্যাঁ।

: সমস্ত ফাইল যায় সার্কুলেশন লিস্ট অবধি ?

আবার সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন সমীর সেন : হ্যাঁ, একটা কথা আপনাকে দুবার বললুম জি-বি-এম।

: এক অফিসারের কাছ থেকে অন্য অফিসারের কাছে ফাইল কে নিয়ে যেতো মিঃ সেন ?

: মিনিস্টারের পি. এ, সেক্রেটারীর পি. এ। কিন্তু জয়েণ্ট সেক্রেটারী নিজের হাতে করে ফাইল অন্যের হাতে পৌঁছে দিতেন।

: সার্কুলেশন লিস্টে মিনিস্টার ও সেক্রেটারীর পি. এর নাম ছিলো ?

: থাকবার কোন কারণ নেই। কারণ, এই ফাইল নাড়াচাড়া করবার অধিকার তাদের ছিলো না।

: তাহলে সমস্ত দপ্তরে মাত্র চারজনের এই ফাইল দেখার ক্ষমতা ছিলো, এই তো ?

: হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন।

: এবার বলুন, আগ্রার ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের বিমান বন্দরের প্ল্যান যে ফাইলে ছিলো তার ক্লাসিফিকেশন কী ?

: সিক্রেট।

: এন-জি-ও-র ফাইল ?

: না, সেকশনের ফাইল। তবে সর্বদাই লিঙ্ক ফাইল হিসেবে এই ফাইল এন-জি-ও সেকশনে আসতো।

: লিঙ্ক ফাইল মুভমেণ্ট কী ?

: এই ফাইল সবার কাছেই যেতে পারে।

: সার্কুলেশনে কার নাম ছিলো ?

: সেক্রেটারী, জয়েণ্ট সেক্রেটারী, আণ্ডার সেক্রেটারী আর সেকশন অফিসার।

: চীফ্ অব দি এয়ার স্টাফের নাম সার্কুলেশন লিস্টে ছিলো কী ?

: না, তবে উনি ইচ্ছে করলেই এই ফাইল দেখতে পারতেন।

: এই ফাইলের সমস্তটাই আপনি মাইক্রোফিল্ম করেছিলেন ?

: হ্যাঁ।

: কী ক্যামেরা ব্যবহার করেছিলেন ?

: রোলিফ্লেক্স টু পয়েণ্ট ফাইভ টেসার লেন্স।

: মিনলটা ব্যবহার করেন নি কেন ?

: কারণ আমার ঘরে বেশী পাওয়ারের বালব ছিলো না। অন্ধকারের ভেতরে মিনলটা ক্যামেরা ব্যবহার করা যায় না।

সমাদ্দার আমাকে একটি জার্মান রোলিফ্লেক্স ক্যামেরা দিয়েছিলেন।

: আপনার ক্যামেরা কী কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি, সিকিউরিটি গার্ড কিংবা আপনার সহকর্মীদের?

: না, আমি ক্যামেরা আমার ওভারকোটের পকেটে পুরে নিয়ে গিয়ে ছিলুম। শীতকাল ছিলো। অতএব কেউ আমার ক্যামেরা দেখতে পায় নি।

: ফটো করবার সময় ঘরে অন্য কেউ ছিলো?

: না। কারণ, তার পরের দিনটা ছিলো রিপাবলিক ডে। সবাই রিপাবলিক ডে-র কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলো।

: দপ্তরে লোক ছিলো অর্থচ আপনি দপ্তরে বসেই কাজ সারলেন। আশ্চর্য! কেউ আপনাকে এ নিয়ে কোন প্রশ্ন করেনি?

: না। কারণ, এন-জি-ও সেকশনের লোকেরা প্রায়ই ছুটির দিনেও দপ্তরে বসে কাজ করেন। সেদিন ছিলো পঁচিশে জানুয়ারী, রিপাবলিক ডে-র আগের দিন।......

* * * *

...পঁচিশে জানুয়ারী। দপ্তরে বেশ কাজ ছিলো সেদিন। আমি ও জয়েন্ট সেক্রেটারী অফিসে বসে কাজ করছিলুম। ডি-এম-আই অর্থাৎ ডাইরেক্টর অব মিলিটারী ইনটেলিজেন্স অনেক প্রশ্ন করে একটি বিরাট নোট পাঠিয়ে ছিলেন। আমরা দুজনে বসে সেই নোটের জবাব লিখছিলুম।

কাজ করতে করতে জয়েন্ট সেক্রেটারী আমার হাতে, দুটি ফাইল দিলেন। তারই একটি ফাইলে ছিলো বর্ডার এরিয়া কমিটির রিপোর্ট। অপরটিতে ছিলো মিলিটারী এয়ার পোর্ট এট আগ্রা।

বর্ডার এরিয়া কমিটি রিপোর্ট আমি আগেই ফিল্ম করেছিলুম। কিন্তু আগ্রার মিলিটারী এয়ার পোর্টের ফাইল হাতে পেয়ে আমি ঠিক করলুম, এই ফাইলটাকেও মাইক্রোফিল্ম করতে হবে। মাইক্রোফিল্ম করার কারণ ছিলো। কিছুদিন আগে আমি শুনেছিলুম যে সরকার রুশ দেশ থেকে কতকগুলো নতুন ফাইটার প্লেন কিনছেন। মিগ প্লেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু মিগ টুয়েন্টি ওয়ান, না মিগ টুয়েন্টি থ্রী সেইটে জানবার ইচ্ছে হলো।

ফাইলে দেখলুম রাণওয়ের নক্সা রয়েছে। রানওয়ে নতুন করে বানানো হচ্ছে। রাণওয়ের লেংথ জানতে পারলে যে প্লেনের টেক অফ স্পীড জানা যায় তা জানতুম। টেক অফ স্পীড থেকে ইঞ্জিন কতোটা শক্তিশালী তা জানতে পারা যাবে। ইঞ্জিন থেকে জানা যাবে প্লেন কতোক্ষণ আকাশে উড়তে পারবে সেই খবর। চল্লিশ মিনিট না পয়তাল্লিশ মিনিট। প্রতি সেকেণ্ডে কতোটা

উঁচুতে উঠতে পারবে তাও জানা যাবে। যে কোন এয়ার এক্সপার্টকে রাণওয়ের নকশা দিন, সে আপনাকে এই সব খবর বলে দেবে।

জয়েন্ট সেক্রেটারী একটু বাদে বাড়ী চলে গেলেন। আমি নিজের ঘরে ফিরে এলুম।

আমার ঘর ছিলো দপ্তরের এক প্রান্তে। সচরাচর সেদিকে কারও আসবার অধিকার বা সম্ভাবনা ছিলো না। তাই আমি আপন মনে কাজ করতে লাগলুম। পকেট থেকে ক্যামেরা বের করলুম। মোট চারটে নকশা ছিলো। মাত্র দুটো ফিল্ম করেছি এমন সময় আমার ঘরের দরজায় কে জানি নক করলো। আমি চমকে উঠলুম। এই অসময়ে আমার ঘরে কে আসতে পারে তাই ভাবলুম। তাড়াতাড়ি ক্যামেরাটা টেবিলের ড্রয়ারে ভরলুম। টেবিলের কাগজ পত্র গুছিয়ে নিলুম। কেউ যেন সন্দেহ না করে যে আমি সরকারী কাগজ পত্র চুরি করছি। একটু বাদে ঘরের ভেতর 'ফরাস' এলো। বললো, ঘর পরিষ্কার করতে চায়।

এই মহা দুশ্চিন্তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলুম। মনে হলো যেন মস্ত বড়ো একটা বিপদের হাত থেকে রেহাই পেয়েছি। সেদিন আর বাকী নকশা-গুলোকে ফটো করলুম না। ফাইল গুছিয়ে নিয়ে আলমারীতে তালাচাবি দিয়ে বন্ধ করে রাখলুম।

তার পরের দিনে ফাইল সেকশনে পাঠিয়ে দিলুম। বাকী নকশা দুটোকে আর মাইক্রোফিল্ম করলুম না।

*　　　*　　　*　　　*

একটানা অনেকক্ষণ কথা বলে থামলেন সমীর সেন। দেখলুম, তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। আমার মনে হলো উত্তেজনা ও আতঙ্কে সমীর সেন বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছেন।

সমীর সেন এবার জিজ্ঞেস করলেন: আপনার সব প্রশ্নের তো জবাব দিলুম। এবার বলুন, এই সব প্রশ্ন আপনি কেন করলেন? আর কেনই বা হঠাৎ আপনি আমার বাড়ীতে এলেন, তাই বলুন।

সমীর সেনের প্রশ্নের জবাব দেবার আগে আমি একবার মিসেস সেনের পানে তাকালুম। তার মুখ দেখে মনে হলো যে তিনি মনে মনে বেশ কিছুটা অসন্তুষ্ট হয়েছেন। সেদিন আমি ছিলুম নিরুপায়। সমীর সেনের মনের সন্দেহ ভাঙতে হবে। আমি কেন হঠাৎ তার বাড়ীতে এসেছি তার সন্তোষ জনক কৈফিয়ৎ দিতে হবে। তাই বেশ সহজ কণ্ঠেই বললুম: মিঃ সেন, আজ আমি আপনাকে একটা দুঃসংবাদ দিতে এসেছি। এই খারাপ খবর এখনই আপনাকে দেবার

আমার কোন ইচ্ছে ছিলো না। কিন্তু ব্যাপার এর মধ্যেই এতো গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে যে আপনাকে সতর্ক করে দেয়া আমার কর্তব্য। তাই আমি নিজেই আজ আপনাকে সেই খবর জানতে এসেছি। আপনি যে সব গোপনীয় মাইক্রোফিল্ম করেছিলেন সেই সব মাইক্রোফিল্মের তিনটি প্যাকেট খোয়া গেছে। যে লোকের মারফৎ এই সব মাইক্রোফিল্ম ক্যুরিয়ারের কাছে পাঠানো হয়েছিল, বিমান বন্দরে যাবার পথে তাকে খুন করা হয়েছে। মাইক্রোফিল্মগুলো এখনও পুলিশ পায়নি। তবে শিগগিরই নিশ্চয় পাবে। তাই এখন আপনার আমার সবারই বিপদ ঘনিয়ে আসছে। আপনি নিজেই আমাকে বলেছেন যে সার্কুলেশন লিস্টেরও মাইক্রোফিল্ম করা হয়েছিলো। একবার কল্পনা করুন সেই মাইক্রোফিল্ম পুলিশের হাতে পড়লে তারা কী করবে? আপনাকে নিশ্চয়ই জেলে যেতে হবে। হ্যাঁ, মিঃ সেন, আজকের এই খবর দুঃসংবাদই বটে।

আমি তাকিয়ে দেখলুম সমীর সেনের মুখখানা যেন আরও অন্ধকার এবং গম্ভীর হয়েছে। ভয় পেয়েছেন সমীর সেন। কিন্তু আমি তাঁর মানসিক উত্তেজনার ক্রম পরিবর্তন লক্ষ্য করার জন্য আর সেখানে দাঁড়ালুম না। সেই মুহূর্তেই বিদায় নিয়ে তাঁর বাড়ী থেকে বের হয়ে এলুম।

*　　　*　　　*

তার পর দু ঘণ্টা পর্যন্ত আমি কনটসার্কাসে চক্কর কাটলুম। সমাদ্দারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের তখনও কিছুটা বিলম্ব ছিলো। সেই সময়টুকু কনটসার্কাসের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত কয়েকবার পায়চারি করলুম।

হাঁটতে হাঁটতে অনেক অবাস্তব কথা ভেবে মনটা খারাপ হয়ে গেলো। হাতের ঘড়িটার পানে তাকালুম একবার। আটটা বাজে, আমাকে এখনই কোয়ালিটি রেস্তোরাঁয় যেতে হবে। সেখানে সমাদ্দার আমার জন্যে বসে আছেন।

আজ সমাদ্দারের কথা ভাবতেই মনটা বিরক্তিতে ভরে উঠলো। সমাদ্দারকে দেখতে একটুও ইচ্ছে করলো না। ঠিক করলুম আর কখনও সমাদ্দারের বাক্‌চাতুরীতে ভুলবো না। কিন্তু আমার দুর্বল মন। যেই কোয়ালিটি রেস্তোরাঁয় সমাদ্দারের কাছে এসে দাঁড়ালুম অমনি মনের সব দৃঢ়তা, সব সংকল্প ভেসে গেলো। নিজেকে শিশুর মতো অসহায় বলে মনে করলুম। আমার মনে হলো আমি যেন সমাদ্দারের হুকুমের চাকর।

: গুড ইভিনিং জি-বি-এম, জীবন কেমন কাটছে বলুন? আপনার কথা শোনবার জন্যেই আমি এতোক্ষণ বসেছিলুম, আমাকে দেখেই বলে উঠলেন সমাদ্দার। তার এই মন্তব্যে যেন বেশ কিছুটা বিদ্রূপ মেশানো ছিলো।

ভাবলুম, এই ধরনের প্রশ্ন হঠাৎ সমাদ্দার কেন করলেন! আমার জীবন

কেমন কাটছে তা জানবার জন্যে কেন হঠাৎ তিনি এতো ব্যাকুল হলেন; এইতো কাল বিকেলেও ওর সঙ্গে বসে গুলতানি করেছি। হঠাৎ এই চব্বিশ ঘণ্টার ভিতরে আমার জীবনে এমন কী পরিবর্তন হলো যার জন্যে উনি এতো কৌতূহল প্রকাশ করছেন।

: বসুন জি বি-এম। প্লিজ সিট ডাউন। বলুন আজ কী করে দিন কাটালেন।

: মিসেস সেনের সঙ্গে আজ দেখা করতে গিয়েছিলুম, আমি সমাদ্দারের প্রশ্নের জবাব দিলুম।

: জানি, সহজ কণ্ঠে বললেন সমাদ্দার।

সমাদ্দারের কথার ধরনে আমার বেশ কিছুটা রাগ হলো। উনি যদি জানেনই যে আমি কী করেছি, কোথায় গিয়েছি তাহলে অনর্থক আমার জীবন কেমন কাটছে তা জানবার এতো আগ্রহ কেন?

: আর কী জানেন? আমি প্রশ্ন করলুম। আমার প্রশ্নে বেশ ঝাঁক ছিলো।

কিন্তু আমার প্রশ্ন শুনে সমাদ্দার একটুও রাগ প্রকাশ করলেন না। বরং হাসতে লাগলেন। তার মুখে হাসি দেখে আমার বড্ডো রাগ হলো। তাই এবার একটু রাগ প্রকাশ করেই বললুম: সমাদ্দার সাহেব, আমি এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারছিনে আপনি কী চান? আমাকে খুলে বলুন, আমাকে কী করতে হবে? হেঁয়ালী আমার একদম ভালো লাগে না। ভারতবর্ষে আসবার আগে আমাকে বলা হয়েছিলো যে আমাকে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হবে। আপনাকে আজ স্পষ্ট করেই বলছি যে, এসব কাজ করে আমি একটুও তৃপ্তি পাচ্ছিনে।

সমাদ্দার মৃদু হাসলেন, তারপর বললেন: রাগ করবেন না জি-বি-এম, আমরা আপনার কাজে সন্তুষ্ট। আপনি তো বেশ গুরুত্বপূর্ণ কাজই করছেন। আপনার সাহায্য আমাদের বিশেষ দরকার। বিভিন্ন কাজের জন্যেই। ভেবে দেখুন আজকের কথা। একাজে আপনাকে ছাড়া আমাদের একদম চলতো না। আজ আপনি আমাদের বিশেষ উপকার করলেন।

আমি প্রতিবাদ করলুম। স্পষ্ট বললুম. আপনি আমার কাজে সন্তুষ্ট হতে পারেন কিন্তু আমি সে কাজ করে কোন আনন্দ পাচ্ছিনে। এবার বলুন, আজ আমি এমন কী করেছি যার জন্যে আপনি আমার কাজের তারিফ করছেন? আমি আজ শুধু একবারের জন্যে মিসেস সেনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম। এতো কোন কাজ নয়, সামান্য সামাজিক নিয়ম বজায় রাখা।

: আর সেইখানে হঠাৎ সমীর সেনের সঙ্গে আপনার দেখা হয়ে গেলো,—

বেশ একটু ব্যঙ্গ করে সমাদ্দার বললেন।

সমাদ্দারের কথা শুনে আমি একটু অবাক হলুম। আমার সঙ্গে সমীর সেনের মোলাকাতের কাহিনী উনি কী করে জানলেন! আশ্চর্য! লোকটা কী সবজান্তা! এই শহরে কোথায় কী ঘটছে সবই কী তার কানে আসে!

: আপনি ভুল বলেন নি। আজ বিকেলে আকস্মিক সমীর সেনের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেলো। কিন্তু সমাদ্দার সাহেব, বিকেল বেলায় আমি সমীর সেনকে বাড়ীতে দেখতে পাবো এ কখনও কল্পনা করিনি। আপনিই আমাকে বলেছিলেন যে বিকেল বেলা সমীর সেন দপ্তরে থাকবেন। বাড়ীতেই থাকবেন একথা জানলে আমি কিন্তু মিসেস সেনের সঙ্গে দেখা করতে যেতুম না।

: কিন্তু আজকে সমীর সেনের সঙ্গে দেখা করা কী খুবই জরুরী ছিলো না? জিজ্ঞেস করলেন সমাদ্দার।

: কী কারণে শুনতে পারি কী? আমি জানতে চাইলুম।

: কারণ অতি সহজ ও সরল। আপনি আজ সমীর সেনের সঙ্গে দেখা না করলে এই দুর্ঘটনা ঘটতো না।

: দুর্ঘটনা। আপনি কী বলছেন সমাদ্দার সাহেব? আমি যেন আকাশ থেকে পড়ি। সত্যি কথা বলতে কী আমি সমাদ্দারের কথা শুনে বিস্ময়ে ও কৌতূহলে অভিভূত হয়েছিলুম।

: হ্যাঁ, জি-বি-এম, আজকের ঘটনা সত্যিই আকস্মিক দুর্ঘটনা। অবশ্যি আমাদের স্বার্থে এই দুর্ঘটনার বিশেষ প্রয়োজন ছিলো।

: এবার হেঁয়ালী ফেলে পুরো ঘটনা খুলে বলুন সমাদ্দার সাহেব? আমি বললুম।

: জি-বি-এম, আমাদের সহকারী, সহকর্মী ও বন্ধু সমীর সেন এই ঘণ্টা-খানেক আগে হঠাৎ মারা গেছেন।

: মারা গেছেন? আমি বেশ একটু চীৎকার করেই এই দুটো কথা উচ্চারণ করলুম। আমার তীব্র কণ্ঠস্বর অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।

: ন্যাচারাল ডেথ। ডাক্তারেরা বলেছেন হার্ট ফেলিওর। হয়তো আপনাকে দেখে সমীর সেন বেশ একটু উত্তেজিত হয়েছিলেন। সমীর সেনের ছিলো দুর্বল হার্ট। উত্তেজনা ছিলো তার পক্ষে বিপদজনক। না সমীর সেনের মৃত্যু নিয়ে কেউ প্রশ্ন করবে না। পুলিশও এ নিয়ে টানা হেঁচড়া করবে না। এবার থেকে আমরা আবার নিশ্চিন্ত মনে কাজ করে যেতে পারবো।

ন্যাচারাল ডেথ। হ্যাঁ, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে সমীর সেনের অতি স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। তার মৃত্যু নিয়ে কোন হৈ-হল্লা হবে না। দুদিন বাদে

সবাই সমীর সেনের নাম ভুলে যাবে। কিন্তু আমার মনে একটা অনুতাপ থেকে যাবে যে আমিই সমীর সেনকে খুন করেছি।

হ্যাঁ খুন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সমাদ্দার বললেন, সমীর সেনকে খুন করা আবশ্যক ছিলো। হ্যাঁ, অতি নিপুন ভাবেই ওকে খুন করা হয়েছে। এর জন্যে সমাদ্দারের বুদ্ধির প্রশংসা করতে হবে।

: কী ভাবছেন জি-বি-এম ? কারও মৃত্যু নিয়ে কখনও ভাবনা করতে নেই। জীবন মৃত্যু সংসারের চিরন্তন খেলা। এ নিয়ে মন খারাপ করবেন না। এর মধ্যে ভাবনার কিছু নেই।

: আমি সমীর সেনের কথা ভাবছিনে। আমি ভাবছিলুম মিসেস সেনের কথা।

আমার মুখের কথাটা যেন লুফে নিলেন সমাদ্দার। বললেন: যাক্, তবু এতোক্ষণে মনের কথাটা প্রকাশ করেছেন। জি-বি-এম, আপনার পথের কাঁটা যে দূর হয়েছে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু একটু ধৈর্য ধরুন। কারণ এতো শিগ্‌গীরই মিসেস সেন আপনার কাছে ধরা দেবেন না। কয়েকটা দিন যেতে দিন। দেখুন অবস্থার পরিণতি।

এই বলে মিঃ সমাদ্দার চুপ করলেন কিছু সময়ের জন্যে। তারপর আবার বলতে লাগলেন: ওরা দুজনে বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী ছিলো না ঠিকই বটে, কিন্তু তবুও ওদের ভেতরে বেশ অনুরাগ ছিলো। আপনি যে মিসেস সেনের জীবনে এসে ডাক দেবেন, এ কখনই সমীর সেন কল্পনা করেন নি। তারপর একদিন সমীর সেন বুঝতে পারলেন যে আপনি মিসেস সেনকে আকৃষ্ট করেছেন। হ্যাঁ, এর পর সমীর সেন বেশ একটু বিচলিত হয়েছিলেন। তার পরিণাম যে এতোদূর গড়াবে এ কিন্তু কেউ কখনও কল্পনা করেনি। যাক্, এবার আপনাদের দুজনের প্রেম জমবার আগেই আমাদের বাকী কাজগুলো শেষ করা যাক্।

: বাকী কাজ! মিঃ সমাদ্দার আপনি জানেন আজ অবধি আমরা কোন কাজই শেষ করতে পারি নি। পর পর তিনটে মৃত্যু ঘটে গেলো। অথচ আমরা কিন্তু যে তিমিরে সেই তিমিরেই আছি, আমি বললুম।

: হ্যাঁ, আপনার কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু এই তিনটে মৃত্যু যেন একেবারেই অনিবার্য ছিলো। মৃত্যুকে কখনও রুখতে পারা যায় না। অতএব এই মৃত্যু নিয়ে হা হুতাশ করে লাভ নেই। অতীতের কথা না ভেবে এবার ভবিষ্যৎ কাজের কথাই ভাবা যাক্।

: বলুন কী কাজ ? কাজের একটা ফিরিস্তি দিন।

: আমাদের প্রথম কাজ হবে সিক্রেট ডকুমেন্টগুলোকে পুনরায় মাইক্রোফিল্ম

করা। অতএব, এইসব সিক্রেট ডকুমেন্টগুলোকে আবার সংগ্রহ করতে হবে। জি-বি এম, আজ আর সমীর সেন জীবিত নেই। অতএব এর জন্যে আমাদের আবার নতুন শিকার সংগ্রহ করতে হবে। এমনি লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে হবে যে আমাদের এই কাজে সাহায্য করতে পারে। অর্থাৎ, যার কাছ থেকে আমরা গোপন কাগজপত্র পেতে পারি। জি বি-এম, আমি একটা লোকের সন্ধান পেয়েছি। এবার শুধু সেই মাছকে খেলিয়ে খেলিয়ে ডাঙায় তুলতে হবে।

সমাদ্দারের কথা শুনে আমার হাসি পেলো। মাছকে খেলিয়ে ডাঙায় তুলতে হবে। তারপরেই হবে মাছের মৃত্যু। মানিকলাল আর সমীর সেনের মৃত্যুও এমনি করেই হয়েছে। আমার জানবার আকাঙ্ক্ষা হলো মাছ বড়ো না ছোট। রুই না চেলা পুঁটী।

: একেবারে বোয়াল মাছ। বলতে পারেন দপ্তরের সমস্ত সিক্রেট ফাইলই আমাদের ওই নতুন শিকারের কাছে আসে।

কিন্তু বড়ো মাছ ডাঙায় তুলতে হলে বেশ কিছুটা সময় নেবে জি-বি-এম।

: কিন্তু আমাদের হাতে সে সময় কোথায়? আমি বললুম।

: ঠিক বলেছেন। আমাদের হাতে একেবারেই সময় নেই। কতকগুলো জরুরী গোপনীয় খবর সংগ্রহ করার জন্যে বন্ধুরা বড়োই উতলা হয়েছেন। অতএব আমাদের শিগ্‌গিরই কাজ শেষ করতে হবে। যাক্‌, এবার আমার একটা কথার জবাব দিন। আপনি তাস খেলতে জানেন, জি-বি-এম?

: তাস! বলুন, কী ধরনের তাস খেলার কথা আপনি বলছেন? আমি জিজ্ঞেস করলুম।

: তিন পাত্তি। অর্থাৎ ফ্লাস। কড়ির খেলা।

সমাদ্দারের কথা শুনে আমি হাসলুম। জাল জুয়াচুরী, লোকের গলায় ছুরি বসানো হলো আমার পেশা। রেসে বুকির কাজ করে বিস্তর লোককে আমি ঠকিয়েছি। ডগ্‌রেসে আমার জুরীদার কেউ ছিলো না। বলুন, কার গলায় ছুরি বসাতে হবে। দেখবেন, বান্দা জি-বি-এম ছুরিতে শান দিচ্ছে। তিন পাত্তি তাস খেলা তো আমার কাছে জল ভাত।

আমি মাথা নাড়লুম। অর্থাৎ ইঙ্গিতে বললুম: আমি প্রস্তুত। একবার হুকুম দিন, এখুনই তাস খেলতে শুরু করবো।

আমার কথা শুনে সমাদ্দার হাসলেন। তারপর বললেন: জি-বি-এম, বড়ো শিকার ধরতে হলে বেশ হাঙ্গামা পোহাতে হয়। যাক্‌, একবার আমাদের এই বন্ধুর সাথে মিতালি করতে পারলে আর কোন চিন্তা ভাবনা থাকবে না।

কারণ, প্রতিদিন নিত্য নতুন খবর আমরা এর কাছ থেকেই পাবো। আর পুলিশও কখনই আমাদের নাগাল পাবে না।

তারপর কণ্ঠস্বর খানিকটা নীচু করে বললেন : শুনুন, মতি সরখেলের নাম শুনেছেন ? দিল্লীর মস্তবড়ো হোমরাচোমরা ব্যক্তি। ডিফেন্স মিনিস্ট্রির জয়েণ্ট সেক্রেটারী। ওর কাছে বিস্তর জরুরী টপ সিক্রেট ফাইল আসে। আমরা এই মতি সরখেলকে পাকড়াও করবো। জি-বি-এম, এই লোকটাকে একবার দলে টানতে পারলে পর আমাদের আর কোন চিন্তা ভাবনা থাকবে না। সমীর সেন লুকিয়ে সিক্রেট ফাইলের কাগজ পত্র বাড়ীতে আনতো। কিন্তু মতি সরখেলের বাড়ীতে অফিসের চাপরাশীরাই সিক্রেট ফাইলগুলো বহন করে এনে দেয়।

: কিন্তু এতো বড়ো শিকার পাকড়াও করা সহজ নয় ; আমি একটু সন্দেহ প্রকাশ করলুম।

: সহজ নয় ঠিকই, কিন্তু আমাদের লোকটাকে দলে টানতেই হবে। সহজ পন্থায় না যদি পারি তাহলে বাঁকা পথ ধরতে হবে। মিষ্টিমুখে যদি কাজ সারতে না পারি তাহলে ব্ল্যাকমেল করতে হবে, জবাব দিলেন সমাদ্দার।

: তাস খেলে কাউকে ব্ল্যাকমেল করা যায় না, আমি বললুম।

: ব্ল্যাকমেল করবার কায়দা কানুন জানা থাকা চাই। শুনেছি আপনি প্রফেসন্যাল ব্ল্যাকমেলার। বলুন, ব্ল্যাকমেলের একটা পন্থা বাতলান।

আমি চুপ করে রইলুম। কেন জানিনে আজ কোন দুষ্টু কাজ করতে আমার মন চাইছিলো না। হয়তো সমাদ্দার আমার মনের কথা বুঝতে পারলেন। তাই হেসে বললেন : দ্বিধা সংকোচ আর লাজ, এই তিনটে জিনিস মনের ভেতর কখনও পুষবেন না। আমাদের মতি সরখেল সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। প্রাইম মিনিস্টার ক্যাবিনেট মিনিস্টাররাও তাকে যথেষ্ট খাতির যত্ন করে। তাই মতি সরখেলের বড্ডো ভঁাট। তার গম্ভীর চাল-চলন। কিন্তু তার জীবনের একটি দুর্বলতা হলো তাস খেলা। জি-বি-এম, মতি সরখেল তাস খেলতে পেলে আর কিছুই চান না। উনি ব্রিজ খেলেন। ব্রিজখেলায় ওর জুরিদার নেই। অতএব আমাদের কাজ হলো ওকে ফ্লাস খেলায় হাতে খড়ি দেয়া। আর, তার তাস খেলার শিক্ষকের কাজ করবেন আপনি।

: আমি! একটু অবাক হয়েই বললুম।

: হ্যাঁ আপনি। শুনুন, যে করেই হোক একদিন মতি সরখেলকে তাসের আসরে টেনে নেবেন। কী করে এ খেলায় নতুন লোককে টানতে হয় সে পন্থা নিশ্চয় আপনাকে বাতলাতে হবে না। আপনি তাস বাটবেন। বাহাদুরখানা

তাস আপনার ইচ্ছে মতো বেটে দেবেন। প্রতি বারেই টপ কার্ড যাতে মতি সরখেল পায় তেমন করে বাটবেন। প্রথমদিনের আসরে মতি সরখেলকে বিস্তর টাকা জিততে দিন। টাকা পেয়ে তার লোভ বাড়বে। দ্বিতীয় দিনেও আরও কিছু টাকা পাইয়ে দিন। ব্যস, এমনি করে তিন চার দিন যেতে দিন। তাসের আসর থেকে মতি সরখেলকে বেশ কিছু টাকা বাজাতে দিন। মতি সরখেল আপনার হাতের মুঠোয় এসে গেলো। তারপর জি-বি-এম, মতি সরখেলের দুর্দিন আসবে। প্রতিদিনই হার হবে। আপনি তাকে টাকা ধার দেবেন। কার্পণ্য করবেন না। হাজার টাকা, দশ হাজার টাকা। টাকার পরিবর্তে মতি সরখেল আপনাকে দেবে আই-ও-ইউ। ব্যস, এবার সময় বুঝে জাল টানুন। আপনার মাছ ডাঙায় উঠে গেলো।

সমাদ্দার কিন্তু থামলেন না। একটানা বলে চললেন : কিন্তু জি-বি-এম, মতি সরখেল হুঁশিয়ার আদমী। সহজে ভুলবার পাত্র নয়। ফাঁদে সহজে পা দেবে না। তাই আমরা মতি সরখেলের স্ত্রীর সাহায্যও গ্রহণ করবো।

কর্তার চাইতে গিন্নী আরও একধাপ ওপরে যান। বলুন, দিল্লীর সমাজে কে না রেখা সরখেলকে চেনে? রেখা সরখেল পুরো মেম সাহেব। চেন স্মোকার। দুপুরে জিন টনিক আর রাত্রে হুইস্কি অন দি রক্স পান করেন। আর শরীরে শাড়ী এমনি করে লেপ্টানো থাকে যার জন্যে সবাই রেখা সরখেলের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। প্রয়োজন হলে উনি মিনি স্কার্ট পরতেও প্রস্তুত।

জানিনে কেন আমার মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট শব্দ বের হলো। আমি বললুম : আইডিয়াল।

সমাদ্দার একটু কড়া দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। বুঝতে পারলুম আমার এই মন্তব্যে উনি একটুও সন্তুষ্ট হন নি। তার মনের বিরক্তি যেন তার মুখেও প্রকাশ হলো।

: জি-বি-এম, রেখা সরখেল অতি ফাষ্ট লাইফ পছন্দ করেন। আজ ড্যান্স পার্টি, কাল পিকনিক, পরশু রক অন দি রোলস করে বেড়ান। স্বামী কিন্তু স্ত্রীর এই জীবনধারা একেবারেই পছন্দ করেন না। কিন্তু আজকালকার স্ত্রীরা আর কতোটুকু স্বামীর অধীনে থাকেন। ওরা ওদের ইচ্ছে মতোই জীবন যাপন করেন। রেখা সরখেল ও তাই করেন। হাজার হোক ভারতীয় স্ত্রী। সহজে তাকে বিসর্জন দেয়া যায় না। তাই অনেক সময় কর্তার মত না থাকলেও গিন্নীর কার্য-কলাপকে বরদাস্ত করতে হয়।

যাক্ জি-বি-এম, এবার শুনুন, কেন এতোকথা আপনাকে ইনিয়ে বিনিয়ে বলছি। কারণ, আপনি চান মেয়ে মানুষের সান্নিধ্য আর আমি চাই ভারত

সরকারের টপ সিক্রেট ডকুমেণ্ট।

আমি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললুম : এবার বলুন রতনের কী করবেন? রতন আপনাকে পনর দিনের সময় দিয়েছে। এই সময়ের পর সে মাইক্রোফিল্ম অন্যের কাছে বিক্রি করবে।

: রতনের চিন্তা আপনি করবেন না জি-বি-এম। রতনের সঙ্গে বোঝাপড় আমিই করবো। যাক্, আপনাকে তো বললুম রেখা সরখেলকে পাকড়া করতে হবে। তার মারফৎ তার স্বামীকে দলে টানতে হবে। প্রতিদিন স্বামী স্ত্রী দিল্লীর জিমখানা ক্লাবে বসে তাস খেলেন। চলুন কাল আমরাও জিমখান ক্লাবে গিয়ে হানা দিই। অনেক দিন ও পাড়ায় পা দিই নি। কাল বিকেলে জিমখানা ক্লাবের বারে গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করবো। ঠিক সাতটায় আপনিও সেখানে উপস্থিত হবার চেষ্টা করবেন।

সেদিনকার মতো আমাদের আসর ভাঙলো। আমি আবার হোটেলে ফিরে এলুম। সারা দিন হাড় ভাঙা খাটুনির পর আমার দেহ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো। শুয়ে পড়তেই ঘুম আসতে সময় নিলো না।

* * *

পরের দিন জিমখানা ক্লাবে এলুম।

ক্লাবের ভেতরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই মানিকলালের কথা মনে পড়লো মানিকলাল আজ জীবিত নেই। তাই আজ তার স্মৃতি আমার হৃদয়কে দগ্ধ করতে লাগলো।

মানিকলালের মৃত্যুর সঠিক কারণ কিন্তু আমি আজও বুঝে উঠতে পারলু না। সত্যিই কী মানিকলাল আমার প্রস্তাবে ভয় পেয়েছিলো। সমাদ্দা আমাকে বলেছিলেন ভয় পেয়ে মানিকলাল পুলিশের কাছে যাবার সংকল্প করেছিলো। সেদিন আমি অতি সহজে সমাদ্দারের কথাকে বিশ্বাস করেছিলুম কিন্তু সমীর সেনের মৃত্যুর পর সমাদ্দারের কথাগুলোকে যেন অতো সহজে বিশ্বাস করতে পারলুম না। আমার মন বলতে লাগলো, মানিকলালের মৃত্যু পশ্চাতে যেন কোন রহস্য লুকিয়ে আছে। কী সেই রহস্য, তা জানবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হলো।

বারের কাউণ্টারে গিয়ে বসলুম। বারম্যান হয়তো আমাকে চিনতে পারলো। বললো : হুইস্কি অন দি রকস স্যার?

: ভ্যাটস রাইট, আমি অতি সহজ গলায় জবাব দিলুম।

: স্যার আপনার নামই গোবিন্দ বিহারী মালকানি? বারম্যান আমাকে জিজ্ঞেস করলো।

বারম্যানের প্রশ্নে আমি বেশ একটু বিস্মিত হলুম। খানিকটা সময় আমি অবাক হয়ে তাকালুম। তারপর বললুম: হ্যাঁ। কিন্তু কেন এই প্রশ্ন করছো?

: বেশ খানিকক্ষণ ধরে আপনার জন্যে এক ভদ্রলোক লাউঞ্জে বসে প্রতীক্ষা করছেন, বারম্যান বললো।

: আমার জন্যে? আমি আবার জিজ্ঞেস করলুম বিস্মিত কণ্ঠে। বারম্যানের কথা যেন আমি বিশ্বাস করতে পারিনে।

: হ্যাঁ, উনি গোবিন্দ বিহারী মালকানির সঙ্গে দেখা করতে চান।

আমি ঘড়ির দিকে তাকালুম। তখনো সাতটা বাজেনি। সমাদ্দার ঠিক সাতটার সময় দেখা করবেন বলেছিলেন। আমি ইচ্ছে করেই আধ ঘণ্টা আগে জিমখানা ক্লাবে এসেছিলুম। ভেবেছিলুম অবসর সময়টুকু হুইস্কি দিয়ে গলা ভিজিয়ে নেবো। কিন্তু হঠাৎ অপ্রত্যাশিত এক ভদ্রলোকের আগমনে আমার হুইস্কি পান করবার আকাঙ্ক্ষা দূর হলো। একবার ভাবলুম, হয়তো রতনই আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। হয় তো আমার সঙ্গেই টাকা পয়সার একটা মীমাংসা করে নেবার চেষ্টা করবে। কিন্তু আমি কী করতে পারি? এ হলো সমাদ্দারের দায়িত্ব। সমাদ্দারের বিনা অনুমতিতে আমার কোন কাজ করার অধিকার নেই।

আমি বারের কাউণ্টার থেকে উঠলুম। সেখান থেকে লাউঞ্জে গেলুম।

কিন্তু লাউঞ্জে আমার পরিচিত কাউকে দেখতে পেলুম না। এদিক ওদিক বিস্তর লোক বসে গল্প করছিলো। কিন্তু তার মধ্যে আমার জানাশোনা কেউ নেই। তাহলে কে আমাকে ডাকলো! একবার ভাবলুম, বারম্যানের কাছে ফিরে যাবো। কিন্তু সেই মুহূর্তে হঠাৎ পেছন থেকে কে জানি আমার নাম ধরে ডাকলো।

: জি-বি-এম······

পরিচিত কণ্ঠস্বর। কবে কোথায় যেন এই কণ্ঠস্বর শুনেছি। কোথায়? অতীত···অতীত···অতীত···

হঠাৎ আমার মনে বেরুটের স্মৃতি ফিরে এলো। নাইট ক্লাব বারম্যান গোবিন্দ বিহারী মালকানি—শেখ মুনিবের কথা মনে পড়লো। তারপর······

কিন্তু এই তার পরের কথা ভাববার আগেই দেখতে পেলুম আমার সামনে সতীলা এসে দাঁড়িয়েছে।

আমি যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলুম না। ভারতবর্ষের মাটিতে সতীলাকে দেখতে পাবো এ কখনই কল্পনা করতে পারি নি। আমি শুধু বিস্মিত নয় একটু হতভম্বও হলুম।

: সারপ্রাইজড জি-বি-এম। নিশ্চয় আমাকে দিল্লীর জিমখানা ক্লাবে দেখতে পাবে এ কল্পনা করোনি।

আমি একটু ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দিলুম: আশ্চর্য নয়। আমি ঠিক বুঝতে পারছিনে আপনি কেন ভারতবর্ষে এলেন?

: সে হলো এক দীর্ঘ কাহিনী। ধীরেসুস্থে পরে বলা যাবে।

: কী করে জানলেন যে আমি এই সময়ে জিমখানা ক্লাবে উপস্থিত থাকবো? কৌতূহলী হয়ে আমি জিজ্ঞেস করলুম।

সতীলা আমার প্রশ্ন শুনে হাসলো। তারপর বললো: এতো কথার জবার লাউঞ্জে বসে দিতে পারিনে। এবার চলো আমার সঙ্গে। সব কাহিনীই তোমাকে শোনাবে।

: কোথায়? আমি জিজ্ঞেস করলুম। সতীলার প্রস্তাব শুনে আমি একটু বিস্মিত হয়েছিলুম। সাতটার সময় সমাদ্দার আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। সাতটা প্রায় বাজে। অতএব সতীলার সঙ্গে এখনই যাওয়া সম্ভব নয়। তাই আমি সতীলাকে বললুম যে আমার লোকাল বস সমাদ্দার সাতটার সময় আমার সঙ্গে দেখা করতে এখানে আসবেন। আজ আমাদের কাজ নিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করতে হবে।

সতীলা বললো: না, সমাদ্দার আসবে না। কাজ নিয়ে তোমাকে আর অনর্থক চিন্তা করতে হবে না। বন্ধুরা সবাই তোমার জন্যে প্রতীক্ষা করছে। লেট আস গো দেয়ার। চলো।

সতীলার কণ্ঠে আদেশের স্বর ছিলো। আমি চুপ করে রইলুম। সতীলা আমার মনের কথা বুঝতে পারলো। বুঝতে পারলো যে আমি ওর সঙ্গে যেতে গররাজী। বললো: গোবিন্দ বিহারী, ভারতবর্ষে তুমি জাল পাশ-পোর্ট নিয়ে এসেছো। ইন্টারপোলের খাতায় লেখা আছে জি-বি-এম হলো ইন্টারন্যাশনাল স্মাগলার। আজ আমার সঙ্গে যেতে আপত্তি থাকলে তোমাকে বিপদে পড়তে হবে।

একটুখানি চুপ করে থেকে সতীলা আবার বললো: তিনটে তো খুন হয়ে গেলো। আমরা মৃত্যুর সংখ্যা আর বাড়াতে চাইনে।

সতীলার কথার মানে বুঝতে আমার একটুও দেরী হলো না। বুঝতে পারলুম ওর আদেশ অমান্য করলে আমাকে বিপদে পড়তে হবে। আর দূর দেশে বিপদ ডেকে আনা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তারপর ভাবলুম, হাজার হোক সতীলাই আমাকে এই কাজের জন্য রিক্রুট করেছিলো। তাই আজ সতীলার হুকুম অমান্য করতে কুণ্ঠা হলো।

: কার সঙ্গে দেখা করতে হবে ? জিজ্ঞেস করলুম।

: বন্ধুরা দেখা করতে চান। এসো আমার সঙ্গে।

এরপর আর আপত্তি করা চলে না। ক্লাবের বাইরে একটা এম্বাসাডার গাড়ী দাঁড়িয়ে ছিলো। আমরা দুজনে গিয়ে সেই গাড়ীর ভেতরে বসলুম।

একটানা গাড়ী ছুটে চললো। সতীলা বললো : আমরা কুতুবে যাচ্ছি। বন্ধুরা ঐখানেই বসে আছেন।

গাড়ীতে বসেই আমার সমাদ্দারের কথা মনে পড়লো। সমাদ্দারের প্রতি আমার একটু সহানুভূতি জন্মেছিলো। দুজনে আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি। অতএব খানিকটা বন্ধুত্ব হবার যথেষ্ট কারণ ছিলো।

সতীলা আবার বললো : সমাদ্দারের কথা ভুলে যাও জি-বি-এম। আমাদের নতুন করে কাজের প্ল্যান করতে হবে। কিন্তু তার আগে একটা প্রশ্নের জবাব দাও। আমরা তোমাকে যে কাজ করতে নির্দেশ পাঠিয়েছিলুম সেই কাজ করোনি কেন ?

সতীলার কথায় আমি বিস্মিত হলুম। সতীলার কাছ থেকে কোন কাজের নির্দেশ আমি পাইনি। তাই বললুম : আমাকে তো কোন কাজ করতে বলা হয় নি। সমাদ্দার প্রতিদিন আমাকে যে কাজ করতে বলেছেন আমি তার প্রত্যেকটি হুকুমই পালন করেছি। কাজের কোনই গাফিলতি করিনি। তাহলে এখন এই প্রশ্ন কেন ? কী আমার অপরাধ ?

: না, কাজের গাফিলতি তুমি করেছো, সতীলা আবার বললো।

: গাফিলতিটা কী শুনতে পারি কী ? জিজ্ঞেস করলুম।

: কিছুদিন আগে তোমাকে একখানা চিঠি লেখা হয়েছিলো। সেই চিঠির ভেতরে ছিলো কাজের নির্দেশ। কিন্তু সেই কাজ তুমি করোনি জি-বি-এম। তোমার এই কাজের গাফিলতির জন্যে আমাদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে।

হঠাৎ আমার মনে পড়লো কিছুদিন আগে আমার নামে একটি চিঠি এসেছিলো। একটা লণ্ড্রীর বিজ্ঞাপন। সেই বিজ্ঞাপনের ভেতরে ছিলো মাইক্রোডট। এবার আমি বুঝতে পারলুম যে সেই মাইক্রোডটের মারফৎ কর্তারা আমাকে কোন কাজের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কী সেই কাজ ? আমি জানিনে। বুঝতে পারলুম, কৈফিয়ৎ দিয়ে এখন কোন কাজ হবে না। অতএব ভাবলুম চুপ করে থাকাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

সতীলা বললো আবার : জি-বি-এম, প্রায় দশদিন আগে ইংলণ্ড থেকে হান্জ উনত মারিয়া কোম্পানী তোমার নামে পাঁচ হাজার ডলার পাঠিয়েছিলো। আমরা চিঠিতে এই টাকার কথা লিখেছিলুম। ন্যাশনাল গ্রিণ্ডলেজ

ব্যাঙ্কে এই টাকা এসেছিলো। কিন্তু তুমি এই টাকা ব্যাঙ্ক থেকে সংগ্রহ করোনি। দিল্লীর গ্রিণ্ডলেজ ব্যাঙ্ক বাধ্য হয়ে তাদের হেড অফিসে জানায় যে তুমি টাকা তুলে নাওনি। ইংলণ্ডের অফিস খোঁজ করে হানুজ উনৃত মারিয়া কোম্পানীর। কোথায় হানুজ উনৃত মারিয়া কোম্পানী। তুমি জানো জি-বি-এম, এ হলো এক বোগাস কোম্পানী, যার কোন অস্তিত্ব নেই। এবার পরিণাম কল্পনা কর। ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হানুজ উনৃত মারিয়া কোম্পানীর কোন খবর না পেয়ে ইণ্টারপোলকে জানায় খবরটা। আর ইণ্টারপোলের জামাই হচ্ছো তুমি, গোবিন্দ বিহারী মালকানি। এবার ভেবে দেখো, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। দু' একদিনের ভেতর ইংলণ্ডের ইণ্টারপোল তোমার ফাইল দিল্লীতে পাঠাবে। তারপর ভাবো, তোমার কী অবস্থা হবে। যদি ঠিক সময় মতো ব্যাঙ্ক থেকে টাকাটা তুলে নিতে তাহলে আজ আমাদের কাউকেই এই বিপদে পড়তে হতো না। তোমার কাজের গাফিলতির জন্যেই তুমি এই বিপদ ডেকে এনেছো।

সতীলার কথার ভেতর যথেষ্ট যুক্তি ছিলো। ঠিক সময় মতো ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নিলে পুলিশ আমার পেছনে লাগার সুযোগ পেতে না। এখন আমাকে বিস্তর হাঙ্গামা পোহাতে হবে।

সতীলা বলতে লাগলো : জি-বি-এম, স্পাইং-এর কাজ বড়ো কঠিন। সামান্য ভুলচুক মানেই জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। আজ শুধু তুমিই বিপদে পড়োনি, আমরাও সেই বিপদে জড়িয়ে পড়েছি। আজ তোমার বোকামির জন্যেই আমাদের সব কাজ ভণ্ডুল হতে চলেছে।

কথা বলতে বলতে আমাদের গাড়ী কুতুবে এসে পৌছলো। আমরা গাড়ী থেকে নামলুম। সামনেই একখানা একতলা বাড়ী। তার সামনে একটি ছোট মাঠ। মাঠ পেরিয়ে বাড়ীতে ঢুকতে হয়। দূর থেকে দেখতে পেলুম বাড়ীর ভেতরে আলো জলছে। বুঝতে পারলুম যে বাড়ীর ভেতর দলের বৈঠক বসেছে হ্যাঁ, কোন সন্দেহ নেই, এবার গোবিন্দ বিহারী মালকানির বিচার হবে। তাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।

বাড়ীর দরজায় সতীলা মৃদু টোকা দিলো। ভেতর থেকে কেউ একজন মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলো : কে ?

: সতীলা।

ভেতর থেকে দরজা খুলে দিলো কেউ। আমরা দুজনে ভেতরে ঢুকলুম।

ঘরের মধ্যে চারজন লোক বসেছিলো। তার মধ্যে সমাদ্দার ও মিসে সেনও ছিলেন। বাকী দুজন বিদেশী। একজন বর্মীজ হবেন। অন্যজন বি

দলের সভাপতি, তিনি যে চাইনীজ তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সতীলা আমাকে দলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো। বললো : আমাদের সহকর্মী গোবিন্দ বিহারী মালকানি। সংক্ষেপে জি-বি-এম, বলে ডাকতে পারেন। পুলিশের দপ্তরে জি-বি-এম বিশেষ সুপরিচিত। কিন্তু এতো নাম থাকা সত্বেও জি-বি-এমকে আজ অবধি পুলিশ গ্রেপ্তার করেনি. সেইটেই আশ্চর্যের বিষয়!

আমার বুঝতে অসুবিধে হলো না যে সতীলা আমার গাফিলতির কথা উল্লেখ করছে। এ ক্ষেত্রে চুপ করে থাকাই হলো বুদ্ধিমানের কাজ। আমি চুপ করে রইলুম। কিন্তু আমার পক্ষ হয়ে সমাদ্দার জবাব দিলেন। বললেন : তার কারণ এদেশের আইন কানুন আজও জি-বি-এম ভাঙেনি।

বর্মীজ লোকটি এবার আমাকে বললো : কিন্তু জি-বি-এম-এর উপর পুলিশের নজর থাকা মানেই আমদেরও বিপদ। ইচ্ছে করে আমরা দলের বিপদ ডেকে আনতে চাইনে।

আমি দলের অন্যান্য মেম্বারদের পানে তাকালুম। কেউই এই কথার কোন জবাব দিলো না।

খানিক বাদে আমি আবার সতীলার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলুম। সতীলা বলছে : কমরেড ঠিক কথাই বলেছেন। জি-বি-এম-এর বিপদ মানেই দলের বিপদ। ইচ্ছে করে কখনই আমরা দলের বিপদ ডেকে আনতে পারিনে। আমরা দুমাসের জন্যে জি-বি-এমকে ভারতবর্ষে পাঠিয়েছিলুম। একমাস হয়ে গেলো কিন্তু আজ অবধি আমাদের কাজের কিছুই অগ্রসর হয়নি। বরং তিন তিনটে খুন হয়ে গেলো। শুধু তাই নয়। পুলিশের অশুভ নজরও এসে পড়লো জি-বি-এম-এর ওপরে। বর্তমানে আর বেশিদিন জি-বি-এম-এর এই দেশে থাকা মানে বিপদ আরও বাড়া।

হঠাৎ আমার মনে হলো ওরা জি-বি-এম-এর জিনিয়াসকে তুচ্ছ করছে। আমার দেহ মনে বিদ্রোহ জেগে উঠলো। আমার কণ্ঠে ভেসে উঠলো প্রতিবাদের সুর। আমি বললুম : স্যার, আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে তাহলে দু একটা প্রশ্ন করতে পারি।

: যতো খুশী প্রশ্ন করতে পারো জি-বি-এম। যদি তোমার প্রশ্নের কোন উত্তর থাকে তাহলে আমরা নিশ্চয় উত্তর দেবো, সতীলা বললো।

: প্রথমে আমাকে বলুন, আমার নামে পাঁচ হাজার ডলার পাঠিয়েছিলেন কেন? ভারতবর্ষে আসবার সময় আমাকে যথেষ্ট টাকা দেয়া হয়েছিলো। আমার তো টাকার কোন অভাব ছিলো না।

এবার চীনি ভদ্রলোক মুখ খুললেন। আগেই বলেছি চীনি ভদ্রলোকই ছিলেন আজকের বৈঠকের সভাপতি।

: জি-বি-এম, এই পাঁচ হাজার ডলার তোমার জন্যে পাঠাইনি। পাঠিয়েছিলুম পার্টির কাজের জন্যে। তুমি জানো, যেদিন থেকে ভারত সরকার আমাদের ব্যাঙ্ক অব চায়নাকে বাজেয়াপ্ত করেছে সেদিন থেকেই এই দেশে টাকা পাঠানো বেশ মুস্কিলের কাজ হয়েছে। অথচ দলের কাজের জন্যে আমাদের অর্থের প্রয়োজন। দূতাবাসের মারফৎ আমরা টাকা পাঠাতে পারিনে। কারণ তাহলেই পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। তুমি জানো পুলিশ আজকাল দূতাবাসের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখে। তুমি বিদেশী। ইংলণ্ড থেকে তোমার কোম্পানী খরচের টাকা পাঠিয়েছে তাই কারও সন্দেহ করার কারণ নেই। তুমি যদি ঠিক সময়মতো এই টাকা ব্যাঙ্ক থেকে সংগ্রহ করতে তাহলে আজ আমাদের এই ঝামেলায় পড়তে হতো না। এবার বল, তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন কী তাই শুনি?

: এবার আমি প্রশ্ন করছিনে। আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে তার কৈফিয়ৎ দিচ্ছি। কাজের গাফিলতির জন্য আমাকে দোষারোপ করা হয়েছে। মনে রাখবেন, আমি ছিলুম হুকুমের চাকর। আমাকে স্পষ্টই বলা হয়েছিলো যে ভারতবর্ষে আমাকে কাজের নির্দেশ দেয়া হবে। আমার কর্তব্য হবে সেই কাজ সুসম্পন্ন করা। আমার লোকাল বস ছিলেন সমাদ্দার ও সমীর সেন। ওরা যখনই আমাকে যে কাজের নির্দেশ দিয়েছেন তা আমি পালন করেছি। এবার বলুন আমার কাজের ত্রুটি কোথায়?

সমাদ্দার আমার পানে কঠোর দৃষ্টিতে তাকালেন। সতীনা আমাকে সমর্থন করলো। বললো: কমরেডস, আমাদের বন্ধু ঠিক কথাই বলেছে। জি-বি-এম ছিলো হুকুমের চাকর। তাকে যে কাজের হুকুম দেয়া হয়েছে, সে সেই কাজই করেছে।

আবার মুখ খুললেন দলের সভাপতি সেই চীনি ভদ্রলোক। বললেন: কাজের দোষ ত্রুটির কথা আলোচনা করে লাভ নেই। কারণ এই বেকার আলোচনা করে আমরা আসল ঘটনাকে এড়িয়ে যাচ্ছি। আমরা জি-বি-এম-এর কাজের ত্রুটি ধরতে আসিনি। মাস দেড়েক হয়ে গেলো কিন্তু আজ অবধি আমরা ভারত সরকারের কোন গোপন মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করতে পারিনি। এতো পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সবই পণ্ড হতে চলেছে। এদিকে প্রতিদিনই আমাদের বিপদ বাড়ছে। কানা ঘুষোয় পুলিশ এতোদিনে নিশ্চয় আমাদের কথা শুনেছে। শুধু কী তাই, কতকগুলি জরুরী মাইক্রোফিল্মও আমরা ইতিমধ্যে হারিয়ে বসে আছি। কমরেডস এবার বলুন আমরা কী করতে পারি?

বর্মীজ ভদ্রলোক বললেন : আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে কাজের গাফিলতি জি-বি-এল করেনি, করেছে সমাদ্দার। কারণ এই সমস্ত প্ল্যানের এবং তার অপারেশনের ভার আমরা সমাদ্দারকে দিয়েছিলুম।

সমাদ্দার এই অভিযোগের জবাব দেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু উনি মুখ খুলবার আগেই চীনি ভদ্রলোক বললেন : আজ অবধি আমরা শুধু মাত্র একটি টপ সিক্রেট ডকুমেণ্ট পেয়েছি। বর্ডার এরিয়া কমিটির রিপোর্ট। কিন্তু তোমার রেডিও ট্রান্সমিশন অতি বাজে হয়েছিলো। ভেবেছিলুম, এই রিপোর্ট তুমি মাইক্রোফিল্ম করে হংকং-এ পাঠাবে। অন্ততঃ তোমার সঙ্গে বন্দোবস্ত ছিলো প্রতি রিপোর্ট এবং টপ সিক্রেট কাগজ মাইক্রোফিল্ম করে তুমি আমাদের কাছে হংকং-এ পাঠাবে।

সমাদ্দারের পরিবর্তে এবার আমিই জবাব দিলুম। কারণ সেদিন রেডিও ট্রান্সমিশন আমিই করেছিলুম। অতএব এবার জবাবদিহিও আমারই দেবার কথা। বললুম : ট্রান্সমিশন ভালো না হবার অনেক কারণ। আপনারা আমাকে পুরানো মেশিন দিয়েছিলেন। ঐ মেশিন ভালো কাজ করা যায় না। বি টু মেশিন। যুদ্ধের সময় এই মেশিন ব্যবহার করা হতো। দ্বিতীয়তঃ ট্রান্সমিশনের সময় আমাদের ইলেকট্রিসিটি ফেল করে। আমরা ব্যাটারী থেকে ট্রান্সমিটারে কানেকশন নিয়েছিলুম। এবং এই জন্যেই আমাদের সিগন্যাল অতি বাজে হয়েছিলো।

অনেকগুলো কথা এক সঙ্গে বলে আমি একটু ক্লান্ত বোধ করে থাকলুম। চীনি ভদ্রলোক এবার সমাদ্দারকে জিজ্ঞেস করলেন,

: সমাদ্দার তোমার কৈফিয়ৎ কিন্তু আমরা এখনো শুনিনি। জি-বি-এম ছিলো তোমার সাগরেদ। তুমি ছিলে লোকাল বস। এবার তুমিই বলো, আমাদের কাজ ভণ্ডুল হতে চলেছে কেন ? কেন আজ অবধি কাজ শেষ হয়নি, অথচ ইতিমধ্যেই দলের তিনজন মারা গেলো ? কমরেড, এবার তোমার জবাবদিহি শুনতে চাই।

সতীলা চীনি ভদ্রলোককে সংশোধন করে বললো : মারা গেলো নয় সমাদ্দার, পর পর তিনটি লোককে খুন করা হলো। বল, এই তিনটি খুনের কী প্রয়োজন ছিলো ?

খানিকটা সময় চুপ করে রইলেন সমাদ্দার। আমরা সবাই ওর পানে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলুম। সমাদ্দারের জবাব শুনবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলুম। সমাদ্দার বললেন : কমরেডস, আজ আমার বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ করা হয়েছে। বলা হয়েছে আমার গাফিলতির জন্যেই-কাজ ভণ্ডুল হতে চলেছে।

কিন্তু আমার কৈফিয়ৎ দেবার আগে আমি জানতে চাই আপনাদের অন্য কোন প্রশ্ন আছে কি না?

বৈঠকের সবাই সমাদ্দারের কথা শুনে চুপ করে গেলো। কিন্তু আসরের নিস্তব্ধতা ভাঙলো সতীনা। বললো: বেশ আমাদের কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দাও। আমরা জানতে চাই এখনও কেন আমরা কোন গোপনীয় মূল্যবান ডকুমেণ্ট পাই নি?

বর্মীজ ভদ্রলোক ফোড়ন কাটলেন: এতো পয়সা খরচ করেও আমরা ভালো কনট্যাকটস যোগাড় করতে পারিনি কেন?

সমাদ্দার একটু হাসলেন, তারপর বললেন: কমরেডস, আপনাদের অভিযোগ মিথ্যে। কারণ ভারত সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে এখনো আমাদের চরেরা বসে আছে। আমাদের কাজ বিপদের কাজ। অতএব ধৈর্য ধরতে হয়। রাতারাতি কাজের ফলাফল পাওয়া যায় না।

: তাহলে তারা হয়তো কোন গোপনীয় ফাইল দেখতেই পায় না, বললেন বর্মীজ ভদ্রলোক।

: দেখতে পায়, কিন্তু দপ্তরে বসে তো আর গোপনীয় ফাইলের কপি করা যায় না। ধরা পড়বার সম্ভাবনা আছে। কমরেডস, একটা কথা মনে রাখবেন, ভারত সরকারের ইনটেলিজেন্স দপ্তর সর্বদাই আমাদের অনুচরদের পেছনে লেগে আছে। সরকারী ফাইলের ফটোগ্রাফ করার জন্য আমাদের আধা ডজন স্পাই ক্যামেরা দরকার। অথচ আজ অবধি আমরা একটাও ক্যামেরা পাই নি। বলুন, আমি কী করে কাজ করবো?

: আমাদের কনট্যাকটরা কী ধরনের শুনতে পারি কী? চীনি ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন।

: বড়ো ও ছোট দুই ধরনেরই কনট্যাকটস আছে। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে। ছোট ছোট ক্লার্ক ও টাইপিস্টদের মধ্যেও আমাদের অনুচর আছে। বলতে পারেন, আমরা রুই ও কাতলা নিয়ে ব্যবসা করি।

: দু' একজন কনট্যাকটের নাম বলুন, বর্মীজ ভদ্রলোক প্রশ্ন করেন।

: মাপ করবেন। কনট্যাকদের নাম উচ্চারণ করা নিষেধ। প্রতি কনট্যাকটকে আমরা একটি করে নম্বর দিয়েছি। ওদের আমরা নম্বর ধরে ডাকি। সমীর সেনের নম্বর ছিলো এ স্ট্রোক ফোর। মানিকলালের ছিলো এ স্ট্রোক ফাইভ। আমাদের অপারেশনের কোডের নাম হলো অপারেশন মারলবরো।

এবার সতীনা জিজ্ঞেস করলো। বললো: আমি শুনেছিলুম এই কোডের

নাম পাল্টানে হয়েছে।

: হ্যাঁ, কোডের নাম পাল্টানো একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো। কারণ আমরা খবর পেয়েছিলুম যে পুলিশ অপারেশন মারলবরোর খবর জানতে পেরেছে।

: কী করে জানলো? সতীলা আবার প্রশ্ন করে।

সতীলার এই প্রশ্নে সমাদ্দার একটু বিরক্তি অনুভব করলেন। তার মুখে ও সেই বিরক্তির ভাব স্পষ্ট ফুটে উঠলো।

: আপনি জানেন সতীলা, ভারতবর্ষে মারলবরো সিগারেটের প্রচলন নেই। বর্ডার এরিয়া কমিটির রিপোর্ট ট্রান্সমিশনের দিন আমরা এক প্যাকেট মারলবরো সিগারেট লোদী রোডের বাড়ীতে ফেলে এসেছিলুম। পুলিশ এই মারলবরো সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে তদন্ত শুরু করে। ভবিষ্যৎ বিপদ এড়াবার জন্যই আমরা এই কোডের নাম পরিবর্তন করি।

সমাদ্দারের জবাব হয়তো সবাইকে সন্তুষ্ট করলো।

চীনি ভদ্রলোক বললেন: বেশ সমাদ্দার এবার বলো, আজ দেড় মাসের ভেতর আমাদের কাজ এগোয় নি কেন?

চীনি ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বরে বেশ একটু ঝাঁঝ ছিলো। তিনি আবার বললেন: তার আগে আর একটা প্রশ্নের জবাব তোমাকে দিতে হবে সমাদ্দার। আমরা জানতে চাই মানিকলালের মৃত্যুর কারণ কী?

: শুধু মানিকলাল নয়, দুদিন আগে সমীর সেনও মারা গেলো। বিশ্ব শুদ্ধ সবাই জানে সমীর সেনের অতি স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু আমরা এই মৃত্যুর প্রকৃত রহস্য জানতে চাই। এই মৃত্যুও কী একান্তই প্রয়োজন ছিলো? সতীলা প্রশ্ন করলো।

: মৃত্যু নয়, ওদের খুন করা হয়েছে, মিসেস সেন বললেন।

ঘরের সবাই বেশ একটু বিস্মিত হয়ে মিসেস সেনের দিকে তাকালেন। এই আলাপ আলোচনায় মিসেস সেন এতোক্ষণ মুখ খোলেন নি। এবার তার মুখ থেকে এই মন্তব্য শুনে আমরা বেশ একটু বিস্মিত হলুম।

: নাই। ওদের খুন করা হয় নি। মানিকলাল অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে। আর আপনারা সবাই জানেন সমীর সেনেরও অতি স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। ন্যাচারাল ডেথ। এ দুটো মৃত্যুর জন্যে কাউকে দোষ দেয়া যায় না। সমাদ্দার জবাব দিলেন।

: নো, ইট ওয়াজ এ মার্ডার, সতীলা বললো।

: ন্যাচারাল ডেথ নয়, প্রতিবাদ করে বললেন মিসেস সেন।

এবার আমি মুখ খুললুম। বললুম: আমরা যতোদূর জানি মানিকলাল আমাদের সঙ্গে কাজ করতে ভয় পাচ্ছিলো। আমরা আশংকা করেছিলুম যে শিগ্‌গিরই সে পুলিশের কাছে গিয়ে সমস্ত কথা বলে দেবে। অতএব···

আমরার কথা শেষ হবার আগেই সতীলা মন্তব্য করলো: অতএব তাকে খুন করা হলো, এইতো? স্বীকার করি আমাদের কাজে খুনের প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু যে সব কনট্যাকটস মূল্যবান তাদের এই সংসার থেকে সরানো নিতান্তই মূর্খামি।

চীনি ভদ্রলোক এবার জিজ্ঞেস করলেন: সমাদ্দার, তুমি সন্দেহ করছো পুলিশ আমাদের সন্ধান পেয়েছে, পুলিশ তবু কাউকে গ্রেপ্তার করছে না কেন এর জবাব দাও? আমার মন বলছে এর ভেতর কোন রহস্য লুকানো আছে। আর কী সেই রহস্য আমি তা জানতে চাই।

: পুলিশ এখনো জানে না যে আমরা কোথায় এবং কী কাজ করেছি, আমি জবাব দিলুম।

: না, পুলিশ সব কিছুই জানে: অন্ততঃ আমার মন তাই বলছে। আজ অবধি পুলিশ জাল গুটোয় নি কেন? চীনি ভদ্রলোক বললেন।

আমি আবার প্রতিবাদ করলুম। কিন্তু চীনি ভদ্রলোক বললেন: ক্যুরিয়ারের দেহ থেকে মাইক্রোফিল্ম চুরি গেলো। সমাদ্দার, এই মাইক্রোফিল্ম কে পেলো? পুলিশ না রতন?

সমাদ্দার জবাব দেবার আগেই আমি বললুম: ওল্ড কমরেড। সে আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ডবল ক্রসিং।

: ঝুটা বাত, চীনি ভদ্রলোক আবার বললেন।

: কেন, ঝুটা বাত কেন? আমি জিজ্ঞেস করলুম।

: সাচ্চা মাল পায় নি রতন। হাসপাতালে গিয়ে মৃতদেহ থেকে যে মাইক্রোফিল্ম রতন উদ্ধার করেছিলো সেই মাইক্রোফিল্ম ছিলো জাল। একেবারে ভূয়ো। মাইক্রোফিল্মের ভেতর কোন ছবি ছিলো না। আমার মন বলছে মাইক্রোফিল্ম পেয়েছে পুলিশ। কিন্তু এই মাইক্রোফিল্ম পাওয়া সত্বেও পুলিশ আজ অবধি কাউকে গ্রেপ্তার করেনি। কেন? এইটেই আমি জানতে চাই।

: মাইক্রোফিল্ম জাল! আমি আর সমাদ্দার দুজনেই একসঙ্গে চীৎকার বলে উঠলুম।

: হ্যাঁ, জাল। কমরেড সমাদ্দার, রতন জাল মাইক্রোফিল্মই মৃতদেহ থেকে সংগ্রহ করেছিলো। আসল মাল পায়নি।

: আপনি কী করে জানলেন মাইক্রোফিল্ম জাল? আমি জিজ্ঞেস করলুম।

: কারণ, সম্প্রতি রতন এই মাইক্রোফিল্ম বিক্রি করতে পাকিস্তান হাই কমিশনে গিয়েছিল। সেখানেই মাইক্রোফিল্ম যাচাই করতে দেখা যায় যে এই ফিল্ম জাল। যদি এই ফিল্ম জাল হয় তাহলে আসল ফিল্ম কোথায় গেল? নিশ্চয় সরকারের হাতে গিয়ে পড়েছে।

চীনি ভদ্রলোকের কথার ভেতর যুক্তি ছিলো। অতএব আমরা প্রতিবাদ করতে পারলুম না। সমাদ্দার জিজ্ঞেস করলেন: কমরেড, আপনি বলছেন রতন মাইক্রোফিল্ম বিক্রি করতে পাকিস্তান হাই কমিশনে গিয়েছিলো, কিন্তু এর কোন প্রমাণ আছে কী? রতন আমাকে কথা দিয়েছিলো যে পনের দিন বাদে আমার সঙ্গে দেখা করবে। এর আগে এই মাইক্রোফিল্ম কারও কাছে বিক্রি করবে না।

: হ্যাঁ, হতে পারে। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি রতন রাখেনি। কারণ তার ছিলো অর্থের প্রয়োজন। অতএব সমাদ্দারের সঙ্গে কথা বলার পর মুহূর্তেই সে গিয়ে হানা দিলো পাকিস্তান হাই কমিশনে মাইক্রোফিল্ম বিক্রির বন্দোবস্ত করতে।

: আপনি কী করে জানলেন যে সে পাকিস্তান হাই কমিশনে গিয়েছিলো? সমাদ্দার জিজ্ঞেস করলেন। আমারও জানবার আগ্রহ হলো রতন কেন পাকিস্তান হাই কমিশনে গিয়েছিলো। সত্যিই কী মাইক্রোফিল্ম বিক্রির উদ্দেশ্যে? আর, চীনি ভদ্রলোকই বা কী করে সেই খবর পেলেন!

সমাদ্দার ও আমি দুজনেই মনের কথা প্রকাশ করলুম। আমাদের প্রশ্ন শুনে চীনি ভদ্রলোক একটু হাসলেন, তারপর বললেন: আমাদের এই দলের ভেতর নিশ্চয় ভারত সরকারের কোন স্পাই আছে। আপনারা যাকে বলেন থার্ড ম্যান। নইলে আমাদের এই অপারেশন কখনও ব্যর্থ হতে পারে না। যাক্, আপনারা জানতে চাইছেন যে আমি কী করে খবর পেলুম যে রতন মাইক্রোফিল্ম বিক্রি করতে পাকিস্তান হাই কমিশনে গিয়েছিলো। এই খবর আমি পেয়েছি চীনি দূতাবাস থেকে। কাল দূতাবাস থেকে আমাকে একটা টেপ পাঠিয়েছে। কমরেডস, আমি আপনাদের সেই টেপ বাজিয়ে শোনাবো। এই টেপের ভেতরে আছে চীনি মিলিটারী এট্যাচী এবং পাকিস্তান হাই কমিশনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা। এবার সেই আলাপ-আলোচনা শুনুন।

আমরা সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মতো এই টেপ রেকর্ডিং শুনতে লাগলুম।

* * * *

: আমার নাম কর্নেল আনসারী।

: গুড মর্নিং কর্নেল আনসারী। আপনার টেলিফোন পেয়ে আমি বেশ

অবাক হয়েছিলুম। কারণ আমি ভেবেছিলুম আপনি করাচী চলে গেছেন।

: হ্যাঁ, করাচীতে আমার যাবার কথা ছিলো বটে ব্রিগেডিয়ার লি খান, হঠাৎ দিল্লীতে আমার কতকগুলো জরুরী কাজ পড়ে যেতে আর করাচী যেতে পারেনি। যাক্, আপনার কাছে এখন একটা সাহায্যের জন্যে এসেছি।

: বলুন আমি কী করতে পারি আপনার জন্যে?

: আপনি রতন ও সমাদ্দার বলে কাউকে চেনেন?

: ভারতবর্ষে তো কতোই রতন আর সমাদ্দার আছে, তাদের হিসেব রাখা কী সহজ কথা। কী করেন সমাদ্দার ভদ্রলোক?

: এক্সপোর্ট ও ইমপোর্টের ব্যবসা।

: কিসের এক্সপোর্ট ও ইমপোর্ট?

: সংবাদের। গোপনীয় টপ সিক্রেট খবরের আমদানী ও রপ্তানী করাই হলো তার কাজ।

: না, সমাদ্দার আমার কাছে একেবারেই অপরিচিত। রতনকেও চিনিনে।

: তাহলে আমাদের আলাপ-আলোচনা একেবারেই ব্যর্থ হলো ব্রিগেডিয়ার লি খান্, মাপ করবেন।

: দাঁড়ান, একবার পলিটিক্যাল সেকশনে খবর নিয়ে দেখি। হয়তো ওরা সমাদ্দারকে চিনতেও পারে। আমি এক্ষুণি ওদের টেলিফোন করছি—হ্যালো পলিটিক্যাল সেকশন। আপনারা রতন ও সমাদ্দার বলে কাউকে চেনেন। আমাদের পাকিস্তানী সহকর্মী ওদের সম্বন্ধে খানিকটা আলোকিত হতে চান। ···চেনেন না।

মাপ করবেন কর্নেল আনসারী, আপনাকে নিরাশ করতে হলো। হ্যাঁ, ওরা বলছে যদি বিশেষ দরকার থাকে তাহলে ওদের সম্বন্ধে খবর সংগ্রহ করে দিতে পারে। দিল্লীতে বিভিন্ন মহলে আমাদের ভালো কন্‌টাক্ট আছে কিনা তাই। তার আগে আমাদের জানা দরকার আপনি রতন ও সমাদ্দারের পরিচয় জানতে চান কেন? কী আপনার উদ্দেশ্য? আপনার গোটা মতলব শুনতে পেলে হয়তো আপনাকে আমরা সাহায্য করতে পারবো। বলুন কর্নেল আনসারী, আপনার কাহিনী বলুন।

: সমাদ্দারের এক বন্ধুর নাম রতন। দিন সাতেক আগে রতন আমাদের কাছে কতকগুলো মাইক্রোফিল্ম বিক্রি করতে এনেছিলো। ভারত সরকারের টপ সিক্রেট ডকুমেন্টের ওপরে মাইক্রোফিল্ম করা।

: ইন্টারেষ্টিং, ভেরী ইন্টারেষ্টিং! কর্নেল আনসারী, পুরো কাহিনীটাই খুলে বলুন এবার।

ব্রিঃ ভ ডয়ার লি থান্, এক সপ্তাহ আগে আমি সন্ধ্যে সাতটায় নিজের বাড়ীতে বসেছিলুম। চাকর এসে বললো, একটি লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। আমার কিন্তু দেখা করার সময় ছিলো না। কারণ, আমার সঙ্গে সেদিন কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব এসেছিলেন দেখা করতে। আমি তাদের সঙ্গেই বসে গল্প করছিলুম। কিন্তু লোকটি নাছোড়বান্দা। বাধ্য হয়ে আমি লোকটির সঙ্গে দেখা করলুম।

আমার ড্রইংরুমে লোকটি বসেছিল। বেশ বাউণ্ডুলে চেহারা। পরনে পায়জামা ও পাঞ্জাবী, পায়ে চপ্পল।

: কর্নেল আনসারী ?

: হ্যাঁ, বলুন কী চান ?

: আমার নাম রতন। আমি সমাদ্দারের বন্ধু।

: সমাদ্দার কে ? আমি বেশ একটু কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলুম।

: ইনফরমেশন কালেক্টার। বলতে পারেন স্পাই।

রতনের কথা শুনে আমি বেশ একটু বিস্মিত হলুম। রতন কী চায় ? আমার সঙ্গে বেশ সহজ ভাবে কথা বলছিলো রতন। তার কথা শুনে মনে হলো, সে যেন আমার বহু দিনের পুরানো বন্ধু।

: আপনাকে কয়েকটি সিক্রেট কথা বলতে চাই।

: বলুন, শুনছি। কী আপনার গোপনীয় কথা।

: কিন্তু আপনার বৈঠকখানায় বসে এই সব গোপনীয় কথা বলতে সংকোচ বোধ করছি।

: সরি রতন। যে-কোন কথাই আপনি এখানে বসে বলতে পারেন। আর আমার হাতে বেশি সময় নেই। কথা তাড়াতাড়ি শেষ করুন।

আমার কথা শুনে রতন হাসলো। বললো : আমি কী কথা বলতে এসেছি তা জানলে আপনি এতো তাড়াহুড়ো করতেন না। যাক্, আপনার সঙ্গে সমাদ্দারের কোন পরিচয় নেই ?

: বললুম তো, সমাদ্দারকে আমি চিনিনে।

: এই খবর শুনে খুশীই হলুম, কারণ সমাদ্দার বর্তমানে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী।

: এবার আপনি কী চান তাই বলুন ?

: আমি কয়েকটি টপ সিক্রেট ডকুমেণ্ট বিক্রি করতে চাই।

: কী ধরনের টপ সিক্রেট ডকুমেণ্ট ?

: ভারত সরকারের বর্ডার এরিয়া কমিটির রিপোর্ট।

: জেনুইন ?

: প্রয়োজন হলে বাজারে যাচাই করে নেবেন।

রতনের প্রস্তাবটি যে লোভনীয় সে বিষয়ে সন্দেহের কারণ ছিলো না। আ[illegible] জানতুম এই ধরনের যে কোন রিপোর্ট করাচী সাগ্রহে লুফে নেবে। কি[illegible] আমার মনের সে উৎসাহ আমি রতনের কাছে প্রকাশ করলুম না, চুপ ক[illegible] রইলুম।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে রতন আবার বললো : ভাবছেন? কি[illegible] এতো ভালো অফার আর কখনও পাবেন না।

: বেশ, আপনার অফার গ্রহণ করবার আগে দু' একটা প্রশ্নের জবাব দিন এই রিপোর্ট আপনি কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন সেইটে আমি জানতে চাই আর, এই রিপোর্টটির সঙ্গে সমাদ্দারের কী সম্পর্ক তাও জানতে চাই।

: কোন সম্পর্ক নেই। সমাদ্দার চীনিদের হয়ে কাজ করে। আ[illegible] ইণ্ডিপেণ্ডন্ট অপারেটর। এবার শুনুন এই রিপোর্টের জন্যে আমি কতো চাই পঞ্চাশ হাজার টাকা। বর্ডার এরিয়া কমিটির রিপোর্ট ছাড়া আরও দু[illegible] মাইক্রোফিল্ম আছে। আগ্রার ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের এয়ার পোর্টের নক[illegible] ইত্যাদি। সব মিলিয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা চাই।

আমি রতনের প্রস্তাবে চট করে রাজী হলুম না। এই ধরনের অফার আম[illegible] হাইকমিশনে প্রায়ই পেয়ে থাকি। তাই আমি দাম কমাবার চেষ্টা করলুম।

: দশ হাজার, তার ওপর একটি পয়সাও বেশি দিতে পারবো না।

: দেন ফরগেট ইট। এই বলে রতন চলে যাবার উপক্রম করলো।

: আপনার মাইক্রোফিল্ম যে সাচ্চা মাল তার প্রমাণ কী? আমি রতনকে বাধা দিয়ে বললুম।

: ডেভেলপ করে দেখুন। দেখবেন আমার খবর কতো মূল্যবান। মা[illegible] ভালো হলেই পয়সা দেবেন।

: কিন্তু দশ হাজারের বেশি দিতে পারবো না।

: পনের হাজার—

: না, স্রেফ দশ হাজার। প্রথমে দু হাজার দেবো। ফিল্ম ডেভেলপ কর[illegible] যদি ভালো খবর পাই তাহলেই বাকী টাকা দেবো। যদি ফিল্ম বাজে হয় তাহ[illegible] আমরা বেকার পয়সা খরচ করতে রাজী নই।

: অল্ রাইট। রতন জবাব দিলো।

: বেশ, তাহলে আসুন আমার সঙ্গে।

: কোথায়? রতন বেশ একটু কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

: আমাদের হাইকমিশনারের কাছে। এতো টাকা দিয়ে ডকুমেন্ট কিনছি[illegible]

মাল কিনবার আগে একবার তার অনুমতি নিয়ে নিতে চাই। দুজনেই ওর সঙ্গে গিয়ে দেখা করবো।

: আপনি যান, আমি অন্য কারও সঙ্গে দেখা করবো না। যদি আমার জিনিস নিতে আপনারা রাজী থাকেন তাহলে বলবেন। পয়সা দিন, মাল কিনুন। এছাড়া আর কোন সম্পর্ক নেই।

: বেশ, তাহলে আধ ঘন্টা সময় আমার বৈঠকখানায় বসে অপেক্ষা করুন। আমি একবার হাইকমিশনারের বাড়ী থেকে ঘুরে আসি।

রতনকে আমার বৈঠকখানায় বসিয়ে আমি হাইকমিশনারের কাছে গেলুম। হাইকমিশনার বাড়িতে ছিলেন না। ইন্দোনেশিয়ান এম্বেসীর কক্‌টেলে গিয়েছিলেন। ডেপুটি হাইকমিশনারের সঙ্গে দেখা করলুম। উনি আমার মুখে সমস্ত কথা শুনে ভুরু কোঁচকালেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : লোকটি কে? আমি বললাম, লোকটি আমার অপরিচিত। শুধু এইটুকু জানি যে ওর এক বন্ধু সমাদ্দার চীনিদের হয়ে কাজ করে।

: সমস্ত ব্যাপারটি কিন্তু আমার কাছে সন্দেহজনক বলে বোধ হচ্ছে। এতোগুলো টাকা তো আর চট্‌ করে দিয়ে দেয়া যায় না। যাক্‌, আপনি যা ভালো বোঝেন তাই করুন। এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ রেসপনসিবিলিটি আপনার।

অনেক ভেবে চিন্তে আমরা দুজনে ঠিক করলুম যে আমরা প্রথম মাইক্রো-ফিল্মটি কিনবো। এর জন্যে রতনকে আগাম দু' হাজার টাকা দেবো। যদি ফিল্ম সাচ্চা মাল হয় তাহলে বাকী দুটো ফিল্মও কিনবো।

বাড়ীতে এসে রতনকে দু' হাজার টাকা দিলুম। বললুম, এই ফিল্ম যদি খাঁটি হয় তবেই বাকী দুটোও ফিল্মও কিনবো। তিনটে ফিল্মের জন্যে মোট দশ হাজার টাকা দেবো। ঠিক হলো সাতদিন বাদে রতন আবার এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে। যাবার আগে রতন আর একটি কথা বললো। বললো : যদি কখনও সমাদ্দার আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে তাহলে আমার কথা যেন ওকে বলবেন না।

পরের দিনই স্পেশাল ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে এই মাইক্রোফিল্ম করাচীতে পাঠিয়ে দিলুম। তারপরের কয়েকটা দিন আমার বিশেষ উৎকণ্ঠায় কাটলো। প্রতিটি মুহূর্ত আমি গুনতে লাগলুম। কখন করাচী থেকে জবাব আসে তাই ভাবতে লাগলুম। কিন্তু চার পাঁচ দিন কেটে গেলো তবু করাচী আমার কেবল্‌-এর জবাব দিলো না। ইতিমধ্যে রতন একদিন আমাকে টেলিফোন করেছিলো। আমি বললুম, এখনও কোন জবাব পাইনি। রতন জানালো আবার দুদিন বাদে আমাকে টেলিফোন করবে।

পাঁচ দিন বাদে আমি করাচী থেকে এক সিগন্যাল পেলুম। আমাদের দপ্তরের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী পরের প্লেনে দিল্লীতে আসছেন এই মাইক্রো-ফিল্মের ব্যাপার নিয়ে তদন্ত করতে।

বিকেল বেলায় সিনিয়র অফিসার এলেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : এই মাল কার কাছে কিনেছো?

: রতন নামে একটি লোকের কাছ থেকে।

: রতন কে?

: আমি ঠিক জানিনে, আমার অপরিচিত। নিজেই এসেছিলো।

তারপর আমি সিনিয়র অফিসারকে রতনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের সম্পূর্ণ বিবরণ খুলে বললুম। তাকে জিজ্ঞেস করলুম : মাল সাচ্চা না ঝুটো?

তোমার এই কথার জবাব দেবার আগে জানতে চাই রতন সত্যিই স্পাই না ভারত সরকারের কোনও এজেন্ট?

: মানে? আমার প্রশ্নে ছিলো কৌতূহল। আমার কিন্তু একবারও মনে সন্দেহ জাগেনি যে রতন ভারত সরকারের এজেন্ট।

: কারণ, মাইক্রোফিল্মের ভেতর একটিই ছবি ছিলো। সেই ছবিটি হলো বর্ডার এরিয়া কমিটির রিপোর্টের প্রথম পাতার ছবি। তারপর বাকী সব ফিল্মই ছিলো খালি। অর্থাৎ ওর ভেতর কোন ছবিই ছিলো না। এক কথায় বলতে পারো এই ফিল্ম ভূয়ো, জাল। তাই সন্দেহ করছি, হয়তো রতন ভারত সরকারের কোন এজেন্ট। হয়তো আমাদের কোন ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করছে। এবং তাই, এই ব্যাপারের তদন্ত করতেই দিল্লীতে ছুটে এসেছি।

আমি রতনের খোঁজ করলুম। কিন্তু রতনের কোন ঠিকানা আমার জানা ছিলো না। বলেছিলো, সাতদিন বাদে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় রতন আর আসেনি। কেন, এলো না, জানিনে, কিন্তু আমাদের মনে দৃঢ় সন্দেহ জেগেছে যে রতন বা সমাদ্দার হলো ভারত সরকারেরই লোক। তাই ব্রিগেডিয়ার, আপনার কাছে জানতে এসেছি আপনি রতন বা সমাদ্দারকে চেনেন কি না? রতনের মুখে শুনেছিলুম যে সমাদ্দারের সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগ বা সম্পর্ক আছে। হয়তো আপনারা সমাদ্দারের খবরাখবর রাখেন। তাই আপনাদের কাছে এ ব্যাপারে সাহায্য চাইছি।

: মাপ করবেন কর্নেল আনসারী, রতন ও সমাদ্দার আমাদের কাছে একেবারেই অপরিচিত। হাঁ, যদি কোনদিন দৈবক্রমে ওদের কোন খবর পাই তাহলে আপনাদের জানাতে কুণ্ঠা বোধ করবো না। কিন্তু আজ আপনাদের কোন সাহায্য করতে পারছি না, সরি।

: ধন্যবাদ।

: ধন্যবাদ।

চীনি ভদ্রলোক টেপ-রেকর্ডার বন্ধ করলেন। এতক্ষণ আমরা সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মতো ব্রিগেডিয়ার লি থান ও কর্নেল আনসারীর আলাপ আলোচনা শুনছিলুম। কোন কথা বলা বা মন্তব্য করার সুযোগ পাইনি।

কেন জানিনে আমি এবার সমাদ্দারের মুখের পানে তাকালুম। সমাদ্দার স্পাই, ভারত সরকারের এজেন্ট। অসম্ভব! এ হলো মিথ্যে অভিযোগ, মন গড়া কথা।

আমার বিস্ময়ের আরও একটি কারণ ছিলো। মাইক্রোফিল্মের ভেতর কোন ফটো ছিলো না, এ খবর যেন আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলুম না। এ খবর কী সমাদ্দারের জানা ছিলো! যদি উনি জানতেন যে মাইক্রোফিল্মের ভেতরে কোন ছবি নেই তাহলে কেন সে মরীচিকার পেছনে ঘুরছেন! এ রহস্য আজ আমি কিছুতেই ভেদ করতে পারলুম না।

ক্ষণিকের জন্যে আমার মনেও এ সন্দেহ জাগলো যে, সত্যিই সমাদ্দার হয়তো ভারত সরকারের স্পাই। হয়তো উনিই আসল মাইক্রোফিল্ম লুকিয়ে রেখে জাল ফিল্ম পাচার করবার চেষ্টা করেছেন। স্পাই না হলে কেন ফাঁকি দেবার চেষ্টা করবেন। সমাদ্দার নিশ্চয়ই এক বিরাট কারসাজি করছেন। হয়তো বাইজিং-এর কর্তাদের চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু ওদের কেন ফাঁকি দেবেন? কমরেড সমাদ্দার হলেন বাইজিং-এর কর্তাদের ডান হাত। আজ ওদের সঙ্গে প্রতারণা করার কী সার্থকতা আছে।

আমি বেশ কিছুক্ষণ সমাদ্দারের মুখের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে ছিলুম। দেখতে পেলুম, সমাদ্দার মুখেও বিস্ময়ের ছাপ ফুটে উঠেছে। ব্রিগেডিয়ার লি থান ও কর্নেল আনসারীর আলাপ আলোচনা শুনে উনিও যে বিস্মিত হয়েছেন এই বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ রইলো না।

এই করে বেশ খানিকক্ষণ পর্যন্ত ঘরে নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগলো। কারও মুখে টুঁ শব্দটি নেই। সবাই গভীর চিন্তায় মগ্ন।

ঘরের নিস্তব্ধতা ভাঙলো সন্তীলা। বললো,

: কমরেডস, আজ সমাদ্দারের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করা হয়েছে। সমাদ্দার আমাদের বহু দিনের পুরাতন বিশ্বস্ত সহকর্মী। কোন দিন ওর কোন কাজে আমরা কোন ভুল ত্রুটি পাইনি। আজকের এই কাহিনী শুনে আমাদের মনে খটকা লাগছে। আমরা জানতে চাই, সত্যি কী সমাদ্দার আমাদের

ধোঁকা দেবার চেষ্টা করেছিলেন? সমাদ্দার যদি আমাদের চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা করে থাকেন, তাহলে কেন কী কারণে তিনি আমাদের সঙ্গেও প্রতারণা করার চেষ্টা করেছিলেন সে প্রশ্নেরও জবাব আমাদের জানা দরকার।

আর একটি ব্যাপার আমার কাছে বিশেষ খেয়ালী বলে মনে হচ্ছে। কমরেডস, ক্যুরিয়ারের মৃতদেহ থেকে যদি পুলিশ আসল মাইক্রোফিল্ম উদ্ধার করে থাকে, তাহলে আজ অবধি কেন জি-বি-এম এবং সমাদ্দারকে পাকড়াও করেনি। কেন পুলিশ চুপচাপ বসে আছে? আমার মন বলছে, এই সব ঘটনার পেছনে এক বিরাট রহস্য লুকানো আছে। কী সেই রহস্য তা আমরা জানতে চাই। নাউ লেট আস হিয়ার কমরেড সমাদ্দার।

সমাদ্দার চট্ করে কোন জবাব দিলেন না। আমি বুঝতে পারলুম, উনি ভাবতে শুরু করছেন। এই অভিযোগের কী জবাব দেবেন তাই ভাবছেন। কিন্তু কে তার কথায় বিশ্বাস করবে!

বেশ খানিকক্ষণ চুপ থেকে সমাদ্দার জবাব দিলেন। তার কণ্ঠস্বরে উত্তেজনার সুর ছিলো। আমি বুঝতে পারলুম সতীলার অভিযোগে সমাদ্দারও একটু বিচলিত হয়েছেন। সমাদ্দার বললেন,

: কমরেডস, ব্রিগেডিয়ার লি থান আর কর্নেল আনসারীর আলাপ আলোচনা শুনে আপনাদের মনে সন্দেহ জেগেছে যে, আমি হলুম ভারত স্পাই। এ হলো এক গুরুতর অভিযোগ। আপনারা আজ যেমন বিস্মিত হয়েছেন তেমন আমিও কম বিস্মিত হইনি। মাইক্রোফিল্মের ভেতর কোন ছবি ছিলো না এ আমি বিশ্বাস করতে পারছি নে। না, আমি আপনাদের কোন ধোঁকা দেবার চেষ্টা করিনি। আমি আপনাদের কাছে আসল মাইক্রোফিল্ম পাঠাবার চেষ্টা করেছিলুম। অতএব জাল মাইক্রোফিল্মের কথা শুনে আমিও বেশ বিস্ময় অনুভব করছি। কমরেডস, আমার এই মনের বিস্ময় আজ ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না।

কমরেডস, আমার মন বলছে, পুলিশ এখনও মাইক্রোফিল্মের সন্ধান পায় নি। এই মাইক্রোফিল্ম ওদের হাতে পড়লে আমাকে বা জি-বি-এমকে আজ আপনারা এই ঘরে দেখতে পেতেন না। এবার আমার প্রশ্ন হলো যদি রতন আসল মাইক্রোফিল্ম না পেয়ে থাকে, তাহলে সে ফিল্ম কোথায় গেলো? এই প্রশ্নের সমাধান করা আমাদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক।

কমরেডস, আপনাদের আর একটি কথাও বলতে চাই। আপনারা জানেন যে ফাইল থেকে মাইক্রোফিল্ম করা হয়েছিলো সেই ফাইলের ভেতর সমীর সেনের সই ছিলো। আজ পুলিশের হাতে যদি এই মাইক্রোফিল্ম গিয়ে থাকে তাহলে

ওরা নিশ্চয় সমীর সেনকেও গ্রেপ্তার করতো। কিন্তু পুলিশ তো সমীর সেনের পেছনেও লাগেনি। কেন? আপনারা জানেন সমীর সেনের অতি স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। তার মৃত্যু নিয়ে কোন আলোড়ন বা চাঞ্চল্য হবে না, ঠিকই। তার মৃত্যুর আসল কারণ আমাদের অজানা নেই। সমীর সেনের হার্ট ছিলো অতি দুর্বল। জি-বি-এম-এর প্রতিও তার একটা বিদ্বেষ ও হিংসা ছিলো। সেই জি-বি-এমকে দেখেই অত্যাধিক উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন সমীর সেন। এবং তার পরিণামেই ঘটল তার মৃত্যু। কিন্তু আজ আর সমীর সেনের মৃত্যুর অতীত ঘটনার বিবরণী দিয়ে আপনাদের মনকে ভারাক্রান্ত করতে চাইনে। আপনাদের শুধু একটা কথা বলতে চাই যে আমি নির্দোষ। আমি জানি যে এ সব ঘটনার জন্য আজকে আপনারা আমাকে দোষারোপ করবেন। আমি হলপ করে বলতে পারি কাজের ব্যর্থতার জন্যে আমি একটুও দায়ী নই।

যাক্, আজ আপনাদের কাছে আমার একটি বিশেষ অনুরোধ আছে। অবান্তর প্রশ্ন ও সংশয় সৃষ্টি করে আপনারা বৃথা সময় নষ্ট করবেন না। আমাদের এখনও বহু কাজ অসম্পূর্ণ পড়ে আছে। বহু খবর এখনও আমাদের সংগ্রহ করতে হবে। আমি শুধু আপনাদের বলতে পারি যে আমাদের পরিশ্রম সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়নি। আমাদের আরও কিছুদিন সময় দিন। আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে ইতিমধ্যে আমরা আরও বহু মূল্যবান সংবাদ সংগ্রহ করতে পারবো। আপনারা জানেন, কিছুদিন আগে জেনারেল চৌধুরী আমেরিকা সফর করে এসেছেন। জেনারেল চৌধুরী আমেরিকায় গিয়েছিলেন হাতিয়ার কিনতে। প্রেসিডেন্ট কেনেডি ভারতবর্ষকে হাতিয়ার সাপ্লাই করতে রাজী হয়েছেন। কী ধরনের হাতিয়ার আমেরিকা ভারতবর্ষকে দেবে আমরা এখন সেই খবর সংগ্রহ করবার চেষ্টায় আছি। শুধু তাই নয়। শিগগিরই সোভিয়েট রাশিয়াও ভারতবর্ষে মিগ বিমান তৈরী করবার কারখানা খুলছে এই কারখানার নকশাও আমরা শিগগিরই পাবো। কমরেডস, তাই আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি আজ আমাকে দোষীর কাঠগড়ায় বসিয়ে বৃথা সময় নষ্ট করবেন না। আমার অনুরোধ আপনারা আর একটু ধৈর্য ধরুন। দেখবেন, ভবিষ্যতে আমার কাজে কোন ত্রুটি পাবেন না।

আমরা একমনে সমাদ্দারের কথা শুনছিলুম। কেউ কোন কথা বলিনি। এক সময়ে চীনা ভদ্রলোক মুখ খুললেন। বললেন: সমাদ্দার, কাজ শেষ করার জন্য তোমাকে দু'মাস সময় দেয়া হয়েছিলো। এখন সেই দু'মাস প্রায় শেষ হতে চলেছে। কাজ শেষ হওয়া তো দূরের কথা বরং কাজের বাধা বিঘ্ন আরো বাড়ছে। একটা কথা মনে রেখো সমাদ্দার। আমাদের উপর পুলিশের

তীক্ষ্ণ নজর আছে। মানিকলালের মৃত্যু নিয়ে কম গোলমাল বা হাঙ্গামা হয় নি। তারপর আজ তুমি অতি মূল্যবান মাইক্রোফিল্মের রোল হারিয়েছো। এবং আজ অবধি তুমি সেই হারানো বস্তু খুঁজে বের করতে পারোনি। পর পর যে এতোগুলো ঘটনা ঘটে গেলো, এর জন্যে দায়ী কে সমাদ্দার? তুমি। কারণ তুমিই হলে লোকাল বস। তোমার নির্দেশেই মানিকলাল ও সমীর সেন কাজ করেছে। আজ তোমার সাগরেদ হলো জি-বি-এম। অতএব আজ তোমার বিরুদ্ধে যদি কেউ অভিযোগ করে থাকে তাহলে আমরা তাকে দোষারোপ করবো না।

চীনি ভদ্রলোকের মন্তব্য শুনে সমাদ্দারের মুখ আরও গম্ভীর হলো। কিন্তু সমাদ্দার চট্ করে কোন জবাব দিলেন না।

: কমরেডস, আপনাদের অনুমতি হলে আজ এই রহস্যের খানিকটা সমাধান আমি করতে পারি, মিসেস সেন হঠাৎ বলে উঠলেন।

মিসেস সেনের মন্তব্যে আমি বেশ বিস্মিত হলুম। এতোদিন আমি ভেবেছিলুম মিসেস সেন অতি শান্ত নিরীহ প্রকৃতির মেয়েমানুষ। কখনও একথা ভাবিনি যে তিনি কোন জটিল আলোচনাতেও অংশ গ্রহণ করতে পারেন।

মিসেস সেনের কথা শুনে শুধু আমি নই, ঘরের সবাই বেশ একটু অবাক হয়েছিলেন। সমাদ্দার বেশ কঠোর দৃষ্টিতে মিসেস সেনের দিকে তাকালেন। তার চাউনি দেখে মনে হলো যে উনি মিসেস সেনের কথা যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না।

: ওয়েল লেট আস হিয়ার মিসেস সেন, বেশ একটু ভাঙা ইংরাজীতে চীনি ভদ্রলোক বললেন।

: হ্যাঁ কমরেডস, আজকের এই রহস্যের বেশ খানিকটা সমাধান আমি করতে পারবো। কমরেডস, আপনারা শুনলে অবাক হবেন বটে, তবু সে খবরটা আপনাদের জানা দরকার। মানিকলাল এক চিঠিতে এই রহস্যের খানিকটা আভাস আমাদের দিয়েছিলো। মৃত্যুর প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা আগে মানিকলাল এই চিঠি সমীর সেনকে লেখে। চিঠিখানা নিজের হাতে পোস্ট করতে পারেনি। হয়তো অন্য কাউকে পোস্ট করতে দিয়েছিলো। তাই অনেক দিন বাদে সমীর সেন এই চিঠি পায়। দু'দিন আগে সমীর সেনের কাগজপত্র খুঁজতে গিয়ে আমি সেই চিঠির খানিকটা অংশ পেয়েছি। শেষের কয়েক পাতা আমি আজও উদ্ধার করতে পারিনি। তাই আজকের রহস্যের পুরো সমাধানও আমি করতে পারবো না।

কমরেড, আমি জানি মানিকলালের মৃত্যুর কী কারণ? আর হঠাৎ আচমকা সমীর সেনেরই বা মৃত্যু হলো কেন? হয়তো আপনারাও এই রহস্যের কিছুটা আভাস পেয়েছেন। যা আপনারা শুনেছেন তা কী সবই সত্যি? সমাদ্দার বলেছেন যে, আমাদের কাজের জন্যই ওদের সংসার থেকে বিদেয় দেয়া একান্ত প্রয়োজন হয়েছিলো। সমাদ্দারের সেই যুক্তি সঙ্গত কি না, সেইটে আজ আপনারা চিন্তা করে দেখবেন।

এতোক্ষণ এই আলোচনায় আমি যোগ দিইনি। আমি ছিলুম নীরব শ্রোতা ও দর্শক। সমাদ্দারের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ শুনে আমি ফোড়ন কাটলুম: মিসেস সেন, আজ আপনি আমাদের সহকর্মী সমাদ্দারের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করছেন। এই অভিযোগ প্রমাণ করা একান্ত দরকার। আশা করি আপনি আমাদের সহকর্মীদের সামনে প্রমাণ পেশ করবার চেষ্টা করবেন।

আমার কথা শুনে মিসেস সেন হাসলেন। তার হাসি দেখে মনে হলো যেন উনি আমার কথাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। অতএব আমার কথাকে সিরিয়াসলি নেয়া যায় না, এই ছিলো মিসেস সেনের মুখের ভাব।

: আমি জি-বি-এম-এর সঙ্গে একমত মিসেস সেন, সতীলা আমার কথাকে সমর্থন করে বললো,—সমাদ্দার আমাদের পুরাতন বিশ্বস্ত সহকর্মী। তার কাজের ভুল ত্রুটি হওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু অন্য কিছু সন্দেহ করার আগে আমরা সঠিক জানতে চাই আপনার অভিযোগ সত্যি না মিথ্যে। কমরেডস, আমরা মিসেস সেনের পুরো বক্তব্য শুনতে চাই।

: আমার বক্তব্য নয় মিঃ সতীলা, আজ আমি আপনাদের মানিকলালের বক্তব্য শোনাতে চাই। মানিকলালই তার চিঠিতে সব কিছু লিখে গিয়েছিলো।

: এই চিঠি যে মানিকলালেরই লেখা তার কোন প্রমাণ আছে মিসেস সেন? আমি জিজ্ঞেস করলুম।

: আপনি ছিলেন মানিকলালের বন্ধু জি-বি-এম। বেশ তো দেখুন না তাকিয়ে, এই চিঠিটি কার হাতের লেখা। নিশ্চয় মানিকলালের হাতের লেখা চিনতে আপনার কোন অসুবিধে হবে না। চিঠিটা দেখে আপনিই বন্ধুদের বলুন, এই চিঠিটা মানিকলালের হাতের লেখা কিনা।

মিসেস সেনের কাছে আমার হার স্বীকার করতে হলো। চিঠিটা যে মানিকলালেরই হাতের লেখা সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ হলো না। অতএব আমি চুপ করে রইলুম। কোন জবাব দিলুম না। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে মিসেস সেন বললেন: কমরেডস, জি-বি-এম নিজে স্বীকার করেছেন

মানিকলালের এই চিঠি কোন জাল চিঠি নয়। যাক্, আপনাদের আমি এই চিঠিটা পড়ে শোনাচ্ছি।

আমি আবার প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর তুললুম: কমরেডস, এই চিঠি মানিক-লালের লেখা এই বিষয়ে আমার কোন সন্দের নেই ঠিকই, কিন্তু মানিকলালের বক্তব্য সত্যি না মিথ্যে এ যাচাই করার কোন উপায় নেই। কারণ আজ মানিকলাল মৃত। তাকে জেরা করে কিছু জেনে নেবার সম্ভাবনা আর নেই। কোন এক তরফা অভিযোগই আমরা বিশ্বাস করতে পারিনে।

আমার মন্তব্যের জবাব দিলেন চীনি ভদ্রলোক। বললেন: জি-বি-এম, প্রথমত আমাদের জানা চাই মানিকলাল কী লিখে গেছে। তারপর আমরা যাচাই করবো তার কাহিনী সত্যি না মিথ্যে। মিসেস সেন, আপনি মানিক-লালের চিঠিখানা পড়ুন।

মিসেস সেন মানিকলালের চিঠি পড়তে শুরু করলেন।

*　　　　*　　　　*

১৯৬: সাল। জানুয়ারী মাস। চীন ভারতের সংগ্রাম সবেমাত্র শেষ হয়েছে। বিদেশীর মন থেকে যুদ্ধের আতঙ্ক তখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নি। আমি তখন থাকতুম তেজপুরে। মিলিটারী বিমান বন্দরের এয়ার পোর্ট অফিসার। পনের দিনের ছুটিতে লখনউ যাচ্ছিলুম। লখনউ-তেই যাবার বিশেষ কোন কারণ ছিলো না। গৌহাটি থেকে কাটিহার এক্সপ্রেস ধরেছিলুম। অতএব আমাকে লখনউ নামতে হলো।

আমি যখন ছুটির আর্জি পেশ করলুম, কর্তারা আমাকে বললেন: মানিক-লাল, বর্তমানে ছুটি একেবারেই অসম্ভব। আমি ছিলুম একেবারেই নাছোড়বান্দা। একবার যখন ছুটির গোঁ ধরেছি তখন ছুটি না পেলে আমার চলবে না। কর্তাদের স্পষ্ট বললুম: স্যার, কয়েকদিনের ছুটি আমার একান্তই দরকার। ফ্যামিলির কারণ।

অনেক হাঙ্গামা করে ছুটি পেলুম।

গৌহাটি থেকে ট্রেন ধরলুম। আজকাল ট্রেনে জায়গা পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। আমি মিলিটারী আদমি। অতএব আমার জন্য মিলিটারী কম্পার্টমেণ্ট রিজার্ভ ছিলো। আমি নিজের রিজার্ভ কম্পার্টমেণ্টে গিয়ে বিছানা পেতে ঘুমোবার চেষ্টা করলুম। দুটো দিন ও পুরো রাত্রির সফর। অতএব আরাম করে শোওয়া দরকার।

রাত প্রায় দশটার সময় ট্রেন শিলিগুড়িতে পৌঁছলো। জনতার কোলাহলে প্ল্যাটফর্ম মুখরিত। প্ল্যাটফর্মে গরম চা ও সিগারেট বিক্রি হচ্ছে। আমি এক

ভাঁড় চা কিনলুম। আজকের শিলিগুড়ি দেখলে কে বলবে যে সম্প্রতি চীন ও ভারতের মধ্যে কোন লড়াই হয়ে গেছে।

ট্রেন যাত্রীতে বোঝাই। কোন কম্পার্টমেন্টেই একটুও মাথা গলাবার যো নেই। যাত্রীরা জায়গার সন্ধানে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে।

হঠাৎ আমার কামরার সামনে এসে একটি বুড়ো লোক দাঁড়ালো। বুঝতে পারলুম লোকটি আমার কামরায় ঢুকতে চায়।

আমার মিলিটারী মেজাজ। তাই বেশ একটু রুক্ষস্বরে তাকে বললুম: এখানে নয়, অন্য কোন কামরায় যাও। এ হলো মিলিটারী কামরা।

অনুনয়ের কণ্ঠে লোকটি জবাব দিলো: মাপ করবেন স্যার, দেখতে পাচ্ছেন তো ট্রেনের অবস্থা। কোথাও একটু মাথা গলাবার জায়গা নেই। বড্ডো বিপদে পড়েছি। তার পেয়েছি আমার মেয়ের অসুখ। লখনউতে থাকে। আমার এই ট্রেনেই যাওয়া একান্ত দরকার। আপনি একটু সাহায্য করলেই তবে আজ আমার যাওয়া সম্ভব হতে পারে।

লোকটির অনুনয়ে আমার দয়া হলো। আমি চট্ করে তাকে 'না' বলতে পারলুম না। বললুম: ভেতরে আসতে দিতে পারি এক সর্তে।

: আপনার সর্ত বলুন, বুড়ো ভদ্রলোকটি জিজ্ঞেস করলো করুণ কণ্ঠে।

: কাটিহারে আপনি নেমে অন্য কম্পার্টমেন্টে চলে যাবেন। কারণ কাটিহার থেকে অন্য মিলিটারী অফিসারেরা এসে এই কম্পার্টমেন্টে ঢুকবেন। আমি বললাম।

: এই বান্দা আপনার হুকুমের চাকর। আপনি যখনই বলবেন সেই মুহূর্তে এই কামরা থেকে নেমে যাবো। শুধু খানিকটা পথ আমাকে আপনার কামরায় যেতে দিন। মাঝ রাস্তায় নিশ্চয় ভিড় কমে যাবে।

বুড়ো ভদ্রলোক তার মালপত্র নিয়ে আমার কামরায় ঢুকলো। তার সঙ্গে বিশেষ কোন মালপত্র ছিলো না বললেই হয়। সামান্য একটি ছোট সুটকেশ ও কালো একটা এটাচী কেস মাত্র।

ট্রেন আবার চলতে লাগলো। জানিনে কেন আমার চোখে আর ঘুম এলো না। অপরিচিত কেউ কম্পার্টমেন্টে আছে বলেই কিনা জানিনে, আমি চট্ করে চোখ বুজতে পারলুম না।

একটু বাদে বুঝতে পারলুম, আমার সহযাত্রীটি বেশ বাচাল প্রকৃতির। কারণ, আমাকে সজাগ থাকতে দেখে সে অনর্গল কথা বলতে শুরু করলো।

: আমার নাম গিদোয়ানী স্যার। সিন্ধী রেফুজী। তেজপুরে আমার ব্যবসা আছে। মানি লেন্‌ডিং বিজনেস। কিছু মোটা সুদে টাকা ধার দেয়াই

হলো আমার আসল ব্যবসা। এই শর্মাকে সবাই একডাকে তেজপুরে চেনে। আপনি কোন্ প্রদেশের লোক স্যার?

গিদোয়ানীর প্রশ্নে আমি একটু বিরক্তি বোধ করলুম। আমি কোনদিনই প্রাদেশিকতাকে প্রশ্রয় দিইনে। অতএব তার কথারও কোন জবাব দিলুম না। চুপ করে রইলুম।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে গিদোয়ানী বুঝতে পারলো যে তার প্রশ্ন আমার মনঃপূত হয়নি। তাই সে এবার কথার মোড ঘোরাবার চেষ্টা করলো। কণ্ঠস্বর একটু নীচু করে বললো,

: স্যার আপনি হলেন মিলিটারী আদমী। বলুন স্যার, এই লড়াইয়ে কী আমাদের পরাজয় হয়েছে?

গিদোয়ানীর কথার জবাব চট্ করে দিতে পারলুম না। বেশ খানিকটা সময় চুপ করে রইলুম। গিদোয়ানীর প্রশ্নে পাশ কাটাবার চেষ্টা করলুম। একটু পরেই বুঝতে পারলুম যে বেশ শক্ত লোকের হাতেই পড়েছি। সহজে এর হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই।

ভাবতে লাগলুম কী করা যায়। কী করে লোকটার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। চলন্ত ট্রেন থেকে লোকটাকে তো আর ফেলে দিতে পারিনে।

: আপনি রাগ করেছেন স্যার? বুড়োর কথায় রাগ করবেন না। আমি সরল মনেই আপনাকে প্রশ্ন করেছি। অপরিসীম জানবার ইচ্ছে থেকেই প্রশ্ন করেছি। যাক্, এবার একটু মিষ্টি মুখ করুন। ঘরের তৈরী মিষ্টি। আমি আবার বাজারে তৈরী মিষ্টি খেতে পারিনে।

এই বলে গিদোয়ানী আমার হাতে এক থালা মিষ্টি তুলে দিলো। না, লোকটি হলো নিতান্তই নাছোড়বান্দা। যেমন করেই হোক আমার সঙ্গে আলাপ করবেই। বুঝতে পারলুম, সারাটা রাত আমাকে বুড়োর বকবকানি শুনতে হবে। হঠাৎ জানিনে কেন আমার মনে একটু আতঙ্ক হলো। ভাবলুম, হয়তো লোকটির মনে কোন দুরভিসন্ধিও আছে। কী তার মতলব? কিন্তু অন্ধকার রাত্রে চলন্ত ট্রেনে বসে কী অপরিচিত কারও মনের কথা জানা যায়!

একটু বাদে আমার চোখে তন্দ্রা নেমে এলো। কতোক্ষণ চোখ বুজেছিলুম জানিনে। হঠাৎ একটা স্টেশনে পানিপাড়ের চীৎকারে ঘুম ভেঙে গেলো। এমনি সময় বাইরের দরজায়ও কে জানি ধাক্কা দিলো। আমি উঠে দরজা খুলে দিলুম। দেখলুম, টিকিট চেকার।

: এই কম্পার্টমেন্টে কী আপনি একা আছেন? চেকার আমাকে জিজ্ঞেস করলো।

: হ্যাঁ, ছোট করে জবাব দিলুম তার প্রশ্নের। কিন্তু জবাব দেবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনে পড়লো গিদোয়ানীর কথা। আমি কম্পার্টমেণ্টের ভেতর তাকিয়ে দেখলুম। কিন্তু কোথায় গিদোয়ানী! সত্যিই আমার কম্পার্টমেণ্টে তখন আর অন্য কেউ নেই। আমি ভাবতে লাগলুম, লোকটা হঠাৎ কোথায় গেলো! চলন্ত ট্রেন থেকে উধাও হয়ে যাওয়া তো সহজ কথা নয়!

টিকিট চেকার আমার জবাব শুনে চলে গেলো। আমি এবার গিদোয়ানীর খোঁজ শুরু করলুম। উপরের ব্যাঙ্কে তাকিয়ে দেখলুম একবার কিন্তু কোথাও গিদোয়ানীকে দেখতে পেলুম না।

চিন্তিত মনে আমি ফিরে এসে বসলুম নিজের আসনে। একবার ভাবলুম প্ল্যাটফর্মে ট্রেন থামবার সঙ্গে সঙ্গে সে নেমে গেছে। কিন্তু নেমে যাবার আগে নিশ্চয়ই একবার আমাকে বলে যাওয়া উচিত ছিলো। লোকটি নেহাতই অকৃতজ্ঞ।

কিন্তু একটু বাদেই, আমি বিস্মিত নয়নে দেখলুম, গিদোয়ানী বাথরুমের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো। এবার ভাবলুম, হয়তো গিদোয়ানী টিকিট চেকারের ভয়ে বাথরুমে লুকিয়েছিলো। আমার মনে কোন সন্দেহ রইলো না যে গিদোয়ানী নিশ্চয়ই টিকেট লেস ট্র্যাভেলার, অর্থাৎ কিনা বিনা টিকিটের যাত্রী।

: ট্রাভেলিং উইদাউট টিকেট? প্রশ্ন করলুম ঠাট্টার সুরে।

: নো স্যার, আপনি যাকে টিকিট চেকার ঠাউরেছেন সে লোকটি আদৌ টিকিট চেকার নয়। লোকটি আমার সন্ধানেই এসেছিলো। গিদোয়ানী ধীরে ধীরে জবাব দিলো।

: আপনার সন্ধানে? উত্তেজিত ও কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে আমি প্রশ্ন করলুম। ভাবলুম, গিদোয়ানীর নিশ্চয় মাথা খারাপ হয়ে গেছে। না হলে এমন ধরনের কোন মন্তব্য সে নিশ্চয় করতো না। কিন্তু হঠাৎই আবার আমার মনে হলো লোকটি হয়তো সত্যি কথাই বলেছে। নিশ্চয়ই তার এই মন্তব্যের আড়ালে কোন রহস্য লুকিয়ে আছে। কী সেই রহস্য আমার জানবার ইচ্ছে হলো।

গিদোয়ানী এবার একটু কণ্ঠস্বর নীচু করে বললো: স্যার আপনাকে কী বিশ্বাস করতে পারি?

আমি গিদোয়ানীর বিশ্বাস ভাঙবো না এই প্রতিশ্রুতি দিলুম। বললুম: আপনি নিশ্চয় বিশ্বাস করতে পারেন।

: তবে শুনুন স্যার। আমার জীবনের আশংকা আছে। দেয়ার ইজ ডেঞ্জার টু মাই লাইফ।

মিঃ গিদোয়ানী, আপনার কথা কিন্তু আমার কাছে বড্ডো হেঁয়ালী মনে হচ্ছে। আর একটু ব্যাখ্যা করে বলুন, আমি বললুম।

গিদোয়ানী বললো : আমি বুড়ো মানুষ। আমাকে গিদোয়ানী বলেই ডাকবেন। যাক্ স্যার, এবার আপনাকে পুরো কাহিনী শোনাচ্ছি। আমার এই কাহিনী শুনলে আপনি তাজ্জব বনে যাবেন। এ হলো আরব্য উপন্যাসের চাইতেও রোমাঞ্চকর কাহিনী।

আপনাকে আগেই বলছি স্যার, বলেই গিদোয়ানী আমার মুখের পানে তাকালো।—স্যার, আপনার নামটাতো আমাকে বলেন নি ?

: আমার নাম মানিকলাল। আমি হলুম তেজপুরের এরোড্রাম অফিসার।

: হ্যাঁ, কী বলছিলুম, গিদোয়ানী আবার বলতে শুরু করলো,—আপনাকে আগেই বলেছিলুম স্যার, আমি হলুম মানি লেণ্ডার। অর্থাৎ চড়া সুদে আমি টাকা ধার দিই। এই কাজের জন্যেই তেজপুর শহরে আমার বিস্তর শত্রু আছে।

কিছুদিন হলো একদল লোক আমার পিছনে লেগেছে। তারা কিছু না দিয়েই আমার কাছ থেকে তাদের হুণ্ডিগুলো ফেরত নেবার ফিকিরে আছে। সবাই ভাবছে কী করে গিদোয়ানীর কাছ থেকে হুণ্ডি উদ্ধার করবে। আমার কাছে অনেক অনেক মূল্যবান হুণ্ডির কাগজ আছে। সেই সব কাগজপত্র নিয়ে আমি এখন লখনউ যাচ্ছি। সেখানে কোন নিরাপদ জায়গায় বা কোন ব্যাঙ্কের লকারে এইসব কাগজ রেখে আসবো। এখন দেখছি, আমার শত্রুরা আমার পেছু নিয়েছে।

গিদোয়ানী চুপ করে থাকলো কিছুটা সময়। সেই সময় গাড়ীর ঝকঝকানি ছাড়া আমি আর কিছুই শুনতে পেলুম না। তারপর আবার গিদোয়ানী আমাকে জিজ্ঞেস করলো,

: স্যার, আপনাকে একটা অনুরোধ করবো ?

: শুনি আপনার অনুরোধ ? আমি বেশ নির্লিপ্ত কণ্ঠেই বললুম।

: আপনি লখনউতে যাচ্ছেন। আপনি হলেন মিলিটারী লোক আর এ হলো মিলিটারীর রিজার্ভ কম্পার্টমেণ্ট। এর চেয়ে নিরাপদ জায়গা আর কী হতে পারে ? ধরুন স্যার, আমার এইসব কাগজগুলি যদি আপনি লখনউতে নিয়ে যান তাহলে আমি মস্তো এক দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাই। এই যে কালো এটাচী কেসটা দেখছেন, এর ভেতরেই আছে সব মূল্যবান কাগজ। বহু লক্ষ টাকা দিলেও আপনি এই সব কাগজ কিনতে পারবেন না।

গিদোয়ানীর প্রস্তাব শুনে বেশ একটু বিস্মিত হয়েছিলুম। লোকটার যে মাথা খারাপ সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রইলো না। নইলে কোন এক অপরিচিত ট্রেনের সহযাত্রীর কাছে এতো মূল্যবান কোন বস্তু যে কেউ রেখে যেতে পারে, এ আমি বিশ্বাস করতে পারলুম না। আমিই যে গিদোয়ানীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবো না তার প্রমাণ কী।

আমার মনের কথা হয়তো গিদোয়ানী বুঝতে পারলো। আমাকে বললো : জানি স্যর আপনি কী ভাবছেন। ভাবছেন আপনাকেই কেন এই বান্দা বিশ্বাস করছে। ভাবছেন, কাগজগুলোর দাম যদি এতোই মূল্যবান হয় তাহলে এক অপরিচিত লোকের কাছে কেন এই সব মূল্যবান কাগজপত্র রেখে যাচ্ছি। প্রথমত স্যর, আপনাকে আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করি। বলতে পারেন একেবারে ষোল আনা বিশ্বাস আমার আছে। অথচ এই কালো এটাচী কেস যদি আমার কাছে থাকে তাহলে আমার পক্ষে গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা আছে। আপনার কাছে যদি এই এটাচী রেখে যাই তাহলে কেউ জানবে না যে কাগজগুলো কার জিম্বায় রেখে গেছি।

আমি লখনউতে মাউন্ট হোটেলে থাকবো। কাল রাত দশটার সময় আপনি আমার হোটেলে আসবেন। মাপ করবেন স্যর, আপনাকে আমার হোটেলে আসতে বললুম। কিন্তু ঐ কালো এটাচী কেস নিয়ে আমি রাস্তা দিয়ে হাঁটতে পারিনে। প্রাণের আশংকা আছে। হ্যাঁ, কী বলছিলুম, কাল রাত দশটার সময় আপনি আমার সঙ্গে মাউন্ট হোটেলে দেখা করবেন। আমি সেইখানে আপনার কাছ থেকে এই এটাচী কেস ফেরৎ নেবো।

গিদোয়ানী একটানা বলে চললো : আমি বিনে পয়সায় আপনাকে এই কাজ করতে বলছিনে। এই কাজের পরিবর্তে আপনাকে আমি দশ হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত আছি।

গিদোয়ানীর প্রস্তাব যে লোভনীয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিলো না। সামান্য একটা এটাচী কেস বয়ে নেবার জন্যে দশ হাজার টাকা মুনাফা পাওয়া যাবে, একথা আমি যেন ভাবতেই পারলুম না।

গিদোয়ানীর প্রস্তাব আমি গ্রহণ করলুম। সামান্য এইটুকু কাজ করে যদি এতোগুলো টাকা পাওয়া যায় তবে আর দ্বিধা বা সংকোচ কেন। আমি আমার সম্মতি জানালুম।

আমার জবাব শুনে গিদোয়ানী বললো : আপনি আমার মনটাকে হাল্কা করে দিলেন স্যর। এই কাগজগুলো নিয়ে বড়োই ভাবনায় পড়েছিলুম। এখন খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করছি। যাক্, বললুম তো আমার এই কাজের

জন্যে আমি আপনাকে দশ হাজার টাকা দেবো। আর টাকার জন্যে ভাবনা করবেন না। কাল যখন আপনি এটাচী কেসটা নিয়ে হোটেলে আসবেন তখনই আপনাকে আমি পুরো টাকাটা ক্যাশ দিয়ে দেবো। আপনি টাকাগুলো গুনে গুনে তুলে নেবেন। বলুন, আমার প্রস্তাবে রাজী আছেন তো?

: অল রাইট, আমি আবার জবাব দিলুম অতি সংক্ষিপ্ত কথায়।

: স্যর, এই রইলো আমার এটাচী কেস। এটাকে একটু নজরে নজরে রাখবেন। অনেক মূল্যবান কাগজ আছে এর ভেতরে। একটু বেসামাল হলেই এই সব কাগজ চুরি যেতে পারে।

এই বলে গিদোয়ানী আমার হাতে কালো এটাচী কেস তুলে দিলো। এটাচী কেসটা বেশ ভারী ছিলো। বুঝতে পারলুম, এটাচী কেসটা ঠাসা আছে কাগজপত্রে। একবার এটাচী কেসটা খুলে তার ভেতরের কাগজগুলো দেখবার প্রবল ইচ্ছে জাগলো। মনের সেই ইচ্ছেকে দমন করলুম। এমন কি গিদোয়ানীকেও আমার মনের ইচ্ছে জানালুম না। ভাবলুম, তাহলে হয়তো গিদোয়ানী আমাকেও সন্দেহ করবে।

খানিক বাদে ট্রেন কাটিহার জংশনে থামলো। তখন ভোর হয়েছে।

মস্তোবড়ো কাটিহার রেলওয়ের প্ল্যাটফর্ম। সবদাই লোকজনে গিস গিস করছে। সেই ভিড়ের মধ্যেই গিদোয়ানী প্ল্যাটফর্মে নামলো। বললো: আবার কাল দেখা হবে স্যর। এক্সাক্টলি এট টেন পি. এম।

আমি এবার একটু ঠাট্টার সুরে বললুম: ধরুন যদি আমি আপনার সঙ্গে দেখা না করি, আপনার এইসব মূল্যবান কাগজ নিয়ে পালিয়ে যেতে পারি তো?

মুহূর্তের জন্যে গিদোয়ানীর মুখের রঙ পাল্টালো। বুঝতে পারলুম, আমার কথা শুনে গিদোয়ানী বেশ শঙ্কিত হয়েছে। কিন্তু তার এই চিন্তা ক্ষণিকের। একটু বাদেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললো: স্যর, আমি জানি আপনি আমাকে ধোঁকা দেবেন না। আপনার মনে কোন দুরভিসন্ধি নেই জেনেই আপনার জিম্মায় আজ সরল মনে এই সব মূল্যবান দলিলগুলো রেখে যাচ্ছি। আর এই কাজের জন্যে আমি আপনাকে ভালো পারিশ্রমিকও দিতে প্রস্তুত আছি। সামান্য একটা এটাচী কেস বয়ে নেবার জন্য দশ হাজার টাকা কী সামান্য টাকা? আর এই সব কাগজ নিয়ে আপনি কী করবেন। সামান্য কয়েকখানা হুণ্ডি যা আপনার কোন কাজেই লাগবে না।

আমি একটু হেসে জবাব দিলুম: ভয় পাবেন না গিদোয়ানী, কাল রাত দশটার সময় আমি আপনার এই এটাচী কেস ঠিকই পৌঁছে দেবো। আপনি

নিশ্চিন্ত মনে থাকুন। আমার কথার কোন খেলাপ হয় না।

আমার কথায় গিদোয়ানী বেশ নিশ্চিন্ত বোধ করে বললো : এই উপকারের জন্য ধন্যবাদ। বহুত, বহুত ধন্যবাদ।

আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে পর মুহূর্তেই বিদায় নিলে গিদোয়ানী। এটাচী কেসটা হাতে নেবার পর বেশ দায়িত্ব বোধ করলুম আমি। কোনদিন অপরিচিত কারও কাছ থেকে কোন মূল্যবান জিনিস গ্রহণ করিনি। আজ কেন জানিনে আমার মনে ভয় জাগলো। কেন? তা বুঝতে পারলুম না।

ভাবতে লাগলুম, এই ছোট কালো এটাচী কেসটার ভেতরে কী আছে? কিন্তু আমি সেই এটাচী কেসের গোপন রহস্য জানার কোন অবকাশই পেলুম না।

ট্রেন চলতে লাগলো। কিন্তু আমার সমস্ত চিন্তা ভাবনা পাক খেতে থাকলো সেই এটাচী কেসটা নিয়েই। কিছুতেই মন থেকে সেই চিন্তা দূর করতে পারলুম না।

সকাল দশটার সময় ট্রেন এসে থামলো শোনপুরে। প্ল্যাটফর্মের এক প্রান্তে ট্রেন এসে থামলো। আমি প্ল্যাটফর্মে নেমে পায়চারী করতে লাগলুম। হঠাৎ আমি দেখতে পেলুম ট্রেনের সামনে বিস্তর পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। পুলিশ? কেন? হয়তো পুলিশ কোন চোরকে পাকড়াবার জন্য এসেছে। ব্যাপারটা কী জানবার জন্যে আমি এক পুলিশ অফিসারের কাছে গেলুম। পুলিশ অফিসার আমার মিলিটারী পোশাক দেখে কুর্নিশ কেটে দাঁড়ালো।

: গুড মর্নিং স্যার, পুলিশ অফিসার বললে।

: গুড মর্নিং, কী ব্যাপার?

: আমরা একটা লোককে খুঁজছি।

: চোর?

: না।

: তবে কী বদমাস?

: না, তাও নয়। পলিটিক্যাল সাসপেক্ট।

'পলিটিক্যাল সাসপেক্ট' কথা দুটো আমার কানে কেমন বেসুরো লাগলো। কী ব্যাপার, কী ধরনের পলিটিক্যাল সাসপেক্ট জানবার ইচ্ছে হলো। জিজ্ঞেস করলুম : পলিটিক্যাল সাসপেক্ট? কী ধরনের পলিটিক্যাল সাসপেক্ট, অফিসার?

: স্পাই, আমরা একটি স্পাই-এর খোঁজ করছি।

'স্পাই' কথাটা শুনেই আমি যেন আকাশ থেকে পড়লুম। এবার বেশ একটু উত্তেজিত কণ্ঠেই বললুম : আপনার জবাব কিন্তু আমার বোধগম্য হচ্ছে না অফিসার। স্পাই? কী ধরনের স্পাই?

আমার কণ্ঠের উত্তেজনা তার কান এড়ালো না। পুলিশ অফিসারটি একটুও বিচলতা প্রকাশ না করে বললো: স্যার, কাল তেজপুর আর্মি হেড কোয়ার্টার থেকে কতকগুলো টপ সিক্রেট ডকুমেন্ট চুরি গেছে। সিগন্যাল ক্রম কোর কম্যাণ্ডার টু এরিয়া কম্যাণ্ডার—জেনারেল কল টু জেনারেল সেন। কোর কম্যাণ্ডার টু ডিফেন্স মিনিস্টার এ্যাণ্ড প্রাইম মিনিস্টার। শুধু গোপনীয় টেলিগ্রাম নয়। কোড বই, রোড ম্যাপ, বেস ক্যাম্পের নকশা এবং বর্ডার এরিয়া ম্যাপ। সব কাগজই জরুরী এবং মূল্যবান। আমরা খবর পেয়েছি চোর এই ট্রেনে ট্র্যাভেল করছে। তাই আমরা প্রতি কম্পার্টমেণ্টে চোরের খোঁজ করছি।

কেন জানিনে পুলিশ অফিসারের কথা শুনে আমার হাসি পেলো। এতো বড়ো ট্রেনে পুলিশ গরু খুঁজছে। চোরের নাম জানা নেই, পরিচয় জানা নেই। কী করে যে পুলিশ চোরকে খুঁজে বের করবে তা আমি ভেবেই পেলুম না। আমার মনের কৌতূহল অফিসারের কাছে প্রকাশ করলুম অকপটে। বললুম: আপনারা কী চোরকে দেখেছেন?

: না স্যার, কিন্তু আমরা জানি এইসব মূল্যবান কাগজ একটা কালো এটাচী কেসে ছিলো। চোর এ্যাটাচী কেসটি সঙ্গে নিয়ে গেছে। আমরা শুধু চোরকে নয়, এটাচী কেসটারও সন্ধান করছি।

হঠাৎ আমার গিয়োদানীর এটাচী কেসটির কথা মনে হলো। কালো এটাচী কেস, মূল্যবান কাগজ। কোনই সন্দেহ নেই যে গিদোয়ানী কালো এটাচী কেসটিতেই এই সব কাগজপত্র লুকানো আছে। ছপ্তি নয়। গিদোয়ানী আমাকে ধাপ্পা দিয়েছে। গিদোয়ানী জানতো পুলিশ তার সন্ধান করবে। তাই পুলিশের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যেই এটাচী কেসটি সে আমার হাতে তুলে দিয়ে সরে পড়েছে। আমি মিলিটারী লোক, ভারত সরকারের উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। পুলিশ আমার সঙ্গে কোন হাঙ্গামা করবে না। অতএব এটাচী কেসটিও বিনা হাঙ্গামায় নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছে যাবে। বুঝতে পারলুম গিদোয়ানী আমাকে বোকা বানিয়েছে। গিদোয়ানীর বুদ্ধির তারিফ করতে হলো। আমাকে যে এতো সহজে বোকা বানাতে পারবে এ আমি কখনই কল্পনা করিনি।

আমি ভাবতে লাগলুম, গিদোয়ানীর এটাচী কেসটা নিয়ে এখন কি করবো। পুলিশের হাতেই এটাচী কেসটা তুলে দেবো কী? আমি জানতুম, পুলিশ সহজে আমার কথা বিশ্বাস করতে চাইবে না।

অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করলুম পুলিশের কাছে কিছু প্রকাশ করাই হবে

মূর্খামির কাজ। পুলিশের কাছে কিছু বলতে গেলে ফাঁসীর দড়িটি এসে নিজের গলাতেই পেঁচিয়ে বসবে। তার চেয়ে বরং আগামী কাল রাতে যখন গিদোয়ানীর সঙ্গে মোলাকাত হবে তখন এ নিয়ে তার সঙ্গেই বোঝাপড়া করা যাবে। হয়তো একটু তর্ক-বিতর্ক করলে আমার প্রাপ্য টাকার অঙ্কটা আরও বাড়াতে পারবো। কিছুদিন থেকে টাকার বেশ টানাটানি যাচ্ছে। সরকারী মাইনেতে দিন গুজরাণ হচ্ছে না। আমার প্রমোশন বন্ধ। আগে আগে ফ্লাইং ডিউটি করে বেশ কিছু ফালতু টাকা আয় করতুম। কিন্তু এখন তাও বন্ধ। সত্যি কথা বলতে কী চাকুরীতে আমার বেশ অরুচি ধরে গেছে।

হয়তো গিদোয়ানী আমার আর্থিক অস্বচ্ছলতার কথাটা জানতো। তাই ইচ্ছে করে আমার কম্পার্টমেন্টেই সে ঢুকেছিলো। অনুমান করে নিয়েছিলো, কিছু টাকার লোভ দেখালেই আমি তার কাজে সাহায্য করবো। আমাকে প্রলোভিত করতে গিদোয়ানীর বেশী বেগ পেতে হয়নি।

আমার মনে গ্লানি এলো। ভেবে দেখলুম, অনেকটা পথ ইতিমধ্যেই এগিয়ে এসিছি। এখন আর পেছু ফেরা যায় না।

একটু বাদে পুলিশ এসে ঢুকলো আমার কম্পার্টমেন্টে। পুলিশ আমাকে জিজ্ঞেস করলো: স্যর, আপনার কামরায় কোন অপরিচিত লোক ঢুকেছিলো কী?

আমি অতি সংক্ষিপ্ত জবাব দিলুম: নো।

আপনাকে অনর্থক বিরক্ত করলুম, সরি স্যার।

পুলিশ চলে গেলো। কেন জানিনে আমার সমস্ত শরীরে এক শিহরণ বয়ে গেলো। 'নো' শব্দটি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই আমি যেন নিজেকে স্পাইং-এর কাজে জড়িয়ে ফেললুম। আমি একটি স্পাইকে গোপনীয় কাগজ চুরি করতে সাহায্য করেছি, অতএব আমিও হলুম একটি স্পাই।

এবার আমি নিজের মনে সাহস ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করলুম। বিপদের ঝুঁকি যখন একবার নিয়েছি তখন দেখাই যাক্ কতোটা দূর এগনো যায়।

ট্রেন আবার চলতে লাগলো। ট্রেন ছাড়বার পূর্ব মুহূর্তে জানতে পারলুম পুলিশ চোরকে ধরতে পারেনি। অর্থাৎ গিদোয়ানী পুলিশকে ফাঁকি দিয়েছে। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললুম।

এরপর সারাটা রাস্তা আমি আর নিশ্চিন্তে কাটাতে পারিনি। সব সময় গিদোয়ানীর কালো এটাচী কেসটার কথাই ভেবেছি। আমি যে আগুন নিয়ে খেলা করতে চলেছি, আমার মনে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিলো না। আমি ভাবলুম, দেশদ্রোহী মানিকলাল একবার পুলিশের হাতে ধরা পড়লে দীর্ঘকালের

জন্য তাকে জেলখানায় জীবন কাটাতে হবে।

ছাপরা-শাহারান-গোরখপুর পার হয়ে ট্রেন বিকেল চারটের সময় লখনউ পৌছল। প্ল্যাটফর্মে নেমে দেখতে পেলুম, সেখানেও বিস্তর পুলিশ এসে জড়ো হয়েছে স্টেশন প্ল্যাটফর্মে। অতি সন্তর্পণে সবার অজ্ঞাতে প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে এলুম।

একটা টাঙ্গা নিয়ে সেখান থেকে সোজা স্যাভয় হোটেলে চলে এলুম।

*　　　*　　　*

লখনউ শহর।

হোটেলে ঢুকেই রিসেপশন ক্লার্কের লকারে কালো এটাচী কেসটা জমা রাখলুম। রিসেপশন ক্লার্ক আমাকে জমার রসিদ দিলো। এবার একটু নিশ্চিন্ত বোধ করলুম আমি।

নিজের কামরায় ঢুকে স্নান করলুম। তারপর কফির পেয়ালা হাতে নিয়ে বসলুম। ভাবতে লাগলুম, আমার পরবর্তী কাজ কী?

একটু বাদেই সন্ধ্যা হবে। রাস্তায় বাতি জ্বলে উঠবে। গিদোয়ানীর সঙ্গে আমার মোলাকাতের নির্দিষ্ট সময় রাত দশটা। এখন থেকে দশটা পর্যন্ত বাকী সময়টা কী করে কাটাই তাই ভাবতে লাগলুম।

আরও ভাবতে লাগলুম, গিদোয়ানীর দেখা পেলে কী বলবো! যদি খুলে বলি তোমার এটাচী কেসে আছে সরকারী চোরাই মাল, কিংবা তুমি হলে স্পাই, তাহলে সে কী বলবে? যদি দশ হাজারেরও বেশী টাকা চাই, তাহলেই কী গিদোয়ানী আমাকে সে টাকা দিতে রাজী হবে? এই ধরনের চিন্তা করে করে আমার মাথা গরম হয়ে উঠলো।

ভাবলুম আবার, অনর্থক চিন্তা করে কী লাভ। ভাগ্যে যা লেখা আছে তা কেউ খণ্ডাতে পারবে না।

ভাবলুম, খানিকটা সময় পথে হাঁটা যাক। হাঁটলেই হয়তো মনের উত্তেজনাটা কমবে। আমি হোটেল থেকে বেরিয়ে এলুম।

আনমনে কতোক্ষণ হেঁটেছিলুম জানিনে। হয়তো ঘণ্টা দু'য়েক হবে। ঘড়ির পানে তাকালুম একবার। আটটা বাজে। এখনও দু' ঘণ্টা বাকী। কারণ গিদোয়ানী আমাকে স্পষ্টই বলেছিলো: স্যার, মাউন্ট হোটেলে ঠিক দশটায় দেখা হবে।

লখনউ-এর কফি হাউসে বসলুম। বেশ ভিড় হয়েছে সেখানে। এক কাপ কফির অর্ডার দিয়ে সেখানে বসে কিছু সময় কাটাবার চেষ্টা করলুম।

কিন্তু যতোই সময় কাটতে লাগলো আমার মনের উত্তেজনা একটুও প্রশমিত

না হয়ে ততোই যেন বাড়তে লাগলো। কফির কাপ হাতে নিয়ে দেখলুম, আমার হাত তখন কাঁপছে। মন স্থির করে সে উত্তেজনার হাত থেকে রেহাই পাবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু মনের অস্থিরতার হাত থেকে রেহাই পাওয়া সহজ কথা নয়। বিশেষ করে যখন জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে হয়।

প্রায় সাড়ে ন'টায় বেরিয়ে এলুম কফি হাউস থেকে। পথে নেমে একটা টাক্সা নিয়ে চলে এলুম মাউন্ট হোটেলে। কিন্তু সেখানে এসে যখন পেঁছিলুম তখনো দশটা বাজতে প্রায় দশ মিনিট বাকী।

এবার পকেট থেকে একটা কালো চশমা বের করলুম। ঠিক করলুম রিসেপশন ক্লার্ককে আমার চোখ দেখতে দেবো না। রাত্রি বেলায় কালো চশমা পরলে হয়তো কারও মনে সন্দেহ জাগতে পারে—। কিন্তু আজ আমি নিরুপায়। কোন প্রকারেই নিজেকে কারও কাছে ধরা দিতে চাইনে। ধরা পড়লে আমার জীবনে যে কী ঘটবে সে কথা কল্পনা করতেও ভয় হয়।

*　　　*　　　*

রিসেপশন ক্লার্ককে গিয়ে বললুম : মিঃ গিদোয়ানী প্লিজ।

রিসেপশন ক্লার্ক কিন্তু আমার মুখের দিকে না তাকিয়েই বললো : রুম ১০৬।

আমি এবার সোজা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলুম। লিফ্‌টে চেপে গেলুম না, পাছে কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যায় সেই ভয়ে।

সিঁড়ির শেষে লম্বা করিডর। করিডরে শেষ প্রান্তে রুম নম্বর ১০৬। করিডর আলোয় অন্ধকারে ঢাকা। তাই বেশ একটু সতর্ক হয়ে হাঁটতে লাগলুম।

রুম নম্বর ১০৬-এর দরজায় এসে দেখলুম, দরজাটা আধ ভেজানো। ঘরে বাতি জ্বলছে। হয়তো গিদোয়ানী আমার জন্যে প্রতীক্ষা করছে। আমি দরজায় টোকা দিলুম। কিন্তু ঘর থেকে কোন জবাব পেলুম না। এবার বেশ একটু জোরেই দরজায় ধাক্কা দিলুম। কিন্তু এবারেও কোন জবাব মিললো না। এবার জোর গলায় ডাক দিলুম : মিঃ গিদোয়ানী, আমি মানিকলাল।

চুপচাপ নীরব নিস্তব্ধ ঘর। এই ঘরে যে কোন মানুষ আছে ভাবা যায় না। আমি দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলুম।

কিন্তু ঘরে ঢুকতেই, ঘরের ভেতরের দৃশ্য দেখে আমার শরীর যেন বরফ হয়ে গেলো। সেই আতঙ্কের দৃশ্যটা বহুদিন আমার মনে গাঁথা থাকবে। দেখতে পেলুম, একটা বিছানায় মিঃ গিদোয়ানীর মৃতদেহ পড়ে আছে। গলাকাটা দেহ। প্রচুর রক্তপাতে বিছানা ভিজে গেছে। এলোমেলো বিছানা। বুঝতে

অসুবিধে হলো না যে গিদোয়ানীকে খুন করা হয়েছে। খুন করার আগে আততায়ীর সঙ্গে যে গিদোয়ানীর বেশ কিছুটা ধস্তাধস্তিও হয়েছে, তাও বুঝতে পারলুম।

আমি এবার গিদোয়ানীর মৃতদেহের কাছে এগিয়ে গেলুম। তার শরীর তখনও বেশ গরম ছিলো। মনে হলো, হয়তো আধ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা মাত্র আগে ওকে খুন করা হয়েছে।

দেখলুম গিদোয়ানীর চোখে মুখে আতঙ্কের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। হয়তো মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেই গিদোয়ানী আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলো। কেন ?

এতো সব চিন্তা করার মতো মানসিক অবস্থা তখন আমার ছিলো না। এই আতঙ্কের দৃশ্যটা দেখেই শরীর অবশ হয়ে পড়েছিলো। মনে হলো আমার দেহের রক্ত চলাচলও যেন স্তব্ধ হয়ে গেলো।

এবার আমি ঘরের চারদিকে একবার তাকালুম। এলোমেলো বিশৃঙ্খল ঘর। নিশ্চয় কেউ গিদোয়ানীর বাক্স-প্যাটরা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে। কিন্তু যে জিনিসের সন্ধানে এসেছিলো তা হয়তো খুঁজে পায়নি।

আমি এবার গিদোয়ানীর জামার পকেটে হাত দিলুম। পকেটের ভেতরে ছিলো কতকগুলি কাগজ ও এক তাড়া নোট। প্রায় পঁচিশ হাজার টাকার নোট। এতো টাকার কী প্রয়োজন ছিলো গিদোয়ানীর ? আমার প্রাপ্য ছিলো দশ হাজার টাকা। বাকী টাকাটা কার জন্যে ? আমার মনে হলো আজ সন্ধ্যায় হয়তো গিদোয়ানীর অন্য কারুর সঙ্গেও দেখা করার কথা ছিলো। কে সেই লোক ? কোন ইনফরমার না ক্যুরিয়ার ?

গিদোয়ানীর পকেটের ভেতর ছিলো কতকগুলো বিশেষ জরুরী গোপনীয় কাগজ। ভারত সরকারের সিল করা টপ সিক্রেট এবং কনফিডেনশিয়াল কাগজ। কাগজগুলো অবশ্য সবই ফোটো কপি। সবই তেজপুর মিলিটারী হেড কোয়ার্টার থেকে চুরি করা। একটা কাগজে কতকগুলো সিক্রেট ফাইলের নম্বর। আর একটা কাগজে ছিলো ভারতীয় মিলিটারী মিশনের আমেরিকা সফরের বিস্তৃত বিবরণী। আর ছিলো নেফা অঞ্চলের রাস্তার একটা ম্যাপ। রেলওয়ে লাইনের নকশা। কাগজগুলোর সবই ছিলো অত্যন্ত গোপনীয় ব্যাপার-সংক্রান্ত বিষয়ের কাগজ।

বুঝতে পারলুম, আমার ট্রেনের সহযাত্রী মিঃ গিদোয়ানী বেশ গুরুত্বপূর্ণ সব কাগজপত্রের বেচাকেনার কাজ করতো। হুণ্ডিতে টাকা লেন-দেনের চেয়েও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিলো তার কাজ।

আমি এবার জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম। জানালা দিয়ে জনমানবহীন

রাস্তাটা দেখা যায়। নীরব নিস্তব্ধ ছিলো রাস্তাটা।

কী উপায়ে এখন এই হোটেলটা থেকে বের হওয়া যায় সেই কথা ভাবলুম এবার।

ভাবতে লাগলুম কী করা যায়, কী করে এই বিপদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারি। হঠাৎ বাইরের করিডরে যেন কারও পদধ্বনি শুনতে পেলুম। বুঝতে পারলুম, কেউ হয়তো গিদোয়ানীর সঙ্গেই দেখা করতে এসেছে। ঘড়ির পানে তাকিয়ে দেখলুম রাত প্রায় সাড়ে দশটা হয়েছে। হয়তো এই লোকটার জন্যই গিয়োদানী তার পকেটের বাকী পনেরো হাজার টাকা রেখেছিলো।

আমার সন্দেহ অমূলক ছিলো না। কারণ হঠাৎ আমি দরজা খোলার শব্দ পেলুম। দেখতে পেলুম এক মধ্যমবর্ষীয় ভদ্রলোক ঘরের ভিতরে ঢুকছেন। তার গায়ে ছিলো লম্বা ওভারকোট। ভদ্রলোকও মৃতদেহের কাছে এগিয়ে গিয়ে তার পকেটে হাত পুরে দিলেন। একবার নয়, দু'বার নয়, বারবার তিন বার তার পকেটে হাত দিয়ে কিছু খুঁজলেন। কিন্তু পকেটে সামান্য কাগজেরও সন্ধান না পেয়ে তার মুখে একটা বিরক্তির ভাব ফুটে উঠলো।

লোকটি এবার গিদোয়ানীর বাক্স-প্যাট্‌রা খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও কিছুই খুঁজে পেলেন না।

: কিছু পেলেন সমাদ্দার? বাইরে থেকে আসা এক মেয়েলি কণ্ঠের প্রশ্ন শুনতে পেলুম এবার।

: নো, নাথিং মিসেস সেন, নাথিং। আশ্চর্য! এতো অল্প সময়ের ভেতর সব কিছুটা হাওয়া হয়ে গেলো! না মিসেস সেন, আমাদের আসতে দেরী হয়ে গেছে। নাউ লেট আস গো।

আমি বুঝতে পারলুম ভদ্রলোকের নাম সমাদ্দার আর তার সহকর্মী মহিলাটির নাম মিসেস সেন।

ওরা চলে যাবার পর আমি ব্যালকনির জানলা ও জলের পাইপ বেয়ে নীচে নামলুম। হলঘর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসবার সাহস হলো না।

একটু বাদেই আমি রাস্তায় এসে দাঁড়ালুম। নির্জন রাস্তা। ধারে-কাছে কোথাও কোন ট্যাক্সি বা টাঙ্গা পেলুম না। আমি নির্জন রাস্তায় দৌড়তে শুরু করলুম।"

* * *

খানিকটা দৌড়োবার পর আমি বেশ ক্লান্ত বোধ করলুম। নির্জন রাস্তায় দৌড়োবার একটা বিপদও ছিলো। হয়তো কারুও দৃষ্টি আকর্ষণ করে ফেলতুম। কারও মনে হয়তো সন্দেহ জাগতো যে আমি কিছু চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছি।

হঠাৎই একটা টাঙ্গার দেখা পেলুম রাস্তায়। টাঙ্গায় উঠেই টাঙ্গাওলাকে বললুম: স্যাভয় হোটেল। কেন জানিনে টাঙ্গাওলা আমার মুখের পানে বেশ কঠোর দৃষ্টিতে তাকালো। আমার মনে হলো লোকটি আমাকে সন্দেহ করেছে।

টাঙ্গাটা অতি ধীরে ধীরে চলতে শুরু করলো। তখন প্রতিটি মুহূর্তই আমার কাছে এক একটা প্রহরের মতো দীর্ঘ বলে মনে হচ্ছিলো। আমি হোটেলে পৌঁছবার জন্য যেন ব্যাকুল হয়ে পড়লুম। রাত প্রায় এগারোটায় আমি আবার হোটেলে ফিরে এলুম।

রিসেপশন ক্লার্ক বেশ কিছু সময় পর্যন্ত আমার পানে তাকিয়ে রইলো। কি দেখলো বলতে পারবো না। তবে হয়তো তখনো আমার মুখের ভাবে কোন উত্তেজনার চিহ্ন ছিল চুলগুলো ছিলো এলোমেলো। তাই তার দৃষ্টি পড়েছিলো আমার দিকে।

নিজের ঘরে গিয়ে গরম জল দিয়ে বেশ ভালো করে স্নান করলুম। তারপর দেহ এলিয়ে দিলুম বিছানায়। ঘুমোবার চেষ্টা করলুম খানিকটা। কিন্তু ঘুম এলো না।

হঠাৎ আমার ঘরের টেলিফোনটি তীব্র ও কর্কশ শব্দে বেজে উঠলো। টেলিফোনটা হাতে নিয়ে কানে লাগালুম। রিসেপশন ক্লার্কের গলা পেলুম টেলিফোনে। সে বললো: টেলিফোন সাব।

এতো রাত্রে লক্ষ্ণৌ শহরে আমাকে কে স্মরণ করতে পারে ভেবে পেলুম না। পুলিশ? তারা কী এর মধ্যেই গিদোয়ানীর মৃত্যুর খবর পেয়েছে? আর তারা আমাকে টেলিফোনই বা করবে কেন। সোজা এসে হোটেলেই আমার সঙ্গে দেখা করতে পারতো। টেলিফোন করার কোন দরকার হতো না।

মনে হলো গিদোয়ানীর পরিচিত কোন বন্ধু হয়তো আমাকে টেলিফোন করেছে। হয়তো গিদোয়ানীর এই বন্ধু আমার কথা জানতো। হয়তো জানতো যে গিদোয়ানী তার এটাচী কেসটা আমার কাছেই জমা রেখেছিলো। সে কী করে জানলো যে আমি স্যাভয় হোটেলে আছি? আমার ঠিকানা তো আমি এ পর্যন্ত কাউকেই জানাই নি।

চিন্তা করে বিষয়টার কোন কূল কিনারা করার আগেই আমি টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে বেশ ফাশ-ভারী কণ্ঠস্বরে আমার নিজের নাম শুনতে পেলুম। টেলিফোনে আমার নাম ধরে ডাক শুনেও আমি চুপ করে রইলুম। কেন জানিনে কোন জবাব দিতে শুধু সংকোচ নয়, একটু ভয়ও হলো।

আবার তারের অপর প্রান্ত থেকে কথা ভেসে এলো,

: মানিকলাল, তোমার সঙ্গে আমার খুব জরুরী কথা আছে।

: কী কথা? আমি অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করলুম।

: মানিকলাল, আমরা গিদোয়ানীর বন্ধু। তোমার সঙ্গে এই মুহূর্তেই কথা করতে চাই।

গিদোয়ানী কে? আমি জিজ্ঞেস করলুম।

অপর প্রান্ত বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বললো: তোমার গত রাত্রের ট্রেনের সহযাত্রী। আজ সন্ধ্যার সময়ে যার মৃতদেহ তুমি মাউন্ট হোটেলে দেখে এসেছো। মানিকলাল, আমাদের হাতে সময় নেই। বাজে প্রশ্ন করে সময় নষ্ট করো না। অনেক জরুরী কথা আছে।

আপনাদের কথার খানিকটা আভাস দিন? অপরিচিত কারুর সঙ্গে আমি গভীর রাত্রে দেখা করা নিরাপদ মনে করি না। আমি জবাব দিলুম।

গিদোয়ানীর ঘর থেকে তুমি যে মাল চুরি করে এনেছো আমরা সেই মালগুলো চাই। আর জানতে চাই, গিদোয়ানীর এটাচী কেসটি এখন কোথায়?

: আপনারা অনর্থক সময় নষ্ট করছেন। আমি গিদোয়ানীকে চিনিনে আমি বললুম।

: বোকামি করো না মানিকলাল। এই সামান্য বোকামির জন্যই হয়তো ভয়ানক বিপদে পড়বে। যাক, আমরা তোমার জন্যে কোন বিপদ সৃষ্টি করতে চাইনে। তোমার সঙ্গে অবিলম্বে দেখা করা আমাদের একান্ত আবশ্যক।

আমি বেশ খানিকক্ষণ ভাবলুম কী জবাব দেবো। দেখা করলে হয়তো গিদোয়ানীর মৃত্যুরহস্যের খানিকটা জানতে পারবো। আর দেখা না করলে হয়তো কোন গুরুতর বিপদ জালে জড়িয়ে পড়তে পারি।

অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করলুম, না দেখা করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। বললুম: বেশ দেখা করবো, কিন্তু কোথায়? কখন?

: লখনউ রেলওয়ে স্টেশনের রেস্তোরাঁয় আমরা তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো। এখন রাত বারোটা বাজে। ঠিক সাড়ে বারোটার সময় পাঞ্জাব মেল আসবে। তুমি সেই সময়ে প্ল্যাটফর্মে টিকিট কেটে ঢুকবে। তারপর সোজা রেস্তোরাঁয় চলে আসবে। ঘরের শেষের টেবিলে আমরা দু'জনে বসে থাকবো। আমার সঙ্গে থাকবেন এক ভদ্রমহিলা। অতএব আমাদের চিনতে তোমার একটুও অসুবিধে হবে না। যাক্, আসতে দেরী করো না। দেখা হলে সব বলবো। গুড নাইট।

অপর প্রান্তে টেলিফোন ছেড়ে দিলো। হঠাৎ আমার মনে হলো, এই কণ্ঠস্বর

যেন আগে কোথায় শুনেছি। আজই! কোথায়? আমার চিন্তা শক্তি প্রখর হয়ে উঠলো। মাউন্ট হোটেলে যখন আমি গিদোয়ানীর বাথরুমে দাঁড়িয়ে ছিলুম তখন এই গলাই শুনেছিলুম।

এ হলো সমাদ্দারের গলা। না, তার কণ্ঠস্বর চিনতে আমি একটুও ভুল করিনি। কিন্তু ভদ্রমহিলা কে? নিশ্চয় মিসেস সেন।

* * *

এবার সমস্ত ঘটনা আমার কাছে স্বচ্ছ সরল হলো। বুঝতে পারলুম, সমাদ্দারই আজ রাতে গিদোয়ানীর কাছে থেকে কোন মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য ডকুমেণ্ট সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে গিদোয়ানীকে মৃত অবস্থায় দেখতে পান। তারপর তার পকেট ও বাক্স-প্যাঁটরা খুঁজে সেই সব কাগজপত্রের সন্ধান করেন, কিন্তু কিছুই পান নি।

সমাদ্দার কী করে সন্ধান পেলেন যে, আমি স্যাভয় হোটেলে আছি। কেউই একথা জানতো না যে আমি লখনউ-এর কোথায় উঠেছি। কারও কাছে আমি আমার হোটেলের নাম বলিনি। আমার মন বলতে লাগলো, সমাদ্দার কিংবা তার কোন কেউ স্টেশন থেকেই হয়তো আমার পেছু নিয়েছিলো।

নির্দিষ্ট সময়ে লখনউ স্টেশনে পৌছলাম। আমি প্ল্যাটফর্মে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাব মেলও হুড়মুড় করে প্ল্যাটফর্মে ঢুকলো। ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীদের ভেতর থেকে গুঞ্জন উঠলো। অতএব আমি জনতার দৃষ্টি এড়িয়ে স্টেশনের রেস্তোরাঁয় ঢুকলুম।

আমি ভুল অনুমান করিনি। আজই রাত দশটায় মাউন্ট হোটেলে যে ভদ্রলোককে দেখেছিলুম গিদোয়ানীর ঘরে তাকেই আবার দেখতে পেলুম রেস্তোরাঁয় ঢুকে। রেস্তোরাঁর এক প্রান্তে তিনি বসেছিলেন। তার সঙ্গে ছিলেন এক ভদ্রমহিলা। নিশ্চয় মিসেস সেন তার নাম।

ভদ্রলোক আমাকেই দেখেই উঠে দাঁড়ালেন। দু'পা এগিয়ে প্রশ্ন করলেন,

: মানিকলাল?

: হ্যাঁ।

: আমার নাম সমাদ্দার। আমাদের সহকর্মী ওই ভদ্রমহিলা মিসেস সেন।

আমি চুপ করে রইলুম। একবারও প্রকাশ করলুম না যে আজই তাকে আর একবার আমি মাউন্ট হোটেলে গিদোয়ানীর ঘরে দেখেছি। শুধু অতি সংক্ষিপ্ত জবাব দিলুম: আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশী হলুম। এবার বলুন, এই গভীর রাতে হঠাৎ লখনউ স্টেশনে আমাকে তলব করলেন কেন?

আমার প্রশ্ন শুনে সমাদ্দার একটু হাসলেন। আমার দিকে একটা চেয়ার

এগিয়ে দিয়ে বললেন : বসো। মাপ করো, তোমাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করছি বলে। বয়সে তুমি আমার থেকে অনেক ছোট। তাই তোমাকে 'তুমি' বলেই ডাকছি।

এবার আমি মিসেস সেনের পানে তাকালুম। স্বীকার করতে হলো, মিসেস সেন অপূর্ব সুন্দরী। তার সুগঠিত দেহের লাবণ্য যে-কোন পুরুষকেই আকর্ষণ করবে। সেদিন, সেই মুহূর্তেই আমি মিসেস সেনের রূপে মুগ্ধ হয়েছিলুম।

: চা না কফি? সমাদ্দার প্রশ্ন করলেন।

: কফি। ব্ল্যাক কফি, আমি বললুম।

ওয়েটারকে কফির অর্ডার দিয়ে সমাদ্দার কথা বলতে শুরু করলেন.

: আমাকে দেখে নিশ্চয় অবাক হয়েছো? কিন্তু আজ সারাটা দিনই তো অনেক উত্তেজনার ভেতর দিয়ে তোমার সময় কেটেছে। তাই ভাবলুম, গভীর রাত্রিতেও তোমাকে আরও খানিকটা অবাক করে দেয়া যাক।

ভাবছো কী করে জানলুম যে তুমি স্যাভয় হোটেলে আছো? বেশ, শোন তাহলে, প্রথম থেকেই আমার কাহিনী শুরু করা যাক।

মানিকলাল, কাল কাটিহার স্টেশন থেকে পাঠানো গিদোয়ানীর একটা তার পেয়েছিলুম। সেই তারবার্তায় সে আমাদের জানিয়েছিলো যে, মাল তোমার হাতে পাচার করেছে। আরও লিখেছিলো, লখনউ স্টেশনে তোমার ওপরে একটু নজর রাখতে।

তুমি এসে পৌঁছবার একটু বাদেই অন্য একটা এক্সপ্রেস ট্রেনে গিদোয়ানীও এসে পৌঁছল লখনউ-এ

: আপনারা যে গিদোয়ানীর বন্ধু তার কোন প্রমাণ তো এখনও দেননি? আমি বেশ একটু কৌতূহলী হয়েই জিজ্ঞেস করলুম।

আমার কথা শুনে সমাদ্দার আবার একটু মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন : মানিকলাল, তুমি নেহাৎ ছেলেমানুষ। আমরা প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে হাজার বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছি। তাই অতি সতর্ক হয়েই আমরা কাজ করি। মানিকলাল, তুমি কে, কী তোমার জীবন ইতিহাস, সবই আমাদের জানা। যাক্, বাজে কথা বলে তোমার মন ভারাক্রান্ত করতে চাইনে। আমরা যে গিদোয়ানীর বন্ধু তার সব চাইতে বড়ো প্রমাণ হলো এই যে, আমরা জানি যে আজ সন্ধ্যায় তুমি মাউন্ট হোটেলে যাবার আগেই গিদোয়ানীকে খুন করা হয়েছিলো। আমরা জানি যে, গিদোয়ানী তোমার কাছে একটি কালো এটাচী কেস জমা রেখেছিলো। আরও জানি যে, গিদোয়ানী তোমাকে কথা দিয়েছিলো যে, এই এটাচী কেসটি বয়ে নেবার জন্যে সে তোমাকে দশ হাজার টাকা পারি-

প্রমিক দেবে। এখনও কী বিশ্বাস করতে পারছো না যে আমরা গিদোয়ানীর বন্ধু ?

: আপনারা ঠিক জানেন যে গিদোয়ানীর মৃত্যু হয়েছে ? আমি জিজ্ঞেস করলুম।

: মৃত্যু নয়, বলো খুন করা হয়েছে। আর গিদোয়ানীর হত্যাকারী কে জানো ? আমাদেরই এক সাগরেদ আজ রাত সাড়ে নটার সময়ে গিদোয়ানীকে হত্যা করেছে। মানিকলাল, পুলিশ কালই তদন্ত করতে গিয়ে জানতে পারবে যে তুমি গিদোয়ানীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে। অথচ আমাদের যে সাগরেদ ওকে খুন করে এলো পুলিশ তার কথা মোটেই জানতে পারবে না। কারণ, আমাদের সেই সাগরেদটি তোমার মতো একতলার হলঘরের ভেতর দিয়ে সেখানে প্রবেশ করেনি।

: গিদোয়ানীকে খুন করেছে আমাদেরই লোক। আপনি কী বলছেন মিঃ সমাদ্দার ? মিসেস সেন বেশ উত্তেজিত কণ্ঠে এই প্রশ্ন করলেন। আমিও তার কণ্ঠস্বরের সঙ্গে স্বর মেলালুম।

সমাদ্দার আমাদের প্রশ্নে বা কণ্ঠস্বরে একটুও বিচলিত হলেন না। নির্লিপ্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন : হ্যাঁ, গিদোয়ানীর মৃত্যুর জন্যে আমি খুবই দুঃখিত মিসেস সেন। ঘটনার পরিস্থিতি এমনই হয়ে পড়েছিলো যে, আমাদের একান্ত প্রয়োজনেই গিদোয়ানীকে এই সংসার থেকে চিরদিনের জন্য সরিয়ে দেওয়ার দরকার হয়ে পড়েছিলো। আপনি জানেন মিসেস সেন, আজ মাস খানেক হলো পুলিশ গিদোয়ানীর পেছু নিয়েছিলো। প্রকাশ্যে সবাই জানতো গিদোয়ানী ছিলো মানি লেণ্ডার। শুনুন, তেজপুরের মতো কোন ছোট শহরে গুপ্ত খবর সংগ্রহ করার জন্য আপনি যদি টাকা বিতরণ করা শুরু করেন তাহলে নিশ্চয় আপনি ভারত সরকারের বড়ো কর্তাদের আকর্ষণ করবেন। অতএব খবর সংগ্রহ করার জন্য গিদোয়ানী এক নতুন পন্থা অবলম্বন করেছিলো। সে মুফতে টাকা না বিলিয়ে মানি লেণ্ডিং-এর ব্যবসা ধরলো। আসলে গিদোয়ানী কাউকে টাকা ধার দিতো না। কেউ তার কাছে গুপ্ত খবর বিক্রি করলে তাকে টাকা দিতো। এমনি করে বেশ কিছুদিন পর্যন্ত গিদোয়ানী পুলিশের নজর এড়িয়ে চললো। মানি লেণ্ডিং তো আর বে-আইনী ব্যবসা নয় ! কিন্তু টাকা দিয়ে ভারত সরকারের গুপ্ত খবর কিনলে অবশ্যই আপনাকে হাজত খাটতে হবে।

কিন্তু তবু এই যুদ্ধের পর গিদোয়ানী পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। চার দিন আগে হঠাৎ একদিন জেনারেল কলের দপ্তর থেকে কতকগুলো জরুরী গোপনীয় কাগজ চুরি গেলো। অনেক খোঁজাখুঁজির পরে জানা গেলো যে,

আমাদের মানি লেণ্ডারটিকে তেজপুরের মিলিটারী ক্যাম্পের আশেপাশে ঘুরতে দেখা গিয়েছিলো। সেই মুহূর্ত থেকেই পুলিশ গিদোয়ানীর খোঁজ করা শুরু করেছে। গিদোয়ানী তেজপুর থেকে পালালো আর পালাবার সময় এই এটাচী কেসটা সঙ্গে করে নিয়ে এলো। আমাদের কারও কাজে যদি একবার পুলিশের দৃষ্টি পড়ে তাহলে সেই এজেন্ট একেবারেই কাজের অযোগ্য হয়ে যায়। অতএব যেদিন থেকে পুলিশ গিদোয়ানীর পেছু নিলো সেদিন থেকেই আমাদের কাছে গিদোয়ানী হয়ে গেলো মূল্যহীন। এই মূল্যহীন এজেন্ট গিদোয়ানী জীবিত থাকলে অকারণেও আমাদের বিপদে পড়বার সম্ভাবনা ছিলো।

কিন্তু আজকের কাজে আমরা এক মারাত্মক ভুল করেছিলুম। আমার সাগরেদকে পাঠিয়েছিলুম গিদোয়ানীর কাছ থেকে এটাচী কেস এবং অন্যান্য মূল্যবান কাগজগুলো সংগ্রহ করে আনতে। এবং লোকটিকে বলেছিলুম রাত বারোটার পরে সেখানে যেতে। আরও বলেছিলুম যে, এটাচী কেস ও কাগজগুলো সংগ্রহ করার পরে যেন তাকে হত্যা করা হয়। কিন্তু আমাদের গর্দভ সাগরেদটি সেখানে গেলো রাত সাড়ে নটার সময়। তখনও মানিকলাল এটাচী কেসটা গিদোয়ানীর হাতে তুলে দেয়নি। অথচ এই সময়েই আমাদের লোকটি এটাচী কেসটা না পেয়েও গিদোয়ানীকে খুন করলো।

আমাদের লোকের মুখে খবর পেয়েই আমি মিসেস সেনকে নিয়ে ছুটে গেলুম মাউন্ট হোটেলে। কারণ, গিদোয়ানীর কাছেও কতকগুলো মূল্যবান কাগজ ছিলো। আমরা তন্ন তন্ন করে ওর পকেট ও বাক্স-প্যাঁটরা খুঁজলুম। কোথাও সেই কাগজগুলো পেলুম না। হঠাৎ আমার মানিকলালের কথা মনে পড়লো। ঠিক দশটার সময় গিদোয়ানীর সঙ্গে তার দেখা করার কথা ছিলো। ভাবলুম, হয়তো মানিকলাল সেখানে গিয়ে গিদোয়ানীকে মৃত অবস্থায় দেখতে পেয়েছিলো এবং হয়তো সে-ই তার পকেট থেকে সেই সব কাগজপত্রগুলো সরিয়ে নিয়ে গেছে। তাই আজ তোমাকে অনুরোধ করছি মানিকলাল, গিদোয়ানীর বুক পকেটের যে সব কাগজ তুমি বের করে নিয়েছো, সেগুলো আমাদের হাতে ফেরত দাও। আর আমরা ফেরত চাই গিদোয়ানীর সেই কালো এটাচী কেসটাও।

: ধরুন, এ দুটি জিনিস যদি আমি ফেরত না দিই।

তাহলে অনর্থক নিজের জীবনে বিপদ ডেকে আনবে। মানিকলাল, আমরা তোমার সহযোগিতা চাই। মনে রাখবে আইনের চোখে, ভারত সরকারের দৃষ্টিতে এখন তুমি হলে একটি চোর। যে মুহূর্তে গিদোয়ানীর হাত থেকে কালো এটাচী কেসটি নিজের হাতে নিয়েছো, সেই মুহূর্তে তুমি এই এটাচী কেসটি

আবার ভারত সরকারের হাতে তুলে দিতে অস্বীকার করেছো, সেই মুহূর্ত থেকেই তুমিও হলে দেশদ্রোহী, স্পাই। না, আজ তোমার শরীরেও কলঙ্কের দাগ এসে লেগেছে। এই মুহূর্তে আমি পুলিশকে এই খবর জানিয়ে দিতে পারি যে, তুমি আজ রাত দশটায় গিদোয়ানীর ঘরে গিয়েছিলে। পোস্ট মর্টেমে জানা যাবে যে, ঠিক ওই সময়েই খুন হয়েছে গিদোয়ানী। এবার এর পরের অবস্থাটা ভেবে দেখো। দুই-এ দুই এ চার মিলিয়ে নিতে ভুল করবে না পুলিশ।

না মানিকলাল, অতো সহজে তুমি আমাদের হাত থেকে রেহাই পাবে না। যদি আমাদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করো তাহলেই হবে তোমার মঙ্গল। আমাদেরও সুবিধে হবে সেই ব্যবস্থায়। নাউ, লেট আস ওয়ার্ক টুগেদার। লেট আস কোলাবরেট টুগেদার। এবার বলো, গিদোয়ানীর বুক পকেটে তুমি কী পেয়েছো?

আমি ভাবলুম, কী জবাব দেবো। গিদোয়ানীর বুক পকেট থেকে কী পেয়েছি স্বীকার করতে খানিকটা দ্বিধা হলো। তাই শুধু বললুম: মিঃ সমাদ্দার, গিদোয়ানীর বুক পকেটে যে সব কাগজ পেয়েছি তার সব কিছুরই ওপরে লেখা ছিলো কনফিডেনশিয়াল। আর এটাচী কেসের ভেতর কী আছে তা আমার জানা নেই। কারণ, এটাচী কেসটা খুলবার কোন অবকাশ এ পর্যন্ত আমি পাইনি। আর পেয়েছিলাম একটা ভিজিটিং কার্ড।

: ভিজিটিং কার্ড! লখনউতে গিদোয়ানীর কোন বন্ধু আছে এমন খবর তো আমার জানা ছিলো না?

: বন্ধুর ভিজিটিং কার্ড নয়, মিঃ সমাদ্দার। এ কার্ড হলো পাকিস্তান হাই কমিশনের মিলিটারী এটাচীর কার্ড। ভদ্রলোকের নাম ব্রিগেডিয়ার আব্বাস।

আমার কথা শুনে সমাদ্দার একটু হাসলেন। তার মুখ দেখে মনে হলো না যে উনি খুব বেশী বিচলিত হয়েছেন। তারপর আমাকে আশ্বস্ত করার জন্য বললেন: গিদোয়ানী একটি সোয়াইন। লখনউতে এসেই ব্রিগেডিয়ার আব্বাসের সঙ্গে দেখা করেছে।

গিদোয়ানীর পকেটে আমি যে পঁচিশ হাজার টাকা পেয়েছিলুম সেই কথাটা আর বললুম না। নিজের মনে মনেই ঠিক করে রেখেছিলুম যে, আমার পারিশ্রমিক বাবদে দশ হাজার টাকা রেখে দিয়ে বাকী টাকাটা খামে ভরে গিদোয়ানীর নামে মাউন্ট হোটেলে পাঠিয়ে দেবো। কাল কিম্বা পরশু তদন্ত করতে গিয়ে পুলিশ সেই খামটি উদ্ধার করবে। আমার প্রাপ্য টাকা আমি পাবো আর বাকী টাকাটা পাবে গিদোয়ানীর উত্তরাধিকারী।

: মানিকলাল, কালো এটাচী কেসটা আমাদের চাই-ই, বেশ দৃঢ় কণ্ঠে

সমাদ্দার আমাকে বললেন।

: মাপ করবেন মিঃ সমাদ্দার। আপনি নিশ্চয় জানেন যে, সেই কালো এটাচী কেসটি আমার সঙ্গে নেই। আমার জবাবে ছিলো কৈফিয়তের সুর।

: সে কথা আমরা বিলক্ষণ জানি, সমাদ্দার বললেন,— কারণ এই খানিকক্ষণ আগে আমাদের লোকেরা তোমার ঘর সার্চ করে এসেছে। কিন্তু তারা কিছুই পায়নি সেখানে। তাই তোমাকেই জিজ্ঞেস করছি, সই কালো এটাচী কেসটা কোথায়? সমাদ্দারের কণ্ঠে এবার একটু আদেশের সুর ধ্বনিত হলো।

: এটাচী কেসটা নিরাপদেই আছে আপনি সেজন্য চিন্তা করবেন না, আমি জবাব দিলুম। কারণ আমার মন বলতে লাগলো যে, স্পষ্ট জবাব না দিলে সমাদ্দারের হাত থেকে রেহাই পাবো না। প্রথমে ভেবেছিলুম একটা মনগড়া কথা বলবো। কিন্তু পরে ভেবে দেখলুম, মিথ্যে কথা বললে বিপদ আরো বাড়তে পারে। বর্তমানেই অনেক ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে আছি। এ সময়ে মনের দুশ্চিন্তা আর বাড়িয়ে লাভ নেই। অনেক চিন্তা ভাবনার পর ঠিক করলুম যে, সত্যি কথা বলাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

মিঃ সমাদ্দার, কালো রংয়ের সেই এটাচী কেসটা আমি হোটেলের লকারে জমা রেখেছি।

: রসিদ কোথায়? রসিদ দাও। আমার লোক গিয়ে এখুনি হোটেল থেকে নিয়ে আসবে।

: মাপ করবেন, হোটেলের কর্তারা আপনার লোকের হাতে সে এটাচী কেস দেবে না। আপনারা যদি এই মুহূর্তেই সেটা ফেরৎ চান তাহলে আমাকে একবার হোটেলে ফেরত যেতে দিন। আমি নিজে গিয়েই হোটেলের লকার থেকে এটাচী কেসটা নিয়ে আসবো, আমি জবাব দিলুম।

: এটাচী কেসের চাইতে আমার বেশী প্রয়োজন হলো গিদোয়ানীর বুক পকেটের কাগজগুলো। ওর পকেটে অনেক মূল্যবান কাগজ ছিলো।

আমি সমাদ্দারের কথার কোন জবাব দিলুম না। চুপ করে রইলুম। সমাদ্দার এবং মিসেস সেনও খানিকক্ষণ কোন কথা বললেন না। খানিকবাদে আবার নিস্তব্ধতা ভাঙলেন সমাদ্দার। বললেন,

: ভাবছি কী করবো মানিকলাল। টু বিলিভ ইউ অর নট টু বিলিভ ইউ। টু বী অর নট টু বী।

: বেশ বলুন, কখন কোথায় আপনাকে এই এটাচী কেসটা ফেরত দিতে পারি? আমি বললুম।

আমার কথা শুনে আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন সমাদ্দার। কী

ভাবলেন জানিনে। তার পর বললেন: বেশ আমি তোমার সঙ্গে হোটেলে আসবো।

আমি প্রতিবাদ করলুম। বললুম: মাপ করবেন মিঃ সমাদ্দার, আপনি আমার সঙ্গে গেলে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। আমি লখ্নউতে অপরিচিত। এই গম্ভীর রাতে কাউকে সঙ্গে নিয়ে হোটেলে গেলে বিস্তর কথা উঠবে। বরং আপনারা এইখানে ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করুন আমার জন্যে। কিছুক্ষণের ভেতরেই আমি আবার এটাচা কেসটা নিয়ে ফেরত আসছি।

কথাটা বললুম বটে কিন্তু আমি মনে মনে ঠিক করেছিলুম যে, একবার সমাদ্দারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলে আর কখনও এদিকে আসবো না। আমার কথা সমাদ্দার সরল মনে বিশ্বাস করলেন। বললেন: তোমাকে বিশ্বাস করলাম মানিকলাল। অতএব তুমি ঘণ্টা খানেকের জন্যে যেতে পারো। আমাদের কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু খবরদার আমাদের সঙ্গে কোন কারসাজি করার চেষ্টা করো না। একটা কথা মনে রেখো মানিকলাল, লখনউয়ে থেকে আমাদের সঙ্গে কোন ছল-চাতুরী করলে তোমার বিপদ বাড়বে। অতএব শান্ত ছেলের মতো নিজের ঘরে ফিরে যাও। আমরা তোমার জন্যে স্টেশনের ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করবো। স্রেফ এক ঘণ্টা। এর বেশি দেরী করো না।

সমাদ্দারকে আশ্বাস দিলুম যে, এক ঘণ্টার মধ্যেই এটাচী কেসটা নিয়ে ফিরে আসবো। তারপর সমাদ্দার আর মিসেস সেনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্টেশনের বাইরে এলুম।

একবার ভাবলুম হোটেলে ফিরে যাবার দরকার নেই। বরং সোজা থানায় যাওয়া যাক। পুলিশের কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বললে সমস্ত ল্যাঠা চুকে যাবে। সরকারী নিয়মানুযায়ী বড়জোর আমার সাজা হবে চাকুরী থেকে ডিসমিস। পর মুহূর্তেই মনে হলো এর চাইতে কঠোর সাজাও মিলতে পারে; শুধুই চাকুরী থেকে বরখাস্ত নয়, বেশ কয়েক বছরের জেলও হতে পারে। দেশদ্রোহিতার জন্য আইনের বিধানে আরও কঠোর শাস্তি হওয়াও অসম্ভব নয়।

আবার ভাবতে লাগলুম এবার কী করবো। থানায় যাবো না হোটেলে ফিরে যাবো। তার পর মনে হলো, একবার যখন পাপ করেছি তখন আর এ পথ থেকে ফেরা যায় না।

গভীর রাত, কিন্তু তবুও স্টেশনের সামনে বিস্তর লোকজন ছিলো। টাঙ্গা ও ট্যাক্সীগুলো এদিক ওদিক ঘোরা ফেরা করছে। আমি একটা ট্যাক্সী ডাকতে যাচ্ছিলুম, হঠাৎ একটা মোটর এসে আমার সামনে দাঁড়ালো।

: ট্যাক্সী স্যার?

আমি ট্যাক্সীওলার কথার কোন জবাব দিলুম না। সোজা ট্যাক্সির ভেতরে উঠে বসলুম। তারপর বললুম : স্যাভয় হোটেল।

গাড়ী চলতে লাগলো। নির্জন রাস্তা, নীরব শহর গাড়ীর কর্কশ আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিলো। আমি আপন মনে বসে বসে বহু প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় কথা ভাবতে লাগলুম। আমি যে আগুন নিয়ে খেলা করছি এ বিষয়ে আমার মনে একটুও সংশয় ছিলো না।

: মাই ডিয়ার মানিকলাল, আপনাকে যে এই গভীর রাতে বিরক্ত করলুম তার জন্য দুঃখিত। অবশ্যি আপনাকে এই কষ্ট দেয়া ছাড়া আমাদের আর অন্য উপায় ছিলো না। শুনুন, আমরা এখন আর আপনার হোটেলে ফিরে যাবো না। আপনাকে আমরা লখনউ এর বাইরে নিয়ে যাচ্ছি। কারণ আপনার সঙ্গে আমাদের বিশেষ জরুরী কতকগুলো কথাবার্তা বলার আছে। একহাতে ষ্টিয়ারিং ধরে গাড়ীর ড্রাইভার পেছন ফিরে এই কথাগুলো আমাকে বললো।

আমি বেশ বিস্মিত হয়ে ড্রাইভারের মুখের দিকে তাকালুম। বুঝতে পারলুম আবার এক নতুন বিপদে জড়িয়ে পড়তে চলেছি

হয়তো আমার এই বিস্ময় ড্রাইভারের দৃষ্টি এড়ালো না একটু হেসে সে আবার বললো,

: মানিকলাল, এখনো যে আত্মপরিচয় দিইনি এ ত্রুটি মাপ করবেন। গাড়ীতে ওঠার আগেই হয়তো বলা উচিত ছিল আমি কে এবং কোথায় আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু মাপ করবেন, প্রথমেই একথা বললে নিশ্চয় আপনি আমার গাড়ীতে উঠতেন না। বিশ্বাস করতেন না যে আমি সামান্য ট্যাক্সী ড্রাইভার। যাক্, এবার আমি খুলেই বলি যে আমি কে এবং আপনার কাছ থেকে কী চাই। আমি হলুম পাকিস্তান হাই কমিশনের মিলিটারী এটাচী এবং আমার প্রয়োজন হলো দিওয়ানীর সেই কালো এটাচী কেসটা। ঐ বাক্সটায় আছে অনেক অনেক মূল্যবান কাগজ এবং সেই সব কাগজগুলোই আমার বিশেষ দরকার।

* * *

আমার নাম ব্রিগেডিয়ার আব্বাস। আমি জানতুম, আপনিই দিওয়ানীর কালো এটাচী কেসটা লখনউ এ নিয়ে আসছিলেন।

: আপনি জানতেন যে আমি লখনউ-এ আসছি? আশ্চর্য। আর কী করে জানলেন যে আমার কাছেই দিওয়ানীর কালো এটাচী কেসটা রয়েছে? আমি বেশ একটু কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলুম।

আমার কথা শুনে ব্রিগেডিয়ার আব্বাস একটু হাসলেন। তারপর মৃদুকণ্ঠে

বললেন : কিন্তু তার আগে বলুন যে আপনি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন ?

: সহযোগিতা ? আপনি কী বলছেন ব্রিগেডিয়ার আব্বাস ?

: আপনি ঠিক শব্দটিই ব্যবহার করেছেন মানিকলাল। আমরা আপনার কাছ থেকে সহযোগিতা চাই। ইংরেজীতে যাকে বলে কোলাবরেশন।

: অসম্ভব! আমি বেশ একটু দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিলুম।

: কিন্তু আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করা ছাড়া যে আর কোন পথ নেই মানিকলাল। মনে করুন, আমরা যদি আপনার অতীত কাহিনী ভারত সরকারের নজরে আনি তাহলে আপনার কী সাজা হবে? নিশ্চয় আপনার চাকরি যাবে। আপনি নিশ্চয় একথা ভুলে যাননি যে, অনেক দিন আগে দামাস্কাসে থাকতে আপনি একবার এক বেলী ড্যান্সারের সঙ্গে রাত্রিবাস করেছিলেন। সে সময়ে ভেবেছিলেন যে কেউ এ খবর জানতে পারেনি। আপনি ভুল করেছিলেন। আমরা যে শুধু এই খবরটুকুই জানি তা নয় আমরা সেই বেলী ড্যান্সারের সঙ্গে আপনার কিছু নগ্ন ফটোও সংগ্রহ করেছি।

মানিকলাল, আপনি জীবনে একটা ভুল করেছেন। অতএব সারাটা জীবন আপনাকে এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। এবার বলুন, এই সব ফটো কবে, কোথায়, কার কাছে পাঠাবো? ভারত সরকারের আর্মি হেড কোয়ার্টারে, না আপনার স্ত্রীর কাছে? আমি হলপ করে বলতে পারি আপনার স্ত্রী এইসব ছবিগুলো খুব সরল মনে গ্রহণ করতে পারবেন না। হাজার হোক ভারতীয় মেয়ে তো। স্বামী অন্য কোন মেয়ের সঙ্গে রাত্রিবাস করেছে এ কখনই বরদাস্ত করবে না। মানিক-লাল, এবার আপনার ইচ্ছেটা কী তা সহজ সরল ভাষায় খুলে বলুন। কী করবেন? কো-অপারেশন, না, নন্ কো-অপারেশন? কোন্টা আপনার ইচ্ছে? বলুন কী আপনার চয়েস?

আমি কোন জবাব দিলুম না। বুঝতে পারলুম বড্ডো ফ্যাসাদেই পড়েছি। আমার মনে কোন সন্দেহ রইলো না যে ব্রিগেডিয়ার আব্বাস আমাকে ব্ল্যাকমেল করছেন। মনের দুর্বলতার জন্যে একটা রাত্রি এক পরদেশী মেয়ের সঙ্গে সহবাস করেছিলুম। আজ তারই খেসারৎ আমাকে দিতে হবে। জীবনে কখনও এমন বিপদে পড়িনি। ভাবতে লাগলুম মুস্কিলের হাত থেকে কী করে রেহাই পাওয়া যায়।

একবার ভাবলুম, নিষ্কৃতির একমাত্র উপায় হলো সেই কালো এটাচী কেসটা ব্রিগেডিয়ার আব্বাসের হাতে তুলে দেয়া। ব্রিগেডিয়ার আব্বাসের সঙ্গে সহ-যোগিতায় আমার মনে সংকোচ ও দ্বিধা জাগলো। হাজার হোক ব্রিগেডিয়ার

আব্বাস হলেন পাকিস্তানের মিলিটারী এটাচী।

হঠাৎ মিঃ সমাদ্দারের কথাটাও মনে জাগলো। আমার জন্যে উনি এখন স্টেশনে অপেক্ষা করছেন। যদি ওর হাতে এই এটাচী কেসটা তুলে না দিই তাহলেও আমাকে বেশ মুস্কিলে পড়তে হবে।

আমার বর্তমান চিন্তা হলো ব্রিগেডিয়ার আব্বাসকে নিয়ে কী করি। যদি ওকে এটাচী কেসটা না দিই তাহলে নিশ্চয় আমাকে ব্ল্যাকমেল করা হবে। আর যদি ঘন্টা খানিকের মধ্যে আবার স্টেশনে ফিরে না আসি তাহলেও আমার জীবন বিপন্ন হবে। সমাদ্দার আমাকে কিছুতেই রেহাই দেবেন না।

আমি চুপ করে রইলুম, কোন জবাব দিলুম না। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে ব্রিগেডিয়ার আব্বাস আবার বলতে লাগলেন,

: মাপ করবেন মানিকলাল, আপনাকে অনেকগুলো কর্কশ কথা শোনাতে হলো। কী করবো বলুন, এসব কথা আপনাকে জানানো ভিন্ন আমার কোন অন্য উপায় ছিলো না। স্পাইং বড্ডো নোংরা কাজ। কোন সহজ পন্থায় একাজ করা যায় না।

মানিকলাল আপনি বড্ডো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছেন। এই ফ্যাসাদের হাত থেকে আপনার সহজে নিস্কৃতি নেই। তাইতো আপনাকে অনুরোধ করছি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে। সহযোগিতা করুন মঙ্গল হবে আর আমাদেরও কাজ হবে। আর এই কাজের জন্য আপনি যথেষ্ট পুরস্কারও পাবেন। ওই এটাচী কেসটি পাবার জন্য আমাদের সরকার যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করতে কুন্ঠিত হবে না। কতো চাই আপনার বলুন? বলুন, কী আপনার প্রয়োজন? গিদোয়ানী আপনাকে কী দেবে বলেছিলো? পাঁচ, দশ না পনেরো হাজার টাকা। মানিকলাল, আপনি অর্থের জন্য চিন্তা করবেন না। আমরা আপনাকে বিস্তর টাকা দেবো। সেই টাকার বিনিময়ে আমরা শুধু ওই কালো এটাচী কেসটা চাই। যদি সরল মনে আমাদের প্রস্তাবে রাজী থাকেন কোন হাঙ্গামা হবে না। আর যদি আমাদের এই অনুরোধ উপেক্ষা করেন তাহলে আমাদের অন্য পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

আমি এবারও চুপ করে রইলুম। কোন জবাব দিলুম না। কিন্তু আমার মনে একটা প্রশ্ন জাগলো। গিদোয়ানী যে আমাকে টাকা দিতে রাজী হয়েছিলো, একথা ব্রিগেডিয়ার আব্বাস জানলো কী করে?

ভাবলুম ব্রিগেডিয়ার আব্বাস কথাটা অনুমান করে নিয়েছেন। ভেবেছেন বিনে পয়সায় নিশ্চয় আমি কোন কাজ করবো না। ব্রিগেডিয়ার আব্বাস আবার বলতে লাগলেন,

: মানি ইজ রেডি মানিকলাল। শুধু একবার বলুন যে আপনি আমাদের সহযোগিতা করবেন। ব্যস, সেই মুহূর্তেই আমরা পুরো টাকাটা আপনাকে ক্যাশ দিয়ে দেবো।

এতক্ষণ আমি চুপ করে বসেছিলুম। একবারের জন্তও মুখ খুলিনি। তার কোন কথারই জবাব দিইনি। এবার বললুম,

: মাপ করবেন ব্রিগেডিয়ার আব্বাস, এই এটাচী কেসটা গিদোয়ানী আমার জিম্মায় রেখেছিলো। কথা ছিলো লখনউ-এ এসে এটাচী কেসটা ওকে ফিরিয়ে দেবো। আমার দুর্ভাগ্য যে গিদোয়ানী মারা গেছে। খুন হয়েছে। কে যে তাকে খুন করেছে তা জানিনে। কেন যে খুন করা হয়েছে তাও আমার অজ্ঞাত। হয়তো কাল পুলিশের তদন্তের পরে এই খুনের কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবো। দেখা যাক, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

আমার জবাব শুনে ব্রিগেডিয়ার আব্বাস মৃদু হাসলেন। তাঁর সেই মিলিটারী হাসির তাৎপর্য বুঝতে আমার একটুও অসুবিধে হলো না। কিন্তু আমি কিছু বললাম না।

ব্রিগেডিয়ার আবার বললেন : মানিকলাল, হয়তো শুনলে আপনি অবাক হবেন, তবুও একথা আপনাকে জানাতে সংকোচ বোধ করছি না যে গিদোয়ানী ছিলো আমাদের স্পাই। আমরাই টাকা দিয়ে ওকে পুষতুম।

গিদোয়ানীকে পাকড়াও করতে আমাদের খুব বেশি অসুবিধে হয়নি। করাচীতে ওর বিস্তর সম্পত্তি ছিলো। একদিন সেই সম্পত্তির মীমাংসা করতে এসেছিলো আমাদের হাই কমিশনে। আমরা তাকে সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ দিতে রাজী হয়েছিলুম শুধু এক সর্তে। গিদোয়ানীকে আমরা আমাদের হয়ে কাজ করতে অনুরোধ করেছিলুম! সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবে এই আশায় গিদোয়ানী আমাদের প্রস্তাবে রাজী হলো।

ব্রিগেডিয়ার আব্বাসের কথাগুলো আমার কানে বেশ বেসুরো লাগলো। চট্ করেই ওর কথায় বিশ্বাস করতে পারলুম না যে গিদোয়ানী পাকিস্তানের স্পাই। খানিক আগেই সমাদ্দার আমাকে বলেছিলেন যে গিদোয়ানী হলো চীনাদের স্পাই। হঠাৎ আমার মনে সন্দেহ জাগলো যে গিদোয়ানী হয়তো ডবল এজেন্টের কাজ করতো। অর্থাৎ থার্ড ম্যান। চীনা এবং পাকিস্তান দু' পক্ষের হয়েও কাজ করতো। স্পাই-এর জীবন যে অতি বিচিত্র সে বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ ছিলো না। এবার ভাবলুম, গিদোয়ানী যে পাকিস্তানের হয়েও কাজ করতো সে কথা কি সমাদ্দার জানতেন? পর মুহূর্তেই কিন্তু আবার মনে হলো যে গিদোয়ানীর কথা ভেবে আমার সমস্যার কোন সমাধান হবে না।

বর্তমানে যে মুস্কিলে পড়েছি এখন সেই জ্যালাদ থেকেই রেহাই পাবার চেষ্টা করতে হবে। কী করে ব্রিগেডিয়ার আব্বাসের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায় সেই কথাই ভাবতে লাগলুম। সমাদ্দারকে ফাঁকি দিয়েছি কিন্তু ব্রিগেডিয়ার আব্বাসকে কী অতো সহজে ধোঁকা দিতে পারবো? ব্রিগেডিয়ার আব্বাস হুঁশিয়ার লোক।

হঠাৎ-ই ব্রিগেডিয়ার আব্বাস আমাকে জিজ্ঞেস করলেন,

: বলুন মানিকলাল, আপনার মতলব কী? এই গভীর রাতে এতো চিন্তা ভাবনার পর আপনি কী ঠিক করলেন? বলুন, কী মতলবে আপনি এই এতো রাত্রিতে লখনউ স্টেশনে এসেছিলেন?

: আমার এক আত্মীয় পাঞ্জাব মেলে কলকাতায় যাচ্ছিলো। তার সঙ্গে দেখা করতেই স্টেশনে এসেছিলুম, আমি জবাব দিলুম।

: লায়ার। বেশ একটু তীব্র ও কটু কণ্ঠেই ব্রিগেডিয়ার আব্বাস আমাকে এই কথা বললেন। আরও বললেন,—আমি জানি মানিকলাল যে আপনি লখনউ স্টেশনে এসেছিলেন সমাদ্দারের সঙ্গে দেখা করতে। আমরা আগে থেকেই আপনার গতিবিধির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিলুম। অতএব আমাকে আপনি ধোঁকা দিতে পারবেন না। এবার স্পষ্ট বলুন, সমাদ্দার কী চায়? কালো এটাচী কেসটাই কী? ঐ এটাচী কেস সমাদ্দার কখনই পাবে না। অসম্ভব। ওটা আমাদেরই সম্পত্তি। অতএব আপনি সমাদ্দারকে জানাতে পারেন যে ঐ এটাচী কেসটি কখনই তাকে দেয়া হবে না।

আমি বুঝতে পারলুম যে গিদোয়ানীর বুক পকেটে যে সব মূল্যবান কাগজ ছিলো তার খবর ব্রিগেডিয়ার আব্বাস জানেন না। কারণ ঐ সব কাগজের কথা তিনি একবারও উল্লেখ করলেন না। আশ্চর্য! সমাদ্দার বার বার আমাকে ঐ সব মূল্যবান কাগজের কথা বলেছেন। বলেছেন যে ঐ কাগজ গুলোও তার বিশেষ প্রয়োজন। মনে হলো কোথায় যেন এক বিরাট রহস্য লুকানো আছে। সেই রহস্যটি জানবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগলো আমার মনে। কিন্তু মনের সে ইচ্ছে ভাষায় প্রকাশ করলুম না। এবার আমি মুখ খুললুম, দৃঢ়তার সঙ্গেই বললুম : ব্রিগেডিয়ার আব্বাস, আমাকে ব্ল্যাকমেল করার বৃথা চেষ্টা করবেন না। আমি নাবালক শিশু নই। চিন্তা করবার মতো কিছু ক্ষমতা আমারও আছে। অতএব, আপনার হুমকিতে আমি সহজে ভয় পাবো না।

আমার চরিত্র নিয়ে চিন্তা করে লাভ নেই। যদি ভেবে থাকেন যে কোন ছবি দেখালেই আমাকে ব্ল্যাকমেল করবেন, তাহলে বলবো আপনি ভুল পাত্রের হাতে পড়েছেন। তারপর শুনুন, আমি গিদোয়ানীর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ

হয়েছিলুম যে, ওর কালো এটাচী কেসটি লখনউ-এ এসেই বাক্সটি আমি ওর হাতে তুলে দেবো। গিদোয়ানী এখন মৃত। অতএব এই বাক্সটি আমি এখন গিদোয়ানীর উত্তরাধিকারীর হাতেই তুলে দেবো।

আমার জবাব শুনে ব্রিগেডিয়ার আব্বাস আবার এক ঝলক হাসলেন। বললেন : আপনি পাগলের মত কথা বলছেন মানিকলাল। ভারত সরকারের টপ সিক্রেট ডকুমেণ্ট আপনি গিদোয়ানীর উত্তরাধিকারীর হাতে তুলে দেবেন, এ অসম্ভব। একবার বিচার করে বলুন এই কালো এটাচী কেসটির প্রকৃত মালিক কে, আমি, সমাদ্দার না পুলিশ? আমি জানি আপনি কখনও পুলিশের কাছে যাবেন না। অতএব আপনাকেই এই সিদ্ধান্ত করতে হবে যে ওই এটাচী কেসটি আপনি কার হাতে তুলে দেবেন। আমার না সমাদ্দারের হাতে? যদি আমাদের হাতে তুলে দেন তবে আপনার মঙ্গল হবে। কারণ, এই পরিবর্তে আপনি প্রচুর বখশিস্ পাবেন। আর, আর আমাদের কথার অবাধ্য হলে আপনাকে তার ফল ভোগ করতে হবে।

যাক্, আপনি আজ ক্লান্ত। শান্ত মনে ভেবে দেখার ক্ষমতা নেই। আজকের রাতটা আমাদের অতিথি হয়ে এখানেই কাটান। কাল আবার আপনার সঙ্গে কথা বলবো। ইতিমধ্যে আমরা একবার আপনার হোটেলে হানা দেবো। একবার চেষ্টা করে দেখবো সেই কালো এটাচী কেসটা উদ্ধার করতে পারি কি না। হয়তো সে এটাচী কেসটা উদ্ধার করতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না। আর যদি কোন কারণে সেই এটাচী কেসটা না পাই তাহলে কাল যে উপায়েই হোক এই কাজটা করতে আপনাকে বাধ্য করাতে হবে। এই ঘর থেকে পালাবার চেষ্টা করবেন না। বিপদে পড়বেন। কারণ আমাদের প্রহরী আপনার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখবে। আচ্ছা আজকের মত বিদায় নিচ্ছি। গুড নাইট, বলেই বিদায় নিলেন ব্রিগেডিয়ার আব্বাস।

এবার অনেক চিন্তা এক সঙ্গে এসে আমার মাথায় জড়ো হলো। ব্রিগেডিয়ার আব্বাসের কথায় আমি বেশ একটু শঙ্কিত হয়েছিলুম। ভাবলুম যদি ব্রিগেডিয়ার আব্বাস হোটেলের সেফ লকার থেকে এটাচী কেসটা উদ্ধার করে আনতে সক্ষম হন তাহলে কী হবে? আবার ভাবলুম উনি হয়তো এই বাক্সটি সেফ লকার থেকে উদ্ধার করতে পারবেন না।

কিন্তু ভেবে লাভ কি? আমি তখন নিরুপায়। ব্রিগেডিয়ার আব্বাসের বন্দী। সারা দিনের চিন্তা ভাবনায় তখন আমার দেহ ও মন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো। বিছানায় শোবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লুম।

* * *

ব্রিগেডিয়ার আব্বাস পরের দিন সকালেই আবার আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তার মুখে তখন একটা হাসির ছায়া ভাসছিলো। তার সেই হাসি দেখে আমি বেশ কিছুটা আতঙ্কিত হলুম। মনে করলুম, উনি হয়তো সেই এটাচী কেসটা উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছেন।

ব্রিগেডিয়ার আব্বাস অন্তরঙ্গ স্বরে প্রশ্ন করলেন,

: বেড টী প্লিজ ?

আমি কোন জবাব দিলুম না। চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে চা খাবার পরে কিছুটা আরাম বোধ করলুম। জানিনে কেন সেদিন চা খেয়ে আমি বড়ো তৃপ্তি পেয়েছিলুম।

ব্রিগেডিয়ার আব্বাস বলতে লাগলেন,

: আমার হাতে বেশি সময় নেই মানিকলাল প্রতিটি মুহূর্তই আমার কাছে মূল্যবান। বলুন, কী ঠিক করেছেন ?

: আমার বলবার কিছুই নেই ব্রিগেডিয়ার আব্বাস। আপনি কাল আমাকে বলে গেলেন যে, হোটেল থেকে ঐ এটাচী কেস আপনি উদ্ধার করবার চেষ্টা করবেন। আপনি যা খুশী করতে পারেন। আপনাকে আমি কোন বাধা দেবো না।

: মানিকলাল, আপনার ঘর খুঁজে আমরা কোন এটাচী কেস পাইনি। একবার হোটেলের সেফ লকারটা দেখবার চেষ্টা করবো। বুঝতে পে আপনি আমাদের সঙ্গে কোন সহযোগিতা করবেন না। বেশ, দেখা যাক ক। হয়। যাক, একটা কাজ করুন। আমার হাতে এটাচী কেসটা দিয়ে দেবার জন্য একটা কাগজে হোটেলের কর্তাদের কাছে কিছু লিখে দিন।

: যদি আপনার নির্দেশ মত কাজ না করি, আমি জবাব দিলুম।

: কেন পাগলামো করছেন ? শুধু শুধুই নিজের বিপদ ডেকে আনবেন। বেশ, আপনি সই করবেন না। আমরাই আপনার সই জাল করে নেবো। আপনাকে তো অনেকবার বলেছি যে ওই এটাচী যে কোন উপায়েই হোক, উদ্ধার করতে হবে।

: আপনি যদি সই জাল করেই এটাচী কেসটা উদ্ধার করতে পারেন তবে আমাকে এতো জেরা করছেন কেন ? আমি দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিলুম।

: কারণ, আমরা কোন হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে চাই না মানিকলাল। আপনি যদি আমাদের কথা শুনতেন তাহলে সেফ লকারের রসিদ আমাদের হাতে দিতে আপত্তি করতেন না। আপনি নিতান্তই ছেলেমানুষ একটা কথা মনে রাখবেন। আপনার জীবন এখন আমাদের হাতের মুঠোয়। এ অবস্থায় কেন

যে অনর্থক আমাদের বিবাদে জড়িয়ে পড়তে চাইছেন বুঝতে পারি জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলবেন না। বলুন, আপনি সেফ লকারের রসিদটা দেবেন কিনা ?

: না, স্পষ্ট জবাব দিলুম আমি।

: ইডিয়ট, বলেই ব্রিগেডিয়ার আব্বাস আমার গালে বিরাশী সিক্কার এক থাপ্পড় মারলেন।

: আমি কাগজে লিখে সই করে দিতে পারি বটে কিন্তু হোটেলের কর্তারা আপনাকে এটাচী কেস দেবে না। কারণ আমি হোটেলের কর্তাদের আগেই বলে রেখেছিলুম যে, এটাচী কেসটা যেন আমার নিজের হাতেই ফেরত দেয়া হয়। আর একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন ব্রিগেডিয়ার আব্বাস। আমি কাল রাত্রে হোটেলে ফিরে যাইনি। হয়তো ইতিমধ্যে ওরা এর জন্য পুলিশে খবর দিয়েছেন। আপনি এখন এই এটাচী কেস সংগ্রহ করতে সেখানে গেলে আপনাকেই বিপদে পড়তে হবে।

ব্রিগেডিয়ার আব্বাস বললেন : আমি কোন কথাই ভুলে যাইনি মানিকলাল। কথা ভোলা আমার কাজ নয়। কাল রাত্রিতেই আমরা হোটেলের কর্তাকে ফোন করে জানিয়ে রেখেছি যে, আপনি কোনও কাজে কয়েক দিনের জন্য শহরের বাইরে যাচ্ছেন। অতএব ওরা আপনার জন্যে কোন চিন্তা করবে না, পুলিশেও কোন খবর দেবে না।

একটু সময় চুপ করে থেকে ব্রিগেডিয়ার আব্বাস বলতে থাকেন : আপনি দেশদ্রোহী চোর ও স্পাই। ভারত সরকারের জরুরী দলিলপত্র চুরি করতে আপনি গিদোয়ানীকে সাহায্য করেছেন। অতএব সমাজে আপনার কোন স্থান নেই। থাক্ বাজে তর্ক করে আমি সময় নষ্ট করতে চাইনে। আমার হাতে এখন প্রচুর কাজ। আজই সন্ধ্যা নাগাদ দিল্লী ফিরে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

এর পরেই ব্রিগেডিয়ার আব্বাস চলে গেলেন, কিন্তু প্রহরীটি তখনও দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইলো।

চুপচাপ নিশ্চুপ হয়ে বসে রইলুম কিছুক্ষণ। ভাবলুম, ভবিষ্যৎ চিন্তা করে লাভ নেই। এই ঘর থেকে না বেরুনো অবধি আমার কোন ভবিষ্যতই নেই।

অতএব বৃথা স্বপ্ন দেখে কী লাভ।

হঠাৎ আমার চিন্তাধারা ছিন্ন হলো। কে যেন বাইরে থেকে আমার নাম ধরে ডাকলো। আমি সচকিত হয়ে বাইরে তাকালুম। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলুম না।

আবার ডাক শুনতে পেলুম : মানিকলাল !

ভালো করে যাচাই করে দেখার জন্তে জানালার কাছে গেলুম। সেখানেও কাউকে দেখলুম না। তারপর ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালুম। হঠাৎ দেখতে পেলুম ব্যালকনির ঠিক নীচে মিঃ সমাদ্দার দাঁড়িয়ে আছেন।

সমাদ্দারকে সেখানে দেখতে পেয়েই মনে খুব আনন্দ হলো। সমাদ্দার আমাকে ইশারায় বললেন : মানিকলাল, নীচে নেমে এসো।

: কী করে আসবো ? আমি প্রশ্ন করলুম।

ব্যালকনির পাশে ছিলো একটা জলের পাইপ। ইশারায় সেই পাইপটাকে দেখিয়ে দিয়ে সমাদ্দার বললেন : পাইপটা বেয়ে নীচে নামো।

জলের পাইপ বেয়ে ওপর থেকে নীচে নামা সহজ কাজ নয়। তার ওপর দরজার সামনেই প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখ এড়ানোও সহজ নয়। কিন্তু নিজের জীবন রক্ষার জন্য অবশ্যই আজ আমাকে সাহস দেখাতে হবে। ভয় করলে চলবে না।

আমি একবার ঘরের ভেতরে গেলুম প্রথমে। প্রহরীটি দরজার সামনেই বসে আছে কিনা সেটাই একবার যাচাই করে দেখতে গেলুম।

প্রহরীটি তখন ঘরের বাইরে দরজার সামনেই বসেছিলো। বুঝতে পারলুম সে সমাদ্দারের কণ্ঠস্বর শুনতে পায়নি। লোকটি একবার আমার মুখের দিকে তাকালো। একটু মৃদু হাসলো ও, কিন্তু আমি কোন চঞ্চলতা বা বিচলিত ভাব প্রকাশ না করে আবার ব্যালকনিতে ফিরে এলুম।

এবার আমাকে নীচে নামতে হবে। জলের পাইপ বেয়ে নীচে নামতে হবে। দিনদুপুরে অন্যের অলক্ষিতে জলের পাইপ বেয়ে নীচে নামা সহজ কাজ নয়।

আমি ব্যালকনি পার হয়ে জলের পাইপ ধরলুম। এর পর থেকেই প্রতিটি মুহূর্ত আমার কাছে এক-একটা প্রহরের মতো মনে হতে লাগলো। মনে আশঙ্কা জাগলো যে ব্রিগেডিয়ার আব্বাসের প্রহরীটি যে-কোন মুহূর্তেই আমাকে ধরে ফেলতে পারে। আর ধরা পড়লেই যে গর্দান যাবে সে বিষয়েও কোন সন্দেহ ছিলো না। এই ধরনের কাজ এর আগে আমি আর কখনো করিনি। তাই আমার বুক কাঁপতে লাগলো।

নামবার সময়ে হাত-পা বেশ খানিকটা ছড়ে গেলো। মনের উত্তেজনার দরুণ সেদিকে কোন নজর দিলুম না।

নীচে নামার সঙ্গে সঙ্গে সমাদ্দার আমার কাছে এগিয়ে এলেন। বললেন : দুঃখিত মানিকলাল, তোমাকে বেশ খানিকটা কষ্ট ভোগ করতে হলো। জলের পাইপ বেয়ে নামা ছাড়া আর কোন উপায় ছিলো না। এখানে আর এক

মুহূর্তও থাকা নিরাপদ নয়। চল দৌড়ে পালানো যাক।

সামনে ছিলো এক বিরাট লন। সেই লন পেরিয়ে গেট। সমাদ্দার লনটা দেখিয়ে বললেন : আমরা কিন্তু ওই লন পার হয়ে গেট দিয়ে যাবার চেষ্টা করবো না। ওপথে যেতে গেলেই প্রহরীর চোখে পড়ে যাবো। ওই লনের পাশে যে দেয়াল, আমাদের সেই প্রাচীর টপ্‌কে যেতে হবে।

আমরা দুজনে লনের পাশ দিয়ে দৌড়তে লাগলুম কিন্তু তবুও প্রহরীর দৃষ্টি এড়াতে পারলুম না। হঠাৎ পেছন থেকে প্রহরী চীৎকার করে উঠলো। লোকটা ঠিকই টের পেয়েছিলো যে আমরা পালাচ্ছি। প্রাণের ভয়ে আমরা আরও জোরে দৌড়লুম। জীবনে যখন বিপদ ঘনিয়ে আসে তখন সবকিছুই করা যায়। তাই আমি মরিয়া হয়ে দৌড়তে লাগলুম।

একটু পরে আমরা এক বিরাট দেয়ালের সামনে এসে দাঁড়ালুম। সমাদ্দার বললেন : মানিকলাল, এবার আমাদের এই দেয়াল টপকাতে হবে। নাও ওঠো।

দেয়ালের পাশেই ছিলো একটা গাছ। আমরা দুজনেই সেই গাছে উঠলুম। আমাদের শরীরের ভারে ডালটা দেয়ালের ওপরে নুয়ে পড়লো। গাছ থেকে দেয়ালে নামতে কষ্ট হলো না।

দেয়ালের ওপাশে নামবার সময়ে দেখলুম ব্রিগেডিয়ার আব্বাসের অনুচর প্রহরীটি লনের ওপর দিয়ে দৌড়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আর সময় নষ্ট না করে দেয়াল পার হয়ে সেই মুহূর্তেই আমরা অন্য পাশের একটা বাড়ীতে পৌঁছলুম। বাড়ীটা পুরানো কিন্তু বেশ বড়ো। দেখলেই মনে হয় কোন নবাব বা জমিদারের বাড়ী।

খানিক বাদে আমরা সেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলুম। গেট দিয়ে বের হবার সময়ে দেখতে পেলুম ব্রিগেডিয়ার আব্বাসের দুজন অনুচর আমাদের সন্ধানে সেই বাড়ীর দিকে এগিয়ে আসছে।

বাড়ীর সামনের রাস্তাটায় একটা পুরানো অষ্টিন গাড়ী দাঁড়িয়েছিলো। গাড়ীর ষ্টিয়ারিং-এ বসেছিলেন মিসেস সেন।

দরজা খুলে আমরা গাড়ীর ভেতরে ঢুকলুম। সমাদ্দার বেশ শান্ত গলায় বললেন : নাউ লেট আস গো।

গাড়ী স্টার্ট দিলো। ব্রিগেডিয়ার আব্বাসের অনুচররা আমাদের পালাতে দেখে চীৎকার করে উঠলো। কিন্তু ততক্ষণে আমাদের গাড়ী হাওয়ার বেগে ছুটতে শুরু করেছে।

আমি এবার সমাদ্দারকে জিজ্ঞেস করলুম : বলুন আমার সন্ধান কী করে পেলেন ?

সমাদ্দার একটু হেসেই বললেন : তোমার গতিবিধির ওপরে নজর রাখাও আমার একটা কাজ ছিলো মানিকলাল। কারণ তুমি ছিলে আমাদের কাছে খুবই মূল্যবান। আরও জানতুম ব্রিগেডিয়ার আব্বাস তোমার পেছু নেবে। তাই আমিও সতর্ক হয়েছিলুম। তুমি আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসার বেশ খানিকক্ষণ পরেও যখন আর ফিরে এলে না তখনই আমার মনে সন্দেহ হলো। মিসেস সেনকে তখনই ডেকে বললুম আমার মনের কথা। উনিও বেশ কিছুটা চিন্তাবোধ করছিলেন তোমার জন্য। তাই তৎক্ষণাৎ আমরা দুজনে বেরিয়ে পড়লুম তোমার খোঁজে। কাল সারারাত আমরা তোমার খোঁজ করছি। ভোর বেলায় আমাদের এক ইনফরমার এসে বলল যে তুমি ব্রিগেডিয়ার আব্বাসের খপ্পরে পড়েছো। ব্রিগেডিয়ার আব্বাসের আড্ডাখানা আমার জানা ছিলো। অতএব তোমার সন্ধান পেতে আর বেগ পেতে হয়নি। একটা কথা মনে রেখো মানিকলাল। সর্বত্রই আমাদের চর কাজ করছে। আমাদের চোখে ধুলো দেয়া সম্ভব নয়।

: আপনি ব্রিগেডিয়ার আব্বাসকে চেনেন ? আমি প্রশ্ন করলুম কৌতূহলী কণ্ঠে।

: ব্রিগেডিয়ার আব্বাস হলেন শুধু শত্রু। ওর সঙ্গে আমার কোন ব্যক্তিগত পরিচয় নেই বটে কিন্তু ওর নাম আমার অপরিচিত নয়। উনিও আমাকে চেনেন।

: হ্যাঁ, উনি আপনার কথা উল্লেখ করেছিলেন।

: কী বলছিলেন ? কৌতূহলী হয়ে সমাদ্দার প্রশ্ন করলেন।

: জানতে চাইছিলেন আপনার সঙ্গে আমার মোলাকাৎ হয়েছে কিনা ?

আমার কথা শুনে সমাদ্দারের মুখের রং পালটে গেলো। বুঝতে পারলুম উনি ভাবতে শুরু করেছেন। এবার আমি আলোচনার মোড় ঘোরাতে চেষ্টা করলুম। জিজ্ঞেস করলুম,

: একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস না করে পারছিনে। গিদোয়ানীর চরিত্র সম্বন্ধে আমার কৌতূহল হচ্ছে। ব্রিগেডিয়ার আব্বাসের কথায় জানতে পারলুম গিদোয়ানী পাকিস্তানের হয়ে কাজ করতো। আমি প্রশ্ন করলুম।

আমার প্রশ্ন শুনে সমাদ্দার একটু হেসে জবাব দিলেন,

: আমিও একথা জানতুম। কথাটা মিথ্যে নয়।

সমাদ্দারের জবাবে আমি বেশ একটু বিস্মিত হলুম। গিদোয়ানী থার্ড ম্যান

একথা জানা সত্ত্বেও কেন সমাদ্দার তাকে বিশ্বাস করতেন ভেবে পেলুম না। তাই আবার প্রশ্ন করলুম,

: আপনি জানতেন যে গিদোয়ানী থার্ড ম্যানের কাজ করতো?

: হ্যাঁ। আমাদের নির্দেশেই গিদোয়ানী ব্রিগেডিয়ার আব্বাসের হয়ে কাজ করতেন। থাক, সে এক অন্য কাহিনী। গাড়ীতে বসে তা বলা যায় না।

খানিক বাদে গাড়ীটা বেশ বড়ো একটা বাড়ীর ভেতরে ঢুকলো। গাড়ীটা সেই বাড়ীর ভেতরে ঢুকতেই সমাদ্দার আমাকে বললেন,

: এই হলো আমাদের লখনউ-এর হেড কোয়ার্টার।

আমরা বাড়ীর ভেতরে ঢুকলুম। বাড়ীর ভেতরে বেশ বড়ো একটা হল ঘর। হল ঘরের একপ্রান্তে সোফাসেট সাজানো। আমরা গিয়ে সোফাতে বসলুম। মিসেস সেন এবার বললেন,

: চা-টা কিছু খাবেন মানিকলাল?

: ধন্যবাদ। তৃষ্ণা মেটাতে চা-ই হলো সবচাইতে সুস্বাদু পানীয়। আপত্তি নেই কোন।

মিসেস সেন চায়ের ব্যবস্থা করতে উঠে গেলেন। তিনি চলে যেতেই বেশ একটু ঝাঁকিয়ে বসলেন সমাদ্দার। বললেন,

: এবার আমাদের গল্পকাহিনী শুরু করা যাক। আমাদের এই কাহিনী ভারী ইন্টারেষ্টিং। বলো কী শুনতে চাও? আরম্ভ না শেষ?

: আরম্ভটাই শুনি, আমি বললুম।

এর মধ্যেই মিসেস সেন চায়ের পেয়ালা নিয়ে এলেন। চায়ের পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়ে সমাদ্দার বললেন: আঃ।

বুঝতে পারলুম সমাদ্দার চা পান করে বেশ তৃপ্তি লাভ করেছেন। চা পানের পরে কণ্ঠস্বর একটু মৃদু করে সমাদ্দার বললেন,

: এবার আমার গল্প শোন। এই কাহিনী ডিটেকটিভ উপন্যাসের চাইতেও রোমাঞ্চকর। একবার শুনতে আরম্ভ করলে আরও শুনতে চাইবে। জানো মানিকলাল, আমাদের এই গিদোয়ানী যার মৃতদেহ তুমি কাল মাউন্ট হোটেলে দেখেছো, সে ছিলো ডবল এজেন্ট। আমার কথা শুনে তুমি অবাক হচ্ছো। কিন্তু কথাটা সত্যি যে সে ছিলো থার্ড ম্যান। দু পক্ষের হয়েই কাজ করতো। তাহলেও আসলে গিদোয়ানী ছিল আমাদেরই লোক।

আমাদের তেজপুর হলো ফ্রন্টিয়ার অঞ্চলের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি। আমরা অনেক দিন থেকেই জানতুম যে এই প্রান্তে একদিন না একদিন লড়াই শুরু হবে। পিকিং-এর কর্তারা নেফা অঞ্চল আক্রমণ করার অভিসন্ধি অনেক দিন থেকেই

করছিলো। অতএব ওই অঞ্চলে আমরা এজেন্ট নিযুক্ত করলুম। আমাদের এজেন্টের কাজ হলো নেফা অঞ্চলের মিলিটারী খবর সংগ্রহ করা। আর গিদোয়ানী হলো আমাদের এজেন্ট।

গিদোয়ানী প্রকাশ্যে খবর সংগ্রহ করতে পারতো না। তার কারণ খবর সংগ্রহ করতে হলেই টাকা ঢালতে হয়। আর গিদোয়ানীর মতো লোক যদি টাকা ছড়িয়ে খবর সংগ্রহ করে তাহলে সরকার এবং পুলিশের শুভদৃষ্টি নিশ্চয় তার ওপর পড়বে। পুলিশের নজর এড়াবার জন্য আমরা এক অন্য পন্থা অবলম্বন করলুম। আমাদের নির্দেশে গিদোয়ানী কাবুলিওয়ালার ভূমিকায় নেমে টাকা ধার দিতে শুরু করলো। অর্থাৎ সামরিক বিভাগের লোকদের টাকা ধার দেওয়া শুরু করলো। বাজারে তার নাম হলো মানি লেণ্ডার।

গিদোয়ানী মানি লেণ্ডার, অতএব কারো মনে একবারও সন্দেহ জাগলো না যে তার আসল কাজটা কী? কিন্তু আমরা জানতুম যে, গিদোয়ানীর কাজে কাবুলিওয়ালার ভূমিকা হলো 'কভার'। তার আসল কাজ হলো স্পাইং। অর্থাৎ জরুরী টপ সিক্রেট খবর সংগ্রহ করা। তেজপুর হলো গুরুত্বপূর্ণ মিলিটারী ঘাঁটি। অতএব সে অঞ্চলে প্রচুর সামরিক খবর মিলতো।

ভারত চীন সীমান্ত নিয়ে বিবাদ শুরু হবার পর পাকিস্তানের কর্তারাও একটু চিন্তিত হয়েছিলো। মনে মনে ওরাও চীনকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতো না। ওরা প্রকাশ্যে ওদের এই মনোভাব প্রকাশ না করে বরং ভারতবর্ষকে গালমন্দ দিয়ে বার বার চীনকে সমর্থন জানাতে লাগলো।

পাকিস্তান এবার ঠিক করলো এক ঢিলে দুই পাখী মারবে অর্থাৎ ভারতবর্ষকেও যেমন নাজেহাল করবে তেমন চীনের সঙ্গেও সীমান্ত সমস্যার একটা মীমাংসা করে ফেলবে।

একদিন পাকিস্তানের মনিব আয়ুব খান তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভুট্টোকে বর্ডার এরিয়া নিয়ে আলোচনা করতে পিকিং-এ পাঠালেন। সেখানে ঠিক হলো যে শিগগিরই বর্ডার এরিয়া নিয়ে পাকিস্তান ও চীনিদের মধ্যে এক বৈঠক হবে। এই সিদ্ধান্তে পাকিস্তান সন্তুষ্ট হলো। ভুট্টো খুশী মনে করাচীতে ফিরে এলো। কিন্তু পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দপ্তর এবং ডিফেন্স মিনিস্ট্রী একটু চিন্তা ভাবনায় পড়লো। চিন্তা আর কিছুই নয়, বর্ডার এরিয়া নিয়ে আলোচনায় বসতে হলে ম্যাপের প্রয়োজন। দেশ ভাগ হবার পরে এই অঞ্চলের সমস্ত ম্যাপই ছিলো ভারতবর্ষের সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার দপ্তরে। সে ম্যাপ পাওয়া এখন এক দুঃসাধ্যকর ব্যাপার। তাই তারা অন্য উপায়ে সেই ম্যাপ সংগ্রহ করার জন্য উঠে-পড়ে লাগলো।

আমরাও খবর পেয়ে গেলুম যে, বর্ডার এরিয়ার ম্যাপের জন্য পাকিস্তান খুবই লালায়িত। উঠে-পড়ে লেগেছে সেই ম্যাপ সংগ্রহের কাজে। বাইজিং-এর কর্তারা আমাদের খবর দিলেন যে, যেমন করেই হোক পাকিস্তানের হাতে কতকগুলো জাল ম্যাপ তুলে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। কী করে সে কাজ হাসিল করা যায় এবার আমরা তাই ভাবতে লাগলুম।

আমরা গিদোয়ানীকে সতর্ক করলুম। বললুম, তুমি এবার পাকিস্তানের হয়ে কাজ করো। ঘুণাক্ষরেও ওদের বোলো না যে আমাদের সঙ্গে তোমার কোনো যোগাযোগ আছে। কারণ, আমরা চাই যে তুমি ডবল এজেন্ট হয়ে কাজ করো।

: মতলব? বেশ একটু কৌতূহলী হয়ে গিদোয়ানী জিজ্ঞেস করেছিলো।

: আমরা পাকিস্তানকে ধোঁকা দিতে চাই, বললুম আমি। গিদোয়ানী আমাদের আসল মতলব বুঝতে পারলো না। আমরাও ওকে সব কথা খুলে বললুম না।

পাকিস্তানের এজেন্ট হয়ে কাজ করা সহজ কথা নয়। একদিন গিদোয়ানী দিল্লীতে গেলো পাকিস্তান হাই কমিশনে। পাকিস্তান হাই কমিশনের বড়ো কর্তাদের গিয়ে বললো: পাকিস্তানে আমার কিছু জমি-জমা আছে, সেগুলো বিক্রি করতে চাই।

গিদোয়ানীর কথা শুনে পাকিস্তান হাই কমিশনের কর্তাদের মনে একটু সন্দেহ হলো। ওরা গিদোয়ানীকে জেরা করতে শুরু করলো। মিলিটারী এটাচী ব্রিগেডিয়ার আব্বাস ওর সঙ্গে কথাবার্তা বললো। গিদোয়ানী তাদের জানালো যে, সে তেজপুরে থাকে। গিদোয়ানী তেজপুরে থাকে শুনেই সম্ভবত ব্রিগেডিয়ার আব্বাস তাকে পাকিস্তানের পক্ষ হয়ে কাজ করতে অনুরোধ করলো। প্রথমে গিদোয়ানী খুবই আপত্তি জানালো, তারপর ব্রিগেডিয়ার আব্বাসের অনেক সাধ্যসাধনের পর পাকিস্তানের হয়ে কাজ করতে রাজী হলো। তখন কী ছাই ব্রিগেডিয়ার আব্বাস একটুও সন্দেহ করেছিলো যে, গিদোয়ানী হলো আমাদের এজেন্ট! মানিকলাল, আজ অবধি পাকিস্তানের কর্তারা জানে না গিদোয়ানীর প্রকৃত রূপ কী?

যাক্, আমাদের কাহিনীতে ফিরে আসা যাক্ আবার। পাকিস্তানের কর্তারা পাকিস্তান-চীন সীমান্তের ম্যাপ যোগাড় করার জন্যে উঠে-পড়ে লাগলো। যেমন করেই হোক্, ওই অঞ্চলের ম্যাপ যোগাড় করতেই হবে।

একদিন করাচী থেকে ব্রিগেডিয়ার আব্বাসের কাছে এক টপ সিক্রেট তার এলো, যেমন করেই হোক্ এই সীমান্তের ম্যাপ যোগাড় করো।

তারের বার্তাটি এসেছিলো সাইফার টেলিগ্রামে। তোমাকে একথা বলা প্রয়োজন যে, আমরাও ওই সাইফার টেলিগ্রামের একটি কপি পেলুম। এই সাইফার টেলিগ্রামের কপি আমি আমার নোট বুকে টুকে রেখেছিলুম, খুবই জরুরী টেলিগ্রাম বলে। এবার তোমাকে সেই টেলিগ্রামটা পড়ে শোনাতে চাই।

সাইফার টেলিগ্রাম অক্ষরে বা বিভিন্ন শব্দে হয়। সেই টেলিগ্রামটা ছিল অক্ষরে। এই ছিলো সেই টেলিগ্রামের বয়ান—

89625	98652	56451
75162	185192	31653
84386	62892	53871
71623	91262	12619
52123	38691	25169
80142	95192	41263

এইবার সাইফার কী করে ভাঙতে হয় তাই শোন। সাইফার ভাঙার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হলো ক্রিপ্টোগ্রাম মেশিন। কিংবা যে বইতে প্রতিটি নম্বরের অর্থ লেখা থাকে সেই বই একখানা চুরি করা। এই বইকে বলা হয় প্যাড। বিভিন্ন ধরনের প্যাড থাকে। সহজ সরল প্যাডকে বলা হয় সিম্পল প্যাড। ক্রিপ্টোগ্রাম মেশিন খুব দামী। আমরা স্থির করলুম এই সাইফার প্যাড চুরি করবো।

অনেক কষ্ট করেই পাকিস্তান হাই কমিশন থেকে আমরা সেই সাইফার প্যাড চুরি করলুম। কী করে করলুম তার পুরো বিবরণী দিতে চাইনে।

যাক, সাইফার প্যাড তো পেলুম, এবার ভাবনা হলো, এই অক্ষরগুলো কী করে ভাষায় সাজানো যায়। মানিকলাল, কল্পনা করো প্রথম নম্বরটি 89625, অর্থাৎ সাইফার বই-এর উনআশী পাতা, ছ নম্বর প্যারা, ছ লাইনের পাঁচ নম্বর শব্দটি। এমনি করে প্রতিটি অক্ষরকে সাইফার বই-এর সঙ্গে মেলাও, টেলিগ্রামের অর্থটি পরিষ্কার বুঝতে পারবে।

এমনি করে প্রতিটি অক্ষর পাল্টে আমরা সেই সাইফার টেলিগ্রাম থেকে যে খবরটি পেলুম তা হলো,

TOP SECRET

FROM FOREIGN KARACHI

TO PAKHICOM NEW DELHI

For Military Attache only Message begins stop Send urgently by Ship No 42 on No 50 available with Raj stop If

satisfied with No 42 shall discuss about No 50 anb No 24 with No 1 stop Meeting arranged on 210900—Foreign

যাক্, এবার কোড শব্দগুলো আমাদের ভাঙতে হবে মানিকলাল। অনেক সময় সাইফার টেলিগ্রামে কোড সঙ্গে থাকে। আগে থেকেই এই কোডের মানে বিভিন্ন এবাসীতে লেখা থাকে।

এবার কোড শব্দের মানেগুলো ধরো। Ship মানে হলো ডিপ্লোমেটিক ব্যাগ। তারপর নম্বর 42 হলো ম্যাপস। আর নম্বর 50 হলো ম্যাকমোহন লাইনস। Raj মানে গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া, আর নম্বর 24 হলো চায়না-পাক ফ্রণ্টিয়ার। 210`00 মানে দোসরা ডিসেম্বর ঠিক ন'টার সময়।

এবার কোড শব্দগুলো পাল্টানো যাক্ মানিকলাল।

TOP SECRET

FROM FOREIGN KARACHI

TO PAKHICOM NEW DELHI

For military attache only.

Begins Send urgently maps on Mcmohan line available with Government of India stop If satisfied with maps shall discuss about 'Mcmohan line and China Pak frontier with China stop meeting on 2nd December at 0900 Hrs.

যাক্, এবার তোমাকে বলি, এই টেলিগ্রাম পেয়ে আমরা কাজ শুরু করলুম। দিল্লীর তার অফিসে আমাদের লোক কাজ করতো। তারই মারফৎ আমরা টেলিগ্রামের একটা কপি পেয়েছিলুম। এইখানে তোমাকে একটা কথা বলে রাখি মানিকলাল, ভারত সরকারের প্রতি দপ্তরেই আমাদের লোক আছে।

এবার আমরা সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার অফিসে হানা দিলুম। সমস্ত ম্যাকমোহন লাইনের একটা নকল ম্যাপ তৈরী করা হলো। সার্ভে অব ইণ্ডিয়াতে আমাদের যে লোক ছিলো তারই মারফৎ আমরা এই নকল ম্যাপ ডিফেন্স মিনিষ্ট্রিতে পাঠালুম আমাদের নকল ম্যাপ ডিফেন্স মিনিষ্ট্রির টপ সিক্রেট ফাইলে স্থান পেলো। বলতে পারো আমরা একসঙ্গে দুই কাজ হাসিল করলুম ভারত সরকারের আর্মি হেড কোয়ার্টারকে ধোঁকা দিলুম আর সেই সঙ্গে পাকিস্তানকেও বোকা বানালুম। কারণ কয়েক দিনের ভিতর আমাদের নকল ম্যাপ তেজপুরে জেনারেল কলের ক্যাম্পে গেলো। তেজপুরে তখন সিদোয়ানী এসে আছে। যুদ্ধ বাধবার ঠিক কয়েক দিন আগে সিদোয়ানী বেশ তৎপর হয়ে উঠলো। ইতিমধ্যে আমাদের পাকিস্তানী বন্ধু ব্রিগেডিয়ার আব্বাস

গিদোয়ানীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছেন। অর্থাৎ গিদোয়ানী ডবল এজেন্টের কাজ শুরু করেছে।

কিছুদিন আগে গিদোয়ানী জেনারেল কলের ক্যাম্প থেকে এই ম্যাপ চুরি করে। চুরি করবার সময় গিদোয়ানী নিজেও জানতো না যে ম্যাপগুলো জাল। সে বিশ্বাস করেছিলো যে ম্যাপগুলো সব আসল নক্শা। ম্যাপ চুরি করবার পর গিদোয়ানী বেশ সতর্কতা অবলম্বন করে। আমাদের এবং ব্রিগেডিয়ার আব্বাসকে টেলিগ্রাম করে জানায় যে ম্যাপ সংগ্রহ করেছে এবং শিগ্‌গিরই লখনউ আসছে। লখনউ-এ আসার আসবার প্রধান কারণ হলো দিল্লীর পুলিশের দৃষ্টি এড়ানো। লখনউ-এ পুলিশের নজরে পড়বার সম্ভাবনা কম। তার পর গিদোয়ানীর আর একটা টেলিগ্রামে জানলুম যে ম্যাপ তোমার মারফৎ পাঠানো হয়েছে। কারণ ইতিমধ্যে ম্যাপ চুরি যাবার কথা পুলিশ জানতে পেরেছে এবং চোরের সন্ধানে চারদিকে ঘুরছে। এই জন্যই ম্যাপসহ কালো এটাচী কেসটা গিদোয়ানী তোমার হাতে তুলে দিলো। কারণ গিদোয়ানী জানতো যে পুলিশ তোমাকে সার্চ করবে না। হাজার হোক তুমি সরকারী কর্মচারী, একজন মিলিটারী আদমি। তুমি সন্দেহ এক্তিয়ারের বাইরে।

এখানে সমাদ্দার একটু থামতেই আমি মুখ খুললুম। জিজ্ঞেস করলুম: মাপ করবেন মিঃ সমাদ্দার, আপনাকে একটা প্রশ্ন না করে পারছি না। আপনি নিজে যদি জানতেন যে গিদোয়ানী নকল ম্যাপ নিয়ে আসছে তাহলে ঐ কালো এটাচী কেসের সন্ধানে তার হোটেলের ঘরে ঢুকেছিলেন কেন?

: তোমার প্রশ্নে যুক্তি আছে মানিকলাল, সমাদ্দার বললেন,—কিন্তু মনে রেখো আমি ঐ কালো এটাচী কেস এবং নকল ম্যাপের সন্ধানে গিদোয়ানীর ঘরে যাইনি। সেখানে গিয়েছিলুম গিদোয়ানীর সঙ্গে দেখা করতে। ম্যাপ চুরি করবার সময়ে জেনারেল কলের ক্যাম্প থেকে গিদোয়ানী আরও কতকগুলো মূল্যবান দলিল চুরি করে। এই কথা গিদোয়ানী আমাদের জানালেও ব্রিগেডিয়ার আব্বাসকে জানায়নি। আমি সেই সব কাগজপত্র সংগ্রহ করতে গিয়েছিলুম। সেখানে গিয়ে দেখলুম যে তার আগেই সে সব কাগজ তুমি সংগ্রহ করে নিয়ে গেছো। গিদোয়ানীর সঙ্গে দেখা করার আর একটা কারণ ছিলো। আমি যাচাই করতে গিয়েছিলুম ঐ সব ম্যাপ সত্যিই নকল কিনা? কারণ আমাদের মনে একটা আশংকা ছিলো যদি ঐ ম্যাপ সাচ্চা মাল হয় তাহলে আমাদের যথেষ্ট বেগ পেতে হবে। চীনি কর্তারা আমাদের আর আস্তো রাখবে না। কারণ আমরা চাইনি যে আসল ম্যাপ পাকিস্তানের হাতে পড়ুক।

মানিকলাল, সব কথা সরল মনে তোমাকে খুলে বললুম। এবার তোমার কাছ থেকে আমরা ঐ সব মূল্যবান কাগজগুলো চাই। গিদোয়ানীর বুক পকেটে যে সব কাগজ পেয়েছিলে, বলো, কোথায় সেই সব কাগজ? আমরা জানি সেই সব কাগজ এখন তোমার জিম্মায়। বলো, এবার কী করবে? আমাদের ঐ সব কাগজের বিশেষ প্রয়োজন। দেবে, না দেবে না, তাই বলো?

চট্ করে সমাদ্দারের প্রশ্নের জবাব দিতে পারলুম না। কারণ আমার ছিলো দু'দিকেই বিপদ। ওদিকে ব্রিগেডিয়ার আব্বাস আমাকে হুমকি দিয়েছেন যে, যদি এটাচী কেসটা ওকে না দিই তাহলে আমার জীবন বিপন্ন হবে। ভারত সরকারের কাছে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হবে। বলা হবে আমি দুশ্চরিত্র লোক। চীনিদের স্পাই। এদিকে সমাদ্দারও নাছোড়বান্দা আমার হাত থেকে কাগজ সংগ্রহ না করে উনি আমাকে রেহাই দেবেন না। সমাদ্দারের হাত থেকে যে সহজে মুক্তি পাবো না তা আমি জানতুম। কী করবো ভেবে ঠিক করতে পারলুম না। মনে দ্বিধা সংকোচ হলো। চুপ করে রইলুম।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সমাদ্দার আবার বললেন,

: কী ভাবছো মানিকলাল, ভাবনার কিছু নেই। এই জীবন এক গোলক-ধাঁধা। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে অনেক বিস্ময়কর আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। সে সব ঘটনা সংঘাতে জীবনটাই পরিবর্তিত হয়ে যায়। জীবনের এই পরিবর্তন হাসি-মুখে বরণ করে নেয়াই হলো বুদ্ধিমানের কাজ।

মানিকলাল, তুমি ছিলে ভারত সরকারের কর্মচারী। আজ ঘটনাচক্রে তুমি হয়েছো স্পাই। সেলার এণ্ড বায়ার অব নিউজ। আমাদের সঙ্গী। না মানিকলাল, আজ আর তোমার ফেরবার পথ নেই।

আমি চুপ করে রইলুম। কারণ, জবাব দেবার মতো আমার কোন ভাষা ছিলো না। ভাবলুম মুখ বন্ধ করে থাকাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। তর্ক-বিতর্ক করে লাভ নেই।

: জীবনে একদিন আমিও ভুল করেছিলুম। আজ তার প্রায়শ্চিত্ত করছি। প্রথমে খানিকটা অনুতাপ হয়েছিল। কিন্তু আজ মনে দুঃখ বা গ্লানি নেই।

সমাদ্দার বলে চললেন,– জানি আজ তোমার মনে দ্বিধা এসেছে। কিন্তু এই দ্বিধা ক্ষণিকের। আজ আর অতীত নিয়ে চিন্তা করে লাভ নেই। ভবিষ্যতকে দেখতে হবে। বুদ্ধিমানের কাজ হবে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করা।

তবু আমি চুপ করে রইলুম। সমাদ্দারের কথায় যুক্তি ছিলো। অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছি। আর ফেরবার পথ নেই। কী করবো, স্পাই-এর জীবনকেই গ্রহণ করবো কিনা ভাবতে লাগলুম।

সমাদ্দার আবার বললেন : ভাবছো মানিকলাল, ভাববার কিছু নেই। এত ভাল সুযোগকে অবহেলা করো না। জয়েন আস।

সমাদ্দারের কণ্ঠে ছিল বন্ধুত্বের সুর। তার এই অনুরোধ আমি উপেক্ষা করতে পারলুম না।

: বেশ, আমি আপনাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজী আছি।

আমার জবাব শুনে সমাদ্দার খুশি হলেন। মিসেস সেনের মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠলো। সমাদ্দার আমার হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন : এতোক্ষণ তুমি বুদ্ধিমানের মতো জবাব দিয়েছো। মানিকলাল জীবনে দেখবার ও জানবার মতো অনেক কিছু আছে। গতানুগতিক জীবনযাপন করে কোন লাভ নেই। জীবনকে পুরোপুরি জানবার চেষ্টা করো। যাক, আজ থেকে তুমিও হলে আমাদের সহকর্মী, বন্ধু। ওয়ান ফর অল, অল ফর ওয়ান। মানিকলাল, এখন থেকেই হবে তোমার জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। এবার শোন, এবার কাজের কথা শুরু করা যাক। গিদোয়ানীর বুক পকেটে যে কাগজগুলো ছিলো, আমাদের সেই জরুরী কাগজগুলো চাই।

: কিন্তু আমার কাছে তো সেইসব কাগজ নেই, আমি জবাব দিলুম।

: কোথায় ? সমাদ্দার জিজ্ঞেস করলেন।

: হোটেলে।

: তাহলে সেই কাগজ এতোক্ষণে নিশ্চয় ব্রিগেডিয়ার আব্বাস চুরি করে নিয়েছেন, সমাদ্দার বললেন।

: না, সেই কাগজ ওরা কখনই খুঁজে পাবে না মিঃ সমাদ্দার, আমি জবাব দিলুম,—সেই কাগজ আমি বাথরুমের জলের কলের নলের ভেতর লুকিয়ে রেখেছি। আমার মন বলছে, সে সব কাগজ এখনো সেখানেই আছে।

: বেশ, তাহলে চলো তোমার হোটেলেই যাই, সমাদ্দার বললেন।

মিসেস সেন প্রতিবাদ করে বললেন . না, মানিকলালের হোটেলে যাওয়া ঠিক সমীচীন হবে না। বরোং মানিকলালই ঐসব কাগজ নিয়ে আমাদের কাছে আসুক।

আমিও মিসেস সেনের কথায় সায় দিলুম। বললুম,

: ঠিক বলেছেন মিসেস সেন, আপনারা আসবেন না। আমিই হোটেলে ফিরে যাচ্ছি। সেখান থেকে সব কাগজপত্র নিয়ে আসছি।

সমাদ্দার আমার এই প্রস্তাবে রাজী হলেন। আমি হোটেলে ফিরে গেলুম। বাথরুম থেকে গিদোয়ানীর বুক পকেটের কাগজগুলো উদ্ধার করলুম। হোটেলের রিসেপশন ক্লার্ক জানালো, সকালবেলায় একটি লোক এসে আমার

কালো এটাচী কেসটা নিয়ে গেছে।

এই বলে রিসেপশন ক্লার্ক আমাকে একটি ছোট কাগজের স্লিপ দেখালো। সেই স্লিপটায় আমার নাম সই করা ছিলো। আমি বুঝতে পারলুম, ব্রিগেডিয়ার আব্বাস আমার সই জাল করেছেন। মনে মনে হাসলুম। ভয় পাবার কী আছে, ব্রিগেডিয়ার আব্বাস নকল ম্যাপ চুরি করেছেন। করুকগে।

* * *

সমাদ্দার আমাকে বললেন: মানিকলাল, স্পাই-এর সর্বপ্রথম কাজ হলো গোপনীয় খবর সংগ্রহ করা। তুমি হলে সংবাদের ব্রোকার। কিন্তু তোমার এই কাজে প্রতি পদে আছে উত্তেজনা আর বিপদ। কাজে একটু বেসামাল হলেই তোমার জীবন বিপন্ন হবে। তোমার কাজ হবে এয়ারফোর্সের গোপনীয় সংবাদ সংগ্রহ করা। সংবাদ সংগ্রহ করার পর জরুরী গোপনীয় ডকুমেণ্ট চুরি করাই হবে তোমার কাজ। কিন্তু তুমি একা এই কাজ করতে পারবে না। ডিফেন্স মিনিষ্ট্রীতেও আমাদের একজন লোক আছে। তার নাম সমীর সেন। প্রকাশ্যে মিসেস সেনের স্বামী। তোমরা দু'জনে মিলে সব গোপন খবর সংগ্রহ করবে। আমার কাজ হবে তোমাদের দু'জনের কাজে সুপারভাইজ করা আর সেইসব খবর হংকং-এ বড়ো কর্তাদের কাছে পাচার করা। বলতে পারো আমিই হলুম তোমাদের লোকাল বস।

* * *

দু'দিন বাদে আমি তেজপুরে ফিরে গেলুম। কিন্তু আমার পুরানো জীবন আর ফিরে পেলুম না। প্রথমতঃ আমার কাজে একেবারেই মন ছিলো না। তারপর লক্ষ্য করলুম যে, আমার বড়ো কর্তারা আমার ওপরে বেশ কড়া নজর রাখছেন। আমার গতিবিধি মন্থর হয়ে এলো।

আমি ঠিক করলুম দিল্লীতে ফিরে যাবো। সমাদ্দারকে জানালুম। তিনি আমাকে সমর্থন করলেন। বললেন: মানিকলাল, দিল্লীতে ফিরে আসাই হবে তোমার বুদ্ধিমানের কাজ। আমরা আছি, সমীর সেন আছে। সবাই একজোট হয়ে কাজ করা যাবে।

আমি বদলীর দরখাস্ত করলুম কর্তাদের কাছে। কয়েকদিনের ভেতর সে আর্জি মঞ্জুর হলো। কেন জানিনে কর্তাদের ব্যবহারে বেশ একটু বিস্মিতও হলুম। এই তো কয়েক সপ্তাহ আগে ওরাই আমাকে ছুটি দিতে চাইছিলেন না। আজ হঠাৎ কেন ওদের মত পরিবর্তন হলো।

আমি দিল্লীর এয়ারফোর্স হেড কোয়ার্টারে এলুম। কর্তারা আমায় বিশেষ কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ দিলেন না। আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে কাজ পেলুম।

আমার কাজ হলো দপ্তরের সরকারী জিনিষপত্র রক্ষণাবেক্ষণ করা।

সমাদ্দার প্রায়ই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। একদিন সমাদ্দারকে বললুম: সমাদ্দার সাহেব, জানিনে কেন আমার মন বলছে যে কর্তারা আমাকে সন্দেহ করছেন।

আমার কথা শুনে সমাদ্দার একটু গম্ভীর হলেন। বললেন,

: কী করে বুঝলে ?

: আমার মনের সন্দেহের কথাই আপনাকে বললুম। এর চাইতে আর বেশি কোন প্রমাণ আপনাকে দিতে পারবো না।

সমাদ্দার এই ব্যাপার নিয়ে আর কোন প্রশ্ন করলেন না।

অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে কাজ করার অবিশ্যি একটা সুবিধে ছিলো। এইখানে ছোট বড়ো অফিসারদের সঙ্গে আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হলো। তাদের কাছ থেকে বহু সত্যি মিথ্যে গল্প শুনতুম। ওদের কেরানী ও স্টেনোদের বললুম যে, তাদের কাজ শেষ হবার পর পুরানো কার্বন পেপারগুলো আমার ফেরৎ চাই। এমনি করে টপ-সিক্রেট চিঠির নকল কপি বের করা যায়। অবিশ্যি এই কাজ সহজ নয়। এক রকম রাসায়নিক পাউডারের দরকার হয়। আমি কার্বন পেপারগুলো এনে সমাদ্দারের হাতে দিতুম। বাকী কাজটা সমাদ্দার করতেন।

কয়েকদিন বাদে স্টেনোগ্রাফারদের নির্দেশ দিলুম যে সর্টহ্যাণ্ড নোটবুকগুলো সেকশনে ফেরৎ না দিলে কোন নতুন নোট বই দেওয়া হবে না। স্টেনোগ্রাফাররা নোট বই অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে ফেরৎ দিতে লাগলো। সেই বই থেকে আমি সিক্রেট নোটিং-এর কপি করতে লাগলুম।

হঠাৎ একদিন বড়ো কর্তারা নির্দেশ দিলেন যে, কার্বন, সর্টহ্যাণ্ড নোট বই ইত্যাদি সিকিউরিটি সেকশনে ফেরৎ যাবে। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফিসে নয়। এই আদেশ যে কেন দেয়া হলো তা আজ অবধি বুঝতে পারিনি। আমার মনে সন্দেহ হয়েছিল যে সেই আদেশের পশ্চাতে নিশ্চয় কোন গুরুতর কারণ আছে। হয়তো বড়োকর্তারা আমাকে সন্দেহ করেন। হয়তো পুলিশ জানে আমি হলুম স্পাই।

'স্পাই' কথাটা ভাবতেই আমার মাথা গরম হয়ে উঠলো।

আমি আবার সমাদ্দারকে বললুম যে অফিসের কর্তারা নিশ্চয় আমাকে সন্দেহ করছেন। কিন্তু সমাদ্দার আমার কথা একেবারেই আমল দিলেন না। শুধু বললেন : মানিকলাল, আমাদের কাজের জন্য তুমি একেবারেই অপরিহার্য। বহু কাজের জন্যই তোমাকে আমাদের প্রয়োজন। এই কাজে তোমাকে টিকে থাকতেই হবে, যেমন করে হোক।

সমাদ্দার আরও বললেন : সমীর সেন আমাদের জন্তে অনেক জরুরী কাজ করছে। কিন্তু তোমাদের দু'জনের কাজের ভেতর কোন কো-অর্ডিনেশন নেই আমি চাই তোমরা একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করো। কারণ, বাইজিং থেকে আমি নির্দেশ পেয়েছি যে কয়েকদিনের ভেতর আমাদের অনেক মূল্যবান খবর সংগ্রহ করতে হবে। কিছুদিন আগে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর পরাজয়ের কারণ জানবার জন্য এক কমিটি বসেছিলো। সম্প্রতি সেই কমিটি সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করেছে। সমীর সেনকে বলেছি এই কমিটির রিপোর্টের একটা কপি সংগ্রহ করতে। হ্যাঁ, সেই রিপোর্টটা আমি কর্তাদের কাছে পাঠাতে চাই। অতএব আমি চাই দু'জনে একসঙ্গে কাজ করো।

সমাদ্দারের কথার পরে আমি সমীর সেনের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করলুম। প্রতিদিন বিকেলে আমাদের দেখা হতো। খবরাখবর সংগ্রহ করা নিয়ে আমরা আলাপ-আলোচনা করতুম। এই আলাপ-আলোচনার ভেতর দিয়ে আমাদের মধ্যে বেশ হৃদ্যতা হলো। মাঝে মাঝে মিসেস সেনও আমাদের আলোচনায় যোগ দিতেন।

প্রায় মাসখানেক কেটে গেলো। এর মধ্যে সমাদ্দারের সঙ্গে আমার বেশি দেখা হয়নি। কিন্তু হঠাৎ একদিন সমাদ্দার এসে উপস্থিত হলেন। বললেন : মানিকলাল, তোমার জানাশোনা এমন কোন লোক আছে যে দুঃসাহসিক, জীবনকে পরোয়া করে না, যে আমাদের সঙ্গে কাজ করতে রাজী হবে, এমন কোন লোক?

সমাদ্দারের এই প্রশ্নে আমি বেশ একটু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলুম : হঠাৎ কোন দুঃসাহসী লোকের সন্ধান করছেন কেন?

: কারণ, আমরা অনেকগুলো জরুরী টপ-সিক্রেট কাগজ সংগ্রহ করেছি। আমরা ঠিক করেছি এইসব ডকুমেণ্টের সারাংশ রেডিও মারফৎ পিকিং-এর কর্তাদের কাছে পাঠাবো। রেডিও ট্রান্সমিশন ও মাইক্রোফিল্মের কাজের জন্ত আমাদের একজন কর্মঠ লোকের প্রয়োজন। কিন্তু লোকটি বিশ্বাসী হওয়া চাই, মানিকলাল। কারণ, আমরা সবাই জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছি। অতএব জেনেশুনে কোন সন্দেহভাজনকে দলে টানতে পারিনে।

: কারু খোঁজ পেলেন? আমি প্রশ্ন করলুম।

: না, এই ব্যাপার নিয়ে শলাপরামর্শের জন্তই তোমার কাছে এসেছি। তোমার জানাশোনা কেউ আছে কি? সমাদ্দারের কণ্ঠে বেশ খানিকটা উৎকণ্ঠা ছিলো।

আমি এবার অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করতে লাগলুম। বেশ কয়েক

বছর আগে, আমি তখন ছিলুম এয়ারফোর্সের পাইলট অফিসার। ক্যারিয়ার প্লেন নিয়ে প্রতি সপ্তাহে লণ্ডনে যেতুম। পথের মাঝে দামাস্কাসে তেল ভরবার জন্য নামতে হতো। প্রথম যৌবন, তখন আমার রক্ত ছিলো তাজা। এক কথায় তখন আমার জীবন ছিলো উচ্ছৃঙ্খল।

সে কি আজকের কথা! প্রায় বারো-চোদ্দ বছর আগেকার ঘটনা। একদিন দামাস্কাস বিমান বন্দরে নামলুম। প্লেন খানিকটা বিগড়ে গিয়েছিলো। মেকানিক বললো রাতটা দামস্কাসেই কাটাতে হবে।

এরোড্রোম থেকে সামিরামি হোটেলে এলুম। ঠিক শহরের মাঝখানে এই সামিরামি হোটেল। হোটেলের চারিদিকে বাজার, হৈ-হল্লা।

সারাটা সকাল তো আর হোটেলের বসে থাকতে পারি না, তাই খানিকটা সময় শহরের এদিকে-ওদিকে ঘোরাফেরা করে সন্ধ্যের পরে এলুম ওয়াইল্ড ক্যাট নাইট ক্লাবে। বারে গিয়ে বসলুম।

বারম্যান আমাকে দেখে বললো : ড্রিংকস স্যার?

: কালভাদো, আমি বললুম।

আমার মুখে কালভাদোর নাম শুনে বারম্যান বেশ একটু বিস্মিত হয়ে আমার পানে তাকালো, তারপর আবার বললো,

: ইণ্ডিয়ান স্যার?

: হ্যাঁ, আমি সংক্ষিপ্ত জবাব দিলুম। আমার কণ্ঠে কর্কশতার রেশ ছিলো। কিন্তু বারম্যান আমার কথায় কান দিলো না। বললো,

: আমার নাম মালকানি স্যার। গোবিন্দবিহারী মালকানি। কিন্তু আপনি আমাকে জি-বি এম বলে ডাকতে পারেন। আমিও ইণ্ডিয়ান। কিন্তু ওভারসিজ ইণ্ডিয়ান। আসলে আমার পাশপোর্ট ব্রিটিশ। আপনার সঙ্গে এই আমার পার্থক্য।

মালকানি আবারও কথা বলতে শুরু করলো। খানিক বাদেই আমি বুঝতে পারলুম যে, মালকানি হলো কথার ফুলঝুরি। একবার কথা বলতে শুরু করলে আর থামতে চায় না। হঠাৎ মালকানি আমাকে জিজ্ঞেস করলো।

: কোন প্রয়োজন আছে স্যার?

মালকানির কথায় আমি বিস্মিত হলাম। হতবাক হয়ে গেলুম একেবারে। লোকটা বলে কী? কিসের প্রয়োজন? মালকানি আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বললো।

: প্রয়োজন আছে স্যার, সুইট সিক্সটিন?

এবার আমি বুঝতে পারলুম মেয়েমানুষের কথা বলছে মালকানি।

মালকানির প্রস্তাব শুনে আমার কান রক্তিম হলো। শরীর গরম হয়ে উঠলো। এতো খোলাখুলি স্পষ্ট ভাষায় এই ধরনের প্রস্তাব আমাকে আজ অবধি কেউ করতে পারেনি। কী জবাব দেবো প্রথমে ভেবে পেলুম না। ওর প্রশ্নটাকে এড়িয়ে যাবার জন্যই বললুম: তোমার প্রশ্নের মানে আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না।

আমার জবাব শুনে মালকানি হাসলো। তারপর বললো,

: স্যার এটা হলো নাইট ক্লাব, কোন তীর্থক্ষেত্র নয়। জেরুজালেম বা ভ্যাটিকান সিটি নয়। স্রেফ পাপের জায়গা। এখানে সবাই আসে জীবন উপভোগ করতে। আমার কথা শুনুন, দেখবেন জীবনের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট দুর্দশার কথা ভুলে গেছেন।

জানিনে কেন সেদিন মালকানির কথায় সমস্ত অতীত ভবিষ্যতকে ভুলে গিয়েছিলুম। ভুলে গেলুম আমি পরদেশী। যে কোন মুহূর্তে আমার বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে। আমি মালকানিকে বললুম: অল রাইট, কোথায়?

: আসুন আমার সঙ্গে, জবাব দিলো মালকানি।

মালকানি আমাকে সেই নাইট ক্লাবের পেছন দিকের একটা ঘরে নিয়ে গেলো। সেখানে একটি মেয়ে বসেছিলো। মেয়েটির নাম হানা।

হানার বয়স বেশি নয়, পঁচিশ ছাব্বিশ হবে। খুব সুন্দরী এমন কথা বলতে পারবো না। কিন্তু তার দেহে এমন একটা মাদকতা ছিলো যা পুরুষকে আকর্ষণ করে।

এর পরবর্তী কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করে লাভ নেই। ব্রিগেডিয়ার আব্বাস এই ব্যাপার নিয়ে আমাকে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করেছিলেন। সেদিনকার মনের দুর্বলতার জন্যেই আজ আমাকে সমাদ্দারের কাছেও এতো বড়ো খেসারৎ দিতে হচ্ছে। আজ আবার সেই অতীত স্মৃতি ফিরে পেলুম। মালকানির কথা মনে পড়লো আবার। কেন যে তার সঠিক কারণ বলতে পারবো না। কিন্তু আমার মনে হলো এই কাজের জন্যে মালকানিই হলো সব থেকে উপযুক্ত পাত্র। এই কাজে ওকে নিযুক্ত করাই হবে সব চেয়ে সুবুদ্ধির কাজ। কারণ, মালকানি শুধু কথা বা কাজেই পটু নয়, জাল জুয়াচুরিতেও ওস্তাদ। দামাস্কাসের সেই রাতের পর বহুবার মালকানির সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছিলো। এইসব দেখা-সাক্ষাতের ভেতর দিয়েই আমি মালকানির কর্মদক্ষতার পরিচয় জেনেছিলাম। কয়েকদিনের আলাপেই মালকানির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিলো।

আজ আমার মাথায় শয়তানি বুদ্ধি চাপলো। কেন জানিনে আজ মালকানির বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হলো। কারণ, দামাস্কাসের

সেই প্রথম রাতটার কথা আমি আজও ভুলতে পারিনি। মনে হলো, আমার অধঃপতনের কারণই হলো মালকানি। তাই সমাদ্দারকে আমি বললুম,

: সমাদ্দার সাহেব আমি একটি লোককে চিনি। একজন ওভারসিজ ইণ্ডিয়ান। ভারতের সঙ্গে আজ আর তার কোন সম্পর্কই নেই। কিন্তু আমাদের এই কাজের জন্যে তার চাইতে উপযুক্ত লোক আপনি আর কোথাও খুঁজে পাবেন না। অনেকদিন আগে দামাস্কাসে তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। শুধুমাত্র পরিচয় বললে মিথ্যে বলা হবে, হৃদ্যতাও হয়েছিলো কিছু। দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গেই বলতে পারি, ওর চেয়ে উপযুক্ত লোক আর কোথাও খুঁজে পাবেন না।

: ওভারসিজ ইণ্ডিয়ান! দি আইডিয়া! সমাদ্দার আমাকে বললেন,— খুব ভালো প্রস্তাব করেছো মানিকলাল। কারণ আজ আমাদের এমন লোকেরই প্রয়োজন যার ওপর পুলিশের কোন সন্দেহ বা নজর নেই। তুমি তো জানো আমরা কী করি না করি সবই ওরা নজরে নজরে রাখে। অতএব, আমাদের এই দলে এমন কাউকে টানতে হবে যার ওপর পুলিশের কোন শুভদৃষ্টি নেই। তাহলে আমাদের কাজে আর ঝামেলা থাকবে না।

: সেন মালকানি ইজ ইওর ম্যান, আমি জোর গলায় বললুম। লোকটির নাম গোবিন্দবিহারী মালকানি। সমাদ্দার সাহেব, ও শুধু কাজে-কর্মেই কবিতকর্মা নয়, জাল-জুয়াচুরীতেও ওর জুড়িদার কেউ নেই। শুধু ওর একটা দুর্বলতা আছে। সে হলো মেয়েমানুষের দুর্বলতা।

সমাদ্দার চোখ বুঁজলেন। আমি বুঝতে পারলুম যে, উনি চিন্তা শুরু করেছেন। যখনই সমাদ্দার চোখ বোজান তখনই চিন্তা করেন। কী করবেন এখন হয়তো তাই ভাবতে শুরু করেছেন।

খানিক বাদে সমাদ্দার জিজ্ঞেস করলেন,

: মানিকলাল তুমি মালকানিকে ভালো করে চেনো?

সমাদ্দারের কণ্ঠে ছিলো কৌতূহল ও আগ্রহের সুর। আমি বুঝতে পারলুম, আমার প্রস্তাব সমাদ্দারের মনঃপুত হয়েছে।

: আপনি অনায়াসে মালকানিকে বিশ্বাস করতে পারেন, আমি বললুম।

: মানিকলাল তুমি জানো আমাদের দলের কয়েকজন বেরুটে থাকে। আমি আজই তাদের কাছে খবর পাঠাচ্ছি, তোমার বন্ধু মালকানির খোঁজ করতে। হ্যাঁ, ওরাই মালকানির সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করবে। যদি আমাদের কাজের জন্ম মালকানি উপযুক্ত বিবেচিত হয়, তাহলে নিশ্চয় আমরা ওকেই নিযুক্ত করবো আমাদের কাজে।

মালকানি ভারতবর্ষে আসবে শুনে আমি একটু আনন্দিত হলুম। এরপর

থেকে রোজই দিন গুণতে লাগলুম কবে মালকানি ভারতবর্ষে আসবে।

* * *

তারপর আরো কয়েকটা দিন নিরুপদ্রবে কেটে গেলো। সমীর সেনের সঙ্গে প্রায়ই আমি কফি হাউসে দেখা করতুম। বহু বিষয় নিয়ে আমাদের আলোচনা হতো। সমীর সেন খবর সংগ্রহ করতেন, আমি সেই খবর সমাদ্দারের কাছে পৌঁছে দিতুম। সমাদ্দার আমাকে বলতেন : চমৎকার কাজ! কিন্তু আমাদের প্রধান সমস্যাটা কী জানো? সমস্যা, কী করে এই খবর পিকিং-এর কর্তাদের কাছে পৌঁছে দিই।

এরপর আর একদিন সমাদ্দার আমাকে বললেন : মানিকলাল, তুমি আমাকে একদিন এক গুভারসিজ ইণ্ডিয়ানের নাম বলেছিলে। কী নাম যেন তার? হ্যাঁ, গোবিন্দবিহারী মালকানি। তোমার বন্ধু না সাগরেদ, জানিনে। আমাদের সঙ্গে কাজ করতে সে ভারতবর্ষে আসছে। দু'দিন আগে বন্ধুদের কাছ থেকে খবর পেয়েছি যে শিগ্‌গিরই মালকানি এই দেশে আসবে।

বেরুটের যে নাইট ক্লাবে মালকানি কাজ করতো আমার বন্ধুরা সেখানে গিয়েই তাকে ধরেছে। নাইট ক্লাবের মালিক এক সময় আমাদের বিস্তর টাকা খেয়েছিলো। অতএব ওকে আমাদের দলে টানতে বিশেষ অসুবিধে হয়নি। প্রথমটায় আমাদের সঙ্গে কাজ করতে মালকানি রাজী হয়নি। আমরা কিছু ভয় দেখাবার পরে সে রাজী হয়েছে। মানিকলাল, তুমি ঠিকই বলেছো তোমার বন্ধু মালকানি অতি ধুরন্ধর। একটি আস্তো শয়তান। বেরুট থেকে বন্ধুরা লিখেছে যে, তার আসল পেশা হলো স্মাগলিং। আশ্চর্য মানিকলাল, স্মাগলার থেকে স্পাই। এর ভেতরে কোন পার্থক্য আছে কী? সমাদ্দার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন।

সমাদ্দারের কথা শুনে আমি হাসলুম। বললুম : সমাদ্দার সাহেব, কারু গলা কাটতে মালকানির একটুও দ্বিধা বা সংকোচ হয় না।

: আমি কাউকে ভয় করিনে মানিকলাল। ভয় করা আমার ধাঁত নয়।

সমাদ্দারের কোন ভয় হয়নি বটে কিন্তু জানিনে কেন আমার মন বলতে লাগলো মালকানি আসার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিপদও ঘনিয়ে আসবে। নিজের মনকে নিজেই সান্ত্বনা দিতে লাগলুম। বললুম : ভয় পাবার কিছু নেই। হাজার হোক মালকানি তো দৈত্যদানব নয়। আমাদের মতই সাধারণ মানুষ। ওকে আমি ভয় করবো কেন?

মনের সে চিন্তার কথা তার কাছেও ভাষায় প্রকাশ করলুম না। বললুম : চমৎকার! আইডিয়াল সল্যুশন। সমাদ্দার সাহেব, আপনি মালকানির

জুড়িদার আর কোথাও পাবেন না। যাক্, মালকানি এলে অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে কাজ করা যাবে।

সমাদ্দার কিন্তু আমার কথায় কোন জবাব দিলেন না। চুপ করে রইলেন। তারপর আবার একটু বাদেই চলে গেলেন।

*   *   *

এরপর একদিন সত্যিসত্যিই মালকানি এলো। প্রথমে আমি জানতুম না যে মালকানি দিল্লীতে এসেছে। জিমখানা ক্লাবে বসে আমি হুইস্কি টানছিলুম। ক্লাবে বসেই সবার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়। বহু লোকের সঙ্গে বিস্তর কথা বলা যায়। জরুরী গোপনীয় খবরও সংগ্রহ করতে পারি। মদ টেনে আমি বেশ রাত্রিতে বাড়ী ফিরি।

হঠাৎ বারের কাউণ্টারে আমার নাম শুনতে পেলুম। আমার কান তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো। মানিকলাল ?—বারম্যান বললো। তার সেই উচ্চ কণ্ঠস্বর আমারও কানে প্রবেশ করলো। আমি তাকিয়ে দেখলুম একটা লোক বারম্যানের সঙ্গে কথা বলছে। খানিক বাদেই লোকটি আমার কাছে এলো। তারপর আমাকে জড়িয়ে ধরে বললো। মানিকলাল !

জানিনে কেন হঠাৎই আমার মুখ দিয়ে কথাটা বেরুলো। জি-বি-এম ! মালকানি !

: ছাটস্ রাইট। মালকানি জবাব দিলো,—আমি ভেবেছিলুম তুমি আমাকে চিনতে পারবে না। হাজার হোক অনেকদিন আগেকার কথা। এতোদিন বাদে আমাকে চেনা কী চাট্টিখানি কথা ! মানিকলাল, দামাস্কাসের সেই রাত্রির কথা কি মনে পড়ে ? আমি আর হানা । এবার তোমার খবর কী বলো ?

দামাস্কাসের কথা পড়তেই আমার মনটা টন টন করে উঠলো। কারণ, সেই রাতটার কথা আমি চেষ্টা করেও ভুলতে পারিনি। হয়তো ভুলতে পারবোও না কোনদিন। কথাটা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ আমার ব্রিগেডিয়ার আব্বাসের কথাও মনে পড়লো। হ্যাঁ, উনি আমাকে সেই কথাটা মনে করিয়ে দিয়ে ব্ল্যাকমেলিং করতে চেয়েছিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ মালকানির কথাটা এড়িয়ে গেলুম। শুধু বললুম : তোমাকে দেখে ভারী আনন্দিত হলুম জি-বি-এম। অনেকদিন বাদে আবার মোলাকাৎ হলো। তারপর, আজকাল কোথায় থাকো ?

: বেরুটেই। জানো মানিকলাল, বেশ আনন্দেই একটা নাইট ক্লাবে কাজ করছিলুম। হঠাৎ একদিন আমার মনিব এসে আমাকে বললো, মালকানি কিছুদিনের জন্য তোমাকে ভারতবর্ষে যেতে হবে। সেইখানে আমাদের একটা

বিশেষ কাজ আছে। তোমাকে সেই কাজের ভার নিতে হবে। সেল্‌স ম্যানের কাজ। হান্‌জ উন্‌ত মারিয়া কোম্পানীর সেল্‌সম্যান। রেডিওর কুষ্টাল বিক্রির ব্যবসা। সেই কুষ্টাল বিক্রি করতেই আজ আমি ভারতবর্ষে এসেছি। দেশের মাটিতে পা দিয়েই তোমার কথা মনে পড়লো। তোমার খোঁজ করলুম। শুনলাম তুমি জিমখানা ক্লাবেই আছো।

আমি মালকানির কথা শুনে মনে মনে হাসলুম। মালকানি হান্‌জ উন্‌ত মারিয়া কোম্পানীর সেলস্‌ম্যান। কথাটা যে সম্পূর্ণ মিথ্যে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তবুও আমি কিন্তু এই ব্যাপার নিয়ে কোন প্রশ্ন করলুম না। একটা সিগারেট বের করে ওর হাতে দিয়ে বললুম : সিগারেট ?

: আমি শুধু মারলবরো খাই, মালকানি জবাব দিলো।

: দ্যাটস রাইট। আমার সিগারেটের ব্র্যাণ্ডও মারলবরো। এই বলে মালকানির হাত ধরে আমি একটা ঝাঁকুনি দিলুম। তারপরে আবার বললুম,— মালকানি, তুমি আমাকে এক মস্তো চিন্তার হাত থেকে রেহাই দিলে। যাক, তুমি তাহলে আমাদের সঙ্গেই কাজ করছো ?

: মানিকলাল, আমার কাজটা যে কী তার কোন হদিসই আমি এখনো পাইনি। বেরুটে থাকাকালীন কর্তারা বললেন, জি-বি-এম, ভারতবর্ষে যাও। তোমার পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে গিয়ে দেখাসাক্ষাৎ করো। ওরাই তোমাকে বলবে কী হবে তোমার কাজ। যাক, আজ তোমার দেখা পেয়েছি। এবার বলো কী খবর ? কোথায় কার সঙ্গে দেখা করলে কাজের পুরো ফিরিস্তি পাবো।

: সমাদ্দারের সঙ্গে দেখা হয়েছে ? আমি জিজ্ঞেস করলুম।

: সমাদ্দার কে ? মালকানি একটু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলো।

মালকানির জবাব শুনে আমি বেশ একটু হতবাক হলুম। মালকানি ভারতবর্ষে এসেছে অথচ আজ অবধি আমাদের লোক্যাল বস্‌-এর সঙ্গে দেখা হয়নি ! কথাটা ভাবতেও আমি বিস্ময় অনুভব করলুম।

কেন সমাদ্দার আজ অবধি মালকানির সঙ্গে দেখা করেন নি ? নিশ্চয় এর পেছনে কোন কারণ আছে। কিন্তু আমার মনের কথা মালকানিকে খুলে বললুম না। শুধু বললুম : অধৈর্য হয়ো না। শিগগিরই তার দেখা পাবে। তোমার কাজের পুরো ফিরিস্তিও তার কাছ থেকেই জানতে পারবে। যাক, এবার তাহলে পুরোনো বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা করো। সবার সঙ্গে আলাপ পরিচয়টা আবার ঝালাই করে নাও।

খানিক বাদেই মালকানি আমাকে জিজ্ঞেস করলো,

: তুমি সতীলাকে চেনো ?

এবার আমার বিস্মিত হবার পালা। মালকানিকে নিরাশ করতে হলো। স্পষ্টই বললুম : না, আমি সতীলা নামের কাউকে চিনিনে।

: আমি মনে করেছিলুম তুমি সতীলাকে চেনো। এই কাজে আমাকে সতীলাই নিযুক্ত করেছে। তাই তোমাকেও সতীলার কথা জিজ্ঞেস করেছিলুম।

আমি মালকানিকে বললুম যে দু'একদিনের ভেতরেই অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আমি তার পরিচয় করিয়ে দেবো। ওর কাছে সমীর সেন ও মিসেস সেনের নাম করলুম। বললুম : সমীর সেন ডিফেন্স মিনিষ্ট্রীতে কাজ করে। ওখানকার গোপন খবরাখবর সেই সংগ্রহ করে। এসো না একদিন আমার বাড়ীতে, ওদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবো।

মালকানি বললো : নিশ্চয় আসবো।

সেদিন আমাদের আলাপ আলোচনা সেখানেই শেষ করলুম।

* * *

কয়েকদিন বাদেই মালকানিকে একদিন আমার বাড়ীতে নেমন্তন্ন করলুম। সেদিন সমীর সেন এবং মিসেস সেনও এলেন। মিসেস সেনকে আজ দেখতে ভারী সুন্দর লাগছিলো। আমি জানতুম মেয়েমানুষের প্রতি মালকানির বেশ দুর্বলতা আছে।

আমার নজর এড়ালো না যে, মালকানি বেশ লুব্ধ দৃষ্টিতে মিসেস সেনের পানে তাকিয়ে আছে।

মালকানি এবং মিসেস সেনের মধ্যে যে দৃষ্টি বিনিময় হয়েছিলো এ কিন্তু সমীর সেনেরও দৃষ্টি এড়ালো না। সমীর সেনের মুখের ভাব দেখেই আমি বুঝতে পারলুম, উনি মালকানিকে দেখে একটুও সন্তুষ্ট হন নি। ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ নিয়ে তো আমাদের কাজ করা চলে না। বর্তমানে আমাদের মালকানিকে একান্ত প্রয়োজন। আমি স্পষ্টই জানতুম, রেডিওতে খবর পাঠানো এবং মাইক্রোফিল্মের কাজ মালকানি ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না। সমাদ্দার আমাকে স্পষ্টই বলেছিলেন : মানিকলাল, পুলিশ আমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছে। অতএব রেডিওতে খবর পাঠানো ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

আমি চেষ্টা করলুম মালকানি ও সমীর সেনের মধ্যে হৃদ্যতার সৃষ্টি করতো কিন্তু সমীর সেন বড়ো একরোখা লোক। সহজে তার মত পাল্টালো না।

আমাদের কাজকর্ম নিয়ে সেদিন অনেক কথা হয়েছিলো। আমরা কে কী করি তার একটা ফিরিস্তি মালকানিকে দিলুম। বুঝতে পারলুম, সেই

আলাপ-আলোচনায় মালকানি সন্তুষ্ট হয়েছে।

সমীর সেন সম্প্রতি বর্ডার এরিয়া কমিটির এক রিপোর্ট সংগ্রহ করেছে। এবার আমরা আলোচনা করতে লাগলুম কী করে এই রিপোর্ট পিকিং-এ কর্তাদের কাছে পাঠানো যায়।

মালকানি বললো : খবর পাঠানোর সব চাইতে সোজা পথ হলো রেডিওর মারফৎ খবর দেয়া।

আমি বললুম : আমরা সোজাসুজি পিকিং-এ খবর পাঠাই না। কারণ, আমাদের ট্রান্সমিটার মেশিন খুব শক্তিশালী নয়। আমরা যে খবর পাঠাই তা দিল্লীতেই আমাদের বন্ধুরা রিসিভ করেন। তারপর সেখান থেকে খুব হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে সেই খবর পিকিং-এ পাঠানোর ব্যবস্থা হয়।

জানিনে কেন হঠাৎ মালকানি বলে বসলো : সেই রিপোর্ট কী তোমার কাছেই আছে মানিকলাল ?

মালকানির প্রশ্ন শুনেই অবাক হলুম বটে কিন্তু আমার জবাবে সে বিস্ময়ের চিহ্ন প্রকাশ পেলো না।

: কেন ? আমি জিজ্ঞেস করলুম স্বাভাবিক গলায়।

: কারণ অতি সহজ ও সরল। মালকানি বললো,—আমি আগামী কাল বা পরশুই এই রিপোর্ট রেডিওতে ট্রান্সমিট করতে চাই। আর তোমার বাড়ী থেকে খবর পাঠানোই হবে সব থেকে সহজ। দেখতেই পাচ্ছো ধারে কাছে কোথাও কোন বড়ো বাড়ী নেই।

মালকানির প্রস্তাব শুনে সমীর সেন ও আমি দুজনেই হতভম্ব হলুম। শুধু বিস্মিত ও হতভম্ব নয়, আমি একটু ভয়ও পেলুম। আমার ভয় আর কিছু নয়, মালকানি যে আমার বাড়ী থেকেই খবর পাঠাতে চায় তাই। তখন যদি পুলিশ এসে আমার বাড়ীতে হানা দেয় তাহলে কী হবে ? আমি যে দেশদ্রোহী স্পাই এই খবর আজ অবধি কেউ জানে না। ধরা পড়লে এই খবর জানাজানি হবে। অতএব মালকানির প্রস্তাবে আমি ভয় পেলুম। মালকানি যে কেন এতো শিগগিরই কাজ শুরু করতে চায় তাও ভেবে পেলুম না। সমাদ্দারের সঙ্গে দেখা হোক, কথাবার্তা বলুক, তারপর কাজ শুরু করা যাবে। এতো তাড়াহুড়ো আর ব্যস্ততা কেন ?

সেই আতঙ্ক থেকে আমার মনে সন্দেহ জাগলো। মালকানি কে ? এর আগে তো কোনদিন মালকানিকে এতো তাড়াহুড়ো করতে দেখিনি। আজ হঠাৎই কেন তার এই পরিবর্তন। আমার নিজের মনকে এই বলে সান্ত্বনা দিলুম, হয়তো মালকানি তাড়াহুড়োয় কাজ শেষ করে বেরুটে ফিরে যেতে চায়।

হয়তো এই দেশে তার মন টিকছে না।

আমি মালকানির প্রস্তাবে একটু আপত্তি করলুম। বললুম,

: এতো তাড়াহুড়োয় কাজ করলে আমরা সাকসেসফুল হতে পারবো না। একটু ধৈর্য ধর মালকানি। সমাদ্দারের সঙ্গে কথাবার্তা বলে নি, তারপর কাজ শুরু করা যাবে।

মালকানি নাছোড়বান্দা। বললো: তোমার কথায় কিছু যুক্তি আছে মানিকলাল, কিন্তু মূল্যবান সময় আমি অহেতুক নষ্ট করতে চাইনে। আমাকে শিগ্‌গিরই বেরুটে ফিরে যেতে হবে কর্তাদের সঙ্গে আমার সেই বন্দোবস্তই হয়েছে। ভারতবর্ষে মাত্র দুমাস থাকবো। তার একদিনও বেশি নয়।

মালকানিকে কী জবাব দেবো ভেবে পেলুম না। সমীর সেন আমাকে সমর্থন করলো। কিন্তু মালকানির সেই এক গোঁ। 'টু মরো, অর নেভার' এই হলো তার বক্তব্য।

মালকানি বললো: তাহলে কালই আমরা বর্ডার এরিয়া কমিটির রিপোর্ট ট্রান্সমিট করছি। মিঃ সেন, আপনি কী বলেন?

: আমরা বড্ড তাড়াহুড়ো করছি। সাকসেসফুলী কাজ করতে গেলে আর একটু ধৈর্য ধরা প্রয়োজন। সমীর সেন জবাব দিলেন।

মালকানি এবার বললো: জানো মানিকলাল, আমার কাছে প্রতিটি মুহূর্তই এক একটি দিন। আমি মোটেই সময় নষ্ট করতে চাইনে মানিকলাল। এসো, কালই কাজ শুরু করা যাক।

বুঝলুম, প্রতিবাদ করে লাভ নেই। কাজ আরম্ভ করতেই হবে এবং আগামী কাল থেকেই। তবু আমি একবার সমাদ্দারের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চাই। হয়তো বিকেলেই ওর সঙ্গে দেখা হবে। সেদিনকার মতো বৈঠক সেখানেই শেষ হলো।

* * *

বিকেল বেলা হুইস্কীর গ্লাস নিয়ে জিমখানা ক্লাবে বসেছিলুম। অনেক চিন্তা আমার মাথায় এসে ভিড় করলো।

অনেক দিন পরে কেন জানিনে এবার মালিকানিকে দেখে বেশ বিস্মিত হয়েছিলুম। অনেক পরিবর্তন হয়েছিলো মালকানির। দামাস্কাসের সেই পুরানো মালকানি আর নেই। মালকানির যেন নতুন জন্ম হয়েছে। আগে ধীরে সুস্থে চিন্তা ভাবনা করে কাজ করতো। এমন অস্থিরচিত্ততা কখনো তার মধ্যে ছিলো না।

পরিবর্তন সংসারে অনিবার্য। অতএব মালকানির পরিবর্তন দেখে আমার বিস্মিত হবার কিছু নেই। এই সব কথা ভাবতে ভাবতে আমি হুইস্কীর গ্লাসে চুমুক দিলুম।

এমনি সময়ে সমাদ্দার এসে উপস্থিত হলেন। সমাদ্দারকে দেখেই আমি খানিকটা উত্তেজিত হলুম। জিজ্ঞেস করলুম,

: কোথায় ছিলেন এই ক'দিন? বেশ কয়েকদিন গা ঢাকা দিয়ে কাটালেন। ক'দিন থেকেই আপনার দেখা নেই অথচ কতো কাজ পড়ে আছে। যাক, মালকানির সঙ্গে দেখা হয়েছে?

: না, সমাদ্দার বললেন।

সমাদ্দারের জবাব শুনে আমি একটু অবাক হলুম। বললুম: আপনি কী বলছেন? এতো দূর দেশ থেকে আপনি কাজের জন্য মালকানিকে আনালেন অথচ আজও ওর সঙ্গে আপনার দেখা হয়নি?

আমার প্রশ্নে একটু উত্তেজনার রেশ ছিলো। আমার মনের চঞ্চলতা হয়তো ওর দৃষ্টি এড়ালো না। কিন্তু উনি কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ করলেন না। বললেন,

: না, আজ অবধি মালকানির সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। শুধু তাই নয়, আমি ভাবছি মালকানির সঙ্গে দেখা করা সমীচীন হবে কি না?

: কারণ?

: কারণ সহজ ও সরল মানিকলাল। কাউকে না বাজিয়ে আমি গ্রহণ করি না। মালকানি হলো ওভারসিজ ইণ্ডিয়ান। আমার বেরুটের বন্ধুরা বলেন, মালকানি বেশ কর্মঠ। তুমিও বলেছো মালকানি বিশ্বাসী। তবু আমার সন্দেহ এখনো দূর হয়নি। একটা পরদেশীকে আমি অতো সহজ মনে গ্রহণ করতে পারিনে। আমার এই দ্বিধা ও সংকোচের আরও একটা কারণ আছে। মালকানি যেদিন দিল্লীর কাষ্টমস ও সিকিউরিটির বেড়াজাল পার হয়ে এলো সেদিন পুলিশ বা কাষ্টমসের কর্তারা তাকে একটাও প্রশ্ন করলো না। কেন? অথচ আমি খবর পেয়েছি যে মালকানি একটা ইনভ্যালিড পাশপোর্ট নিয়ে এই দেশে ঢুকেছে। ইনভ্যালিড' মানে আর কিছুই নয়, ওর পাশপোর্টের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। অথচ পুলিশ মালকানিকে কোন প্রশ্ন করলো না, ছেড়ে দিল। এই প্রশ্নটাই বারবার আমার মনে জাগছে।

সমাদ্দারের কথা শুনে আমি হাসলুম। বললুম,

: সমাদ্দার সাহেব, মাঝে মাঝেই আপনি বড্ডে ছেলেমানুষের মতো কথা বলেন। শুধু তাই নয়, আপনার মনে সন্দেহের ধাতটাও যে বেশ প্রবল তাতেও

সন্দেহ নেই। একটা কথা মনে রাখবেন, পুলিশের খাতায় একথা লেখা আছে যে, মালকানি একজন ইনটারন্যাশনাল স্মাগলার। ওর প্রতি কাষ্টমসের দৃষ্টি আছে, পুলিশের নেই। এবার কাষ্টমসকে মালকানি নিরাশ করেছে। কারণ, সে কোন বে-আইনি মাল বা অন্য কিছুই সঙ্গে আনেনি। হ্যাঁ, ওর ওপরে কাষ্টমসের নজর থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু সিকিউরিটি পুলিশ কেন ওর দিকে দৃষ্টি রাখবে বলুন?

মালকানির পাশপোর্ট ইনভ্যালিড স্বীকার করলুম কিন্তু হাজার হোক মালকানি হলো ভারতীয়। 'ওভারসিজ ইণ্ডিয়ান' এই কথা ওর গায়ে ছাপমারা নেই। তাই পুলিশ ওকে সন্দেহ করেনি। সামান্য এই ভুল-ত্রুটির জন্যে আটকে রাখেনি। সমাদ্দার সাহেব, আপনি অতি সামান্য ব্যাপার নিয়ে অযথা চিন্তা করছেন। আপনি নিজেই বলেন, আমাদের কাজে বড্ডো বিপদ। যদি তাই হয়, তাহলে এই বিপদের কিছু ঝুঁকিও আমাদের নিতে হবে। মালকানিকে বিশ্বাস করা ছাড়া উপায় নেই।

আমাদের অনেক কাজ জমে আছে। মালকানি সেদিন বলছিলো, প্রতিটি মুহূর্ত মানে এক একটি প্রহর। আর প্রতিটি প্রহর মানে এক একটি দিন।

আরও একটি বিষয় নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই। আপনি নিশ্চয় শুনেছেন আমরা বর্ডার এরিয়া কমিটির রিপোর্ট সংগ্রহ করেছি।

: চমৎকার! এই রিপোর্ট এখন কার কাছে আছে? সমাদ্দার জিজ্ঞেস করলেন।

: সমীর সেনের জিম্মায়। কিন্তু মালকানি আর একটুও সময় নষ্ট করতে চায় না। বলছে, আগামীকাল থেকেই ট্র্যান্সমিশন শুরু করবে। আমার বাড়ীতে বসেই এই কাজ আরম্ভ করবে।

আমার কথা শুনে সমাদ্দার যেন একটু বিস্মিত হলেন। আগামীকাল থেকেই যে আমরা কাজ শুরু করবো তা ঠিক বিশ্বাস করতে পারলেন না। জিজ্ঞেস করলেন,

: কালকেই কাজ শুরু হবে? আশ্চর্য! মালকানি কি পাগল! আমার সঙ্গে কোন কথা না বলেই কাজ শুরু করতে চায়!

: হ্যাঁ, ইয়েস ক্রম টুমরো। মালকানি আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করতে চায় না। আমি ওকে বলেছিলুম সমাদ্দারের সঙ্গে আগে দেখা করো। কথাবার্তা বলো, তারপর নিশ্চিন্ত মনে কাজ শুরু করা যাবে। কিন্তু সমাদ্দার সাহেব, মালকানি বেরুটে ফিরে যাবার জন্য পাগল। বলছে, এই দেশে থাকতে ওর মন টিকছে না একটুও।

: মালকানির কথায় খানিকটা যুক্তি আছে মানিকলাল। আমাদের কাছেও সময় অতি মূল্যবান সন্দেহ নেই কিন্তু তবুও কাউকে না বাজিয়ে আমি দলে গ্রহণ করতে চাইনে। মনে রেখো আগুন নিয়ে খেলা করছি। সামান্য ভুল মানেই গলায় ফাঁসির দড়ি।

বুঝতে পারলুম মালকানির প্রস্তাবে সমাদ্দার বেশ চিন্তিত হয়েছেন। আমি ওর সেই দুঃশ্চিন্তা দূর করার চেষ্টা করতে বললুম : বেশ তো আসুন কাল সকালে আমার বাড়ীতে। মালকানিও কাল আসছে সেখানে। ওর সঙ্গে দু'দণ্ড কথা বলে বাজিয়ে দেখুন, ওকে বিশ্বাস করা সম্ভব কি না।

একটু সময় চুপ থেকে সমাদ্দার বললেন : তুমি ঠিক কথাই বলেছো মানিকলাল। আমি কাল সকালে তোমার বাড়ীতে আসবো। সেইখানে বসেই মালকানির সঙ্গে কথা বলবো। যদি ওকে বিশ্বাস করতে পারি তাহলে তারপরেই আমাদের কাজ শুরু করা যাবে। আচ্ছা, আবার কাল দেখা হবে।

এই বলে কথা শেষ করে সমাদ্দার চলে গেলেন। আমিও হুইস্কির গ্লাস নিয়ে অনেক কিছু অবাস্তব কথা ভাবতে বসলুম।

সমাদ্দারের সন্দিগ্ধ মনের কথা নিয়ে একদিন সমীর সেনের সঙ্গেও আলোচনা হলো। সমীর সেন বললেন, মানিকলাল, আমি কিন্তু সমাদ্দারকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারিনি।

সমীর সেনের কথা শুনে আমি যেন আকাশ থেকে পড়লুম। অবাক হয়ে ভাবলুম, সমীর সেন কী পাগল নাকি যে সমাদ্দারকেও অবিশ্বাস করেন!

: অবিশ্বাসের কী কারণ? আমি জিজ্ঞেস করলুম।

: সমাদ্দার স্পাই, সম্ভবত ভারত সরকারের এজেন্ট। জানিনে আমার মন কেন যেন বারবারই বলছে যে, সমাদ্দারের সঙ্গে ভারত সরকারের যোগাযোগ আছে। যেদিন থেকে ওর সঙ্গে কাজ শুরু করেছি সেদিন থেকেই কাজে নানা রকম বাধাবিপত্তি লক্ষ্য করছি। পুলিশও সর্বদাই আমাদের পেছনে লেগে আছে। কিন্তু এর আগে তো এসব বিপদের গন্ধ পাই নি।

সমীর সেনের এই অভিযোগ আমি হেসে উড়িয়ে দিতে পারলুম না। ওর কথায় বেশ যুক্তি ছিলো। আমি অতীতের দিনগুলোর কথা স্মরণ করতে লাগলুম।

সমীর সেনের কথায় আমার মনেও সন্দেহ জাগলো। স্বীকার করতে বাধ্য হলুম, সমাদ্দারকে সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ আছে।

এখন আর কী করতে পারি। হাজার হোক সমাদ্দার হলেন আমাদের কর্তা। ওকে শুধু মাত্র সন্দেহ করলেই চলবে না। আমার সন্দেহের কারণগুলো

কাগজে-কলমে লিখে রাখাও দরকার।

কথাটা মনে হতেই ক্লাবের বারম্যানের কাছ থেকে কাগজ কলম ধার নিয়ে একটা টেবিলে বসলুম। একটা চিঠি লিখবো, কিন্তু কাকে লিখবো সেই চিঠি? কাকে বিশ্বাস করা যায়?

হঠাৎ সমীর সেনের কথা মনে পড়লো। ভাবলুম, সমীর সেনকে বিশ্বাস করা যায় নিশ্চয়ই। ওর নিজের সন্দেহটাও যে অমূলক নয় সেই কথাটাই আমিও ওকে জানিয়ে দিতে চাই। শুধু তাই নয়। ডিফেন্স মিনিষ্ট্রিতে কাজ করছে সমীর সেন। যে কোন মুহূর্তেই সে বিপদে পড়তে পারে। সুতরাং তাকে সতর্ক করা একান্তই আবশ্যক। তাই আজ এই চিঠি লিখতে বসলুম।

আমার বন্ধু মালকানি ও সমাদ্দার···

*　　　*　　　*

একটানা চিঠিটা পড়ে যাচ্ছিলেন মিসেস সেন। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছিলুম ওর কথা। মানিকলালের চিঠিতে অনেক গোপন রহস্য ছিলো। অনেকদিন থেকেই আমার মনেও আকাঙ্ক্ষা জেগেছিলো সেইসব রহস্য জানবার। আজ আমার সব সংশয় ও কৌতূহল দূর হলো।

মিসেস সেনকে থামতে দেখে আমি জিজ্ঞেস করলুম,

: থামলেন কেন? চিঠির বাকী অংশটাও পড়ুন।

সতীলাও বললো! মিসেস সেন, চিঠির বাকী অংশটা পড়ুন। আজ সমাদ্দারের বিরুদ্ধে আপনি যে অভিযোগ করলেন, সে অপরাধে তাকে দোষী সাব্যস্ত করতে হলে আরও তথ্য চাই, আরও প্রমাণ চাই। সমাদ্দার যে ভারত সরকারের এজেন্ট মানিকলালের এ অভিযোগ এক তরফা। সে এখনও কোন প্রমাণের কথা উল্লেখ করেনি। আমরা এতো সহজে সমাদ্দারের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ বিশ্বাস করতে চাইনে। আপনি চিঠির বাকী অংশটুকুও পড়ুন।

একটু নিরাশ কণ্ঠে মিসেস সেন জবাব দিলেন,

: আপনারা আমাকে মাপ করবেন। মানিকলালের এ চিঠির শেষ পাতা ক'টি হারিয়ে গেছে। জানিনে এই শেষ পাতা ক'টি সমীরের কাছে ছিলো কি না।

আমরা সবাই চুপচাপ রইলুম। কেউ কোন কথা বললুম না। একটানা চিঠিটা পড়ে মিসেস সেনও একটু ক্লান্ত হয়েছিলেন। সতীলাই এই নিস্তব্ধতা ভাঙলো। বললো,

: মিসেস সেন, আগেই বলেছি সমাদ্দারের বিরুদ্ধে একটা গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে। সেই অভিযোগ প্রমাণ করার জন্যে কোন উপযুক্ত সাক্ষী-সাবুদ হাজির করা হয়নি। সমাদ্দার আমাদের পুরানো কমরেড, বহুদিনের

বন্ধু। দলের জন্যে কাজ করতে কখনো কোন দ্বিধা বা ত্রুটি করেনি। আজ মানিকলালের চিঠিটার বনিয়াদে সর্বপ্রথম আপনিই তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুললেন। কথাটা অবশ্যই আমাদের খুব বিবেচনার সঙ্গে ভেবে দেখতে হবে। আচ্ছা, এবার সমাদ্দারের বক্তব্য শোনা যাক। মিঃ সমাদ্দার আপনি কিছু বলবেন কি ?

সমাদ্দার বসে বসে কী যেন ভাবছিলেন নিজের মনে। হঠাৎ সতীলার এই প্রশ্নে তার সে চিন্তাধারা ছিন্ন হলো। উনি হঠাৎ-ই যেন সজাগ হয়ে উঠলেন আবার।

ধীর শান্ত কণ্ঠস্বরে সমাদ্দার বললেন : কৈফিয়ৎ দেবার মতো আমার কিছুই বলবার নেই। আর কৈফিয়ৎ দেবোই বা কেন ? আমি তো কোন অন্যায় বা অপরাধ করিনি। দীর্ঘদিন ধরে আমি দলের জন্য কাজ করছি। কেউ আমার বিরুদ্ধে কোনদিন কোন নালিশ করেনি। আজই হঠাৎ একটা অসমাপ্ত চিঠির বনিয়াদে আপনারা সবাই আমার বিরুদ্ধে একটা অপ্রমাণিত অভিযোগ শুনলেন। শুনলেন, আমি স্পাই, ভারত সরকারের এজেন্ট। বলুন এর চাইতে গুরুতর অভিযোগ আর কী হতে পাবে ?

সমাদ্দার থামতেই চীনা ভদ্রলোক মুখ খুললেন। বললেন : সমাদ্দার আপনার জবাব হেয়ালিপূর্ণ। আমরা আরও স্পষ্ট ও সরল ভাষায় জবাব শুনতে চাই। ভারত সরকারের সঙ্গে সত্যিই আপনার কোন যোগাযোগ আছে কিনা তাই জানতে চাই।

: মিথ্যে কথা। আমি দীর্ঘদিন ধরে আপনাদের সঙ্গে কাজ করছি। একবারও আপনারা আমাকে সন্দেহ করেন নি। আজই বা হঠাৎ আপনাদের মনে সন্দেহ জাগলো কেন ? মানিকলালের চিঠির বনিয়াদে মিসেস সেন যে অভিযোগ এনেছেন তাই কী এই সন্দেহের কারণ ?

আজ আপনাদের মনে যেমন সন্দেহ জেগেছে তেমন আমার মনেও সন্দেহ হচ্ছে যে, নিশ্চয় আমাদের মধ্যেই এমন কেউ আছে যে ভারত সরকারের পুলিশের কাছে খবরাখবর দিচ্ছে। কে সেই ব্যক্তি তা আমিও জানতে চাই। মালকানিকে আমি বাজিয়ে দেখেছি। সে বেশ কিছুদিন পর্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে আমার সঙ্গে কাজ করেছে। কোন কারণেই আমি ওকে সন্দেহ করতে পারি না।

মানিকলালকেও আমিই প্রথমে দলে টেনেছিলুম। আজ মনে হয় যে, বড্ডো ভুল করেছিলুম। যেদিন থেকে ও আমাদের সঙ্গে কাজ শুরু করলো, সেইদিন থেকেই আমাদের কাজও ভণ্ডুল হতে শুরু করলো। কাজ এগোলো

না একটুও, বরং দলের লোক নিহত হতে লাগলো।

প্রথম থেকেই মানিকলালের কিছু দ্বিধা সংকোচ ছিল এই কাজে। এই সংকোচ কেন? কী এর কারণ? কেন জানিনে আমার মন সর্বদাই বলতো মানিকলাল আমাদের সঙ্গে বেইমানী করবে। আমি যেদিন প্রথম মানিকলালকে দলে টানলুম মিসেস সেন আপত্তি করেছিলেন। মিসেস সেন বলেছিলেন: সমাদ্দার, হাজার হোক মানিকলাল হল সরকারী কর্মচারী। ওকে দলে টানায় বিপদের সম্ভাবনা আছে অনেক। ওকে পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু তবু আজ মিসেস সেনই সেই মানিকলালের সব কথা বিশ্বাস করছেন। কেন?

যাক অনেক বাজে কথা বলেছি। আমি আপনাদের সময় নষ্ট করতে চাইনে। আমি যে নির্দোষ এই নিয়ে বড়াই করতেও চাইনে। আমার কথা শেষ হবার আগে শুধু আর একটি কথা বলতে চাই। পুলিশ আমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছে। অতএব আমাদের সতর্ক হয়ে কাজ করতে হবে। আরও একটা কথা বলতে চাই, আজ আপনাদের মনে সন্দেহ জেগেছে যে আমি হলুম স্পাই। অতএব আমি আপনাদের অনুরোধ করছি, আপনারা আমাকে এই কাজের দায়িত্ব থেকে ছুটি দিন। আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে তবে কাজের ভার আমি মালকানিকে দিতে চাই।

সমাদ্দারের প্রস্তাব আমাকে স্তম্ভিত করলো। শুধু আমি নয়, বৈঠকে যারা উপস্থিত ছিলেন সবাই একটু হকচকিয়ে গেলেন। কী বলছে সমাদ্দার, কাজের সম্পূর্ণ ভার সে মালকানির হাতে তুলে দিতে চায়!

আমি জানিনে হঠাৎ সমাদ্দার কেন আমার নাম প্রস্তাব করলেন। কী কারণ? সমাদ্দারের প্রস্তাব শুনে সতীলা এবং চীনি ভদ্রলোকও বেশ বিস্মিত হলেন। মিসেস সেন চুপ করে রইলেন। বুঝতে পারলুম, এই প্রস্তাবে উনি একটুও সন্তুষ্ট হন নি।

জবাব দিলেন চীনি ভদ্রলোক। বললেন: আপনি কাজের দায়িত্ব ছেড়ে দিতে চাইছেন সমাদ্দার। কিন্তু একাজ থেকে শুধু একটি মাত্র শর্তেই আপনাকে মুক্তি দিতে পারি। মালকানি আপনার কাজ করবে বটে কিন্তু আপনি হবেন তার পরামর্শদাতা। আজও আমাদের অনেক কাজই অসমাপ্ত পড়ে আছে। কয়েকদিনের মধ্যেই অবশিষ্ট সমস্ত কাজ শেষ করতে হবে। সমীর সেন মারা যাবার দরুন আমাদের কাজে অনেক বিঘ্ন ঘটেছে। এবার থেকে ভারত সরকারের টপ-সিক্রেট কাগজপত্র সংগ্রহ করতে অনেক তেল-লবণ খরচ করতে হবে। কিন্তু তা হলেও আমরা চাই যে, কাজগুলো ব্যস্ততার সঙ্গে সম্পন্ন হোক। তাই বললুম, মালকানি হবে লোকাল বস, আর আপনি হবেন লোকাল

ডাইরেক্টার। ওকে শুধু এ্যাড্‌ভাইজ দেবেন কী করতে হবে।

এই প্রস্তাবে সতীলাও সায় দিলো। বর্মীজ ভদ্রলোক চুপ করে রইলেন।

বেশ কিছু সময় চুপ করে থাকার পরে সমাদ্দার বললেন। ঠিক আছে, আমি যথাসাধ্য মালকানিকে সাহায্য করতে চেষ্টা করবো।

সমাদ্দারের জবাব শুনে আমার মুখে হাসি ফুটলো। ইচ্ছে হলো আনন্দে চীৎকার করে উঠি। আবার ভাবলুম, মনের এই উত্তেজনা ও আনন্দ চীৎকার করে প্রকাশ করা সমীচীন নয়। তাই আমি চুপ করে থাকলুম।

সতীলা ও চীনি ভদ্রলোক হাসলেন। চীনি ভদ্রলোক বললেন,

: আপনার জবাব শুনে খুশি হলুম। আমরা জানতুম সমাদ্দার, আপনি মালকানিকে সাহায্য করবেন। আজ আপনার সাহায্য ও বুদ্ধি-পরামর্শ আমাদের একান্ত দরকার। আমরা জানি, মানিকলালের অভিযোগের কোন ভিত্তি নেই। তবুও, যখন আমাদের দরবারে সন্দেহের কথা উত্থাপিত হয়েছে, তখন সেই অভিযোগকে আমরা তুচ্ছ করতে পারিনে। আজ আপনি ইচ্ছে করেই নিজেকে সমস্ত দায়িত্বের হাত থেকে সরিয়ে নিলেন। আজ থেকে মালকানি হলো অপারেশন মারলবরোর কর্তা। মালকানি, মনে রেখো আজ তোমাকে এক মস্তো কাজের দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে। আশা করি এই কাজে তুমি সাকসেসফুল হবে। সমাদ্দার তোমাকে সাহায্য করবেন। শুধু সমাদ্দার নয়, মিসেস সেনও তোমার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করবেন।

সমাদ্দার এবার আমার কাছে এগিয়ে এলেন। বললেন, মালকানি তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। যে কাজ আমি করতে পারিনি আশা করি সে কাজ তুমি সুসম্পন্ন করতে পারবে। আর আমি তো তোমার সঙ্গে রইলুম। প্রয়োজন হলে সর্বদাই আমার সাহায্য ও পরামর্শ পাবে।

সমাদ্দারের কথায় আমি একটু লজ্জা পেলুম। এবার সতীলা এসে বললো: ওয়েল জি-বি-এম, তোমাকে এক মস্তো কাজের দায়িত্ব দেয়া হলো। আশা করি এ কাজ তুমি সুসম্পন্ন করবে। আজকের মতো তোমার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। কাজ শেষ করে শিগ্‌গীরই বেরুটে ফিরে এসো। সেখানেই আবার দেখা হবে।

বর্মীজ ভদ্রলোকও আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন: কন্‌গ্রাচুলেশন। এবার থেকে অপারেশন মারলবরোর সাকসেস তোমার ওপর নির্ভর করছে। জি-বি-এম, আমাদের অসমাপ্ত কাজগুলো দায়িত্ব নিয়ে এখন তোমাকেই সুসম্পন্ন করতে হবে।

ভারতবর্ষ আমেরিকা থেকে কিছু হাতিয়ার কিনছে। কী সেই হাতিয়ার

তা আমরা জানতে চাই। ফ্রন্টিয়ার ও বর্ডারে যে সব নতুন রাস্তা হচ্ছে আমরা সেইসব রাস্তার ম্যাপ চাই। রুশ দেশ ভারতে মিগ বিমান তৈরীর যে ফ্যাক্টরী করছে কোথায় সেই ফ্যাক্টরী বসানো হচ্ছে তা জানাও একান্ত আবশ্যক। তারপর ভারতবর্ষের বিভিন্ন অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরী কোথায় কতোটা কাজ করছে তাও জানা প্রয়োজন।

জি-বি-এম, এগুলো সবই খুব জরুরী কাজ। কোনটাই অবহেলা করলে চলবে না। সতীলার কাছে তোমার যথেষ্ট সুখ্যাতি শুনেছি। আশা করি তুমি আমাদের নিরাশ করবে না। টাকার জন্য চিন্তা করো না। তোমার টাকার বন্দোবস্ত সমাদ্দার করবেন।

আমি দু'জনকেই আশ্বাস দিলুম যে আমার কাজে কোন ত্রুটি থাকবে না। আমার কথায় ওরা সন্তুষ্ট হলেন। সেদিনকার মতো আমাদের বৈঠক শেষ হলো।

*　　*　　*

আমি আর সমাদ্দার গাড়ী করে শহরে ফিরে এলুম। গাড়ীতে বসে প্রথমে সমাদ্দার খানিক চুপ করে রইলেন। তারপর হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভেঙে বললেন: "আশ্চর্য! জি-বি-এম, আশ্চর্য! এতোবড়ো একটা চিঠি মানিকলাল লিখে রেখে গেলো অথচ আমি তার বিন্দুবিসর্গও জানতে পারলুম না। নিজের কাজেও যেন আর বিশ্বাস রাখতে ইচ্ছে করছে না। প্রতিদিন মানিকলাল আমার সঙ্গে এতো সময় কাটাতো অথচ একবারও মন খুলে আমাকে কিছু বললো না। এই গোপনতার কী প্রয়োজন ছিলো জানিনে। মিসেস সেন যে চিঠি পড়লেন, তা কী সত্যিই মানিকলালের লেখা চিঠি, না জাল। অনেক কথাই আমার মনে জাগছে জি-বি-এম, কিন্তু কী জবাব দেবো ভেবে পাচ্ছিনে।

আমার বিরুদ্ধে আজ মিসেস সেন কেন অভিযোগ করলেন জি-বি-এম। কী এর হেতু? আজ বহুদিন ধরে উনি আমার সঙ্গে কাজ করছেন। কখনই আমার নির্দেশ অমান্য করেন নি। একবারও মুখ ফুটে আমার বিরুদ্ধে কোন নালিশ করেন নি। আজই হঠাৎ কেন এই গুরুতর অভিযোগ করলেন, সেইটে আমার জানতে ইচ্ছে করে। সত্যি কথা কে বলছে? মানিকলাল না মিসেস সেন। বহু প্রশ্নই আজ আমার মনে জাগছে জি-বি-এম। এইসব প্রশ্নের সমাধান করতে চাই আমি।

আর একটা কথাও আমি জানতে চাই। মানিকলাল কেন আমাদের দলে যোগ দিলো? টাকার লোভে না ব্রিগেডিয়ার আব্বাসের শাসানির আতঙ্কে?

আর একটা কথাও তোমাকে বলতে চাই জি-বি-এম। বেশ কিছুদিন

আগে মানিকলালের ব্যবহার আমাকে বিস্মিত করেছিলো। একদিনের কথা তোমাকে বলবো—

* * *

জি-বি-এম, একদিন খবর পেলুম এয়ারফোর্সের জন্যে পাইলট ট্রেনিং স্কীমের একটি প্ল্যান তৈরী করা হয়েছে। পুরো খবরটা জানবার প্রয়োজন ছিলো। ঠিক করলুম, মানিকলালকেই বলবো পুরো খবর সংগ্রহ করতে। আমি কখনোই সোজাসুজি মানিকলালকে টেলিফোন করতুম না। ওর সঙ্গে বন্দোবস্ত ছিলো ওর বাড়ীর দরজায় চকখড়ি দিয়ে দুটো লাইন এঁকে রাখবো। লাইন কাটা দেখলেই বুঝতে হবে, সেদিনই দেখা করতে হবে, বিশেষ জরুরী কাজ।

আগে থেকেই বন্দোবস্ত করে নিয়েছিলুম যে রিগ্যাল সিনেমার সামনে আমরা দেখা করবো। সিনেমার টিকিট কেটে দু'জনেই হলঘরে যেতুম। নিউজ রিল শেষ হলেই প্রথমে মানিকলাল বেরিয়ে আসতো। একটা ট্যাক্সিতে গিয়ে বসতো। খানিক বাদে আমি বেরিয়ে আসতুম। সোজা গিয়ে সেই ট্যাক্সিতে উঠে বসতুম। সেই ট্যাক্সি করে আমরা ডিফেন্স কলোনীতে এক বন্ধুর বাড়ীতে যেতুম। আমার বন্ধুর সেই বাড়ীটা তুমি দেখেছো জি-বি-এম। একদিন সেই বাড়ীতে বসেই আমরা রেডিওতে খবর পাঠিয়েছিলুম।

যাক, এবার সেদিনকার কথা বলা যাক। গতানুগতিক নিয়মে সেদিনও আমি মানিকলালের দরজায় দুটো দাগ কেটে রেখে এসেছিলুম। তারপর বিকেল সাড়ে ছটায় আমরা এলুম রিগ্যাল সিনেমায়। টিকিট কেটে হলঘরে ঢুকলুম। মানিকলাল আমার আগেই হলঘরে ঢুকেছিলো। নিউজ রীলের পর মানিকলাল হল থেকে বেরিয়ে এলো। খানিক বাদে আমিও বেরিয়ে এলুম। কিন্তু বাইরে এসে মানিকলালকে দেখতে পেলুম না। মানিকলালকে না দেখে আমি একটু বিস্মিত হলুম। এ রকম তো কখন হয় না। মানিকলাল তো কখনও ভুল করে না। আজ হঠাৎ কোথায় গেলো? রিগ্যাল সিনেমার সামনে প্রতিটি ট্যাক্সি আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজলুম। কিন্তু কোথাও মানিকলালকে খুঁজে পেলুম না। বেশ খানিকটা ভয় পেয়ে গেলুম ঘটনাটায়।

ভাবতে লাগলুম, কী করা যায়। আবার হলঘরেই ফিরে যাবো কিনা? যখন রিগ্যাল সিনেমার সামনে দাঁড়িয়ে এইসব কথা ভাবছিলুম তখনই রাস্তার অপর প্রান্ত থেকে মানিকলাল আমার পানে এগিয়ে এলো। আমার কাছাকাছি একটা ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠে বসলো। আমিও উঠলুম সেই ট্যাক্সিতে।

গাড়ী ছাড়বার পর আমি জিজ্ঞেস করলুম: কোথায় গিয়েছিলে?

দেখতে পেলুম মানিকলালের মুখ বেশ গম্ভীর হয়ে গেলো। সে যে কোন

কারণে আতঙ্কিত হয়েছে তা বুঝতে কষ্ট হলো না। কিন্তু কী সেই কারণ? ধীরে ধীরে মানিকলাল আমার প্রশ্নের জবাবে বলল: মাদ্রাজ হোটেলের সামনে গিয়েছিলুম।

: মাদ্রাজ হোটেলের কাছে, হঠাৎ?

বেশ একটু উৎকণ্ঠিত হয়েই আবার প্রশ্ন করলুম আমি। হয়তো আমার সে প্রশ্নে কিছুটা কর্কশতাও ছিলো যা মানিকলালের কানে বাজলো। সে বলল,

: জানেন সমাদ্দার সাহেব, সিনেমা থেকে বেরিয়েই দেখি মিসেস সেন বাইরে দাঁড়িয়ে। আর তার সঙ্গেই এক অপরিচিত ভদ্রলোক। ভদ্রলোক একেবারেই অপরিচিত বললে ভুল বলা হবে। কারণ, আজ সকালেও এই ভদ্রলোককে একবার আমি আমার বাড়ীর সামনে দেখেছিলুম। আপনি যে খড়ির দু'টো দাগ কেটে রেখেছিলেন আমার দরজায়, ভদ্রলোক বেশ নজর দিয়ে সেই দাগ দু'টো দেখছিলেন। এ ব্যাপারে কোন চিন্তা-ভাবনা করিনি। কিন্তু মিসেস সেনের সঙ্গে আবার সেই ভদ্রলোককে দেখেই আমার মনে ভাবনা হলো। তাই ওদের পেছন নিয়ে মাদ্রাজ হোটেলের দিকে গিয়েছিলুম। ভদ্রলোককে এর আগে আমি আর কখনো দেখিনি।

আমি তাকিয়ে দেখলুম মানিকলালের মুখ শুকিয়ে গেছে। কথা বলতেও যেন বেশ ভয় পাচ্ছে।

: মিসেস সেন, তুমি মিসেস সেনকে দেখেছো? আশ্চর্য! আমি জানি মিসেস সেন দিল্লীর বাইরে গিয়েছেন। তুমি আমাকে অবাক করলে মানিকলাল! বেশ খানিকটা সময় সে চুপ করে রইল। আমার মনে হল মানিকলাল এ ব্যাপার নিয়ে আর আলোচনা করতে চায় না।

চট করে মানিকলাল আমার কথার জবাব দিলো না। তাই আমিও আর কোন প্রশ্ন করলুম না।

সেদিন আমাদের আলোচনা আর বেশি জমলো না। কেন জানিনে, দেখলুম, মানিকলাল একটু মনমরা হয়ে গেলো।

বাড়ীতে এসে মানিকলালকে বললুম: আমার কতকগুলো জরুরী খবর চাই।

: বলুন কী জানতে চান? নির্লিপ্ত কণ্ঠে মানিকলাল বললো।

: শুনলুম এয়ারফোর্সের হাই কম্যাণ্ডে শিগ্‌গীর কিছু অদল-বদল হবে।

: এমন কোন খবর এখনও আমার কানে আসে নি। আপনি কার কাছ থেকে শুনলেন? মানিকলাল জিজ্ঞেস করলো।

আমি ওর প্রশ্নের জবাব দিলুম না। আবার জিজ্ঞেস করলুম,

: শুনলুম শিগগীরই ইণ্ডিয়ান এয়ারফোর্সে এক নতুন ট্রেনিং স্কীম চালু হচ্ছে। তুমি কী সে খবর শুনেছো ?

: নতুন কোন স্কীম নয়, পুরানো স্কীম। এর ভেতরে কোন নতুনত্ব নেই।

: তা হোক, তুমি এই খবরটা আবার যাচাই করে দেখো। শুনেছি একদল পাইলট মস্কোয় যাচ্ছে মিগ বিমান চালনা শিখতে। বাজার গুজব কিন্তু এয়ারফোর্সের কর্তারা মিগ প্লেনের ট্রেনিং নিতে রাজী নন। কথাটা সত্যি কী মিথ্যে তাই জানতে চাই।

: খবরটা সমীর সেনকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। এসব ব্যাপার মিনিষ্ট্রিতে আলোচনা হয়। এয়ারফোর্সের হেড কোয়ার্টারে নয়। ওঁর কাছেই এ খবর জানতে পারবেন।

মানিকলালের জবাব শুনেই আমি বুঝতে পারলুম সে আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতে চায়। কিন্তু কেন ? আমি আরও তু'একটা ছোট ছোট প্রশ্ন করলুম তাকে। কিন্তু তারও কোন সন্তোষজনক জবাব পেলুম না। আমার সব প্রশ্নই কোন না কোন অজুহাতে এড়িয়ে গেলো মানিকলাল।

এবার আমি বললুম : কী ব্যাপার, তোমাকে আজ এতো চঞ্চল দেখাচ্ছে কেন ? ভয় পেয়েছো নাকি ?

: না ভয় পাবো কেন, তবে ভাবছিলুম ঐ ভদ্রলোক আজ সকালে আমার বাড়ীর সামনে এসেছিলেন কেন ?

সেদিন আর কোন কথা হলো না।

বাড়ীতে ফিরেই মিসেস সেনকে টেলিফোন করলুম। টেলিফোন বেজে চললো কিন্তু কেউ ধরলো না। পর পর তিনবার ফোন করলুম। তিনবার ফোন করার মানে হলো, উনি যেন অতি অবশ্যই ইণ্ডিয়া গেটের সামনে আমার সঙ্গে দেখা করেন আধ ঘণ্টার মধ্যেই।

একটু বাদেই আমি ইণ্ডিয়া গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। সময় বয়ে যেতে লাগলো দ্রুত বেগে। অসংখ্য লোক চলাচল করছিলো ইণ্ডিয়া গেটের সামনে। ফেরিওলারা তাদের জিনিসপত্র বিক্রি করছিলো। তু'একবার এসে আমাকেও জিজ্ঞেস করলো কিছু চাই কিনা। আমি মাথা নাড়িয়ে তাদের চলে যেতে বললুম।

অনেক সময় অপেক্ষা করলুম সেখানে, কিন্তু মিসেস সেন এলেন না। এক ঘণ্টা বাদে আবার এসে দাঁড়ালুম ইণ্ডিয়া গেটের সামনে। ঠিক সময়ে কন্ট্যাক্ট ম্যানের দেখা না পেলে নিয়ম হলো একঘণ্টা বাদে আবার এসে নির্দিষ্ট জায়গায়

দাঁড়ানো। তাই, আমি আবার এক ঘণ্টা বাদে সেখানে ফিরে এসেছিলুম। কিন্তু কোথায় মিসেস সেন। উনি এলেন না।

হয়তো মিসেস সেন বাড়ীতে ছিলেন না। উনি হয়তো আমার টেলিফোন শুনতে পান নি। এমন কিছু ভেবে আমি আবার বাড়ী ফিরে এলুম। সেদিন আর মিসেস সেনের সঙ্গে দেখা হলো না।

পরের দিন আবার মিসেস সেনের খোঁজ করলুম। সমীর সেনের মারফৎ ওকে খবর পাঠালুম। উনি এলেন। বললেন : আমি কাল দিল্লীতেই ছিলুম।

: বিকেলে কনটসার্কাসে গিয়েছিলেন নাকি ? আমি প্রশ্ন করলুম।

: পাগল হয়েছেন। আমি কাল সারাটা দিন বাড়ীতেই কাটিয়েছি।

আমি বুঝতে পারলুম মিসেস সেন মিথ্যে কথা বলছেন। কারণ, বিকেলে আমি ওকে টেলিফোন করেছিলুম। বাড়ীতে থাকলে সে টেলিফোন পেয়ে উনি এলেন না কেন ? মিসেস সেন একবারও আমাকে সেই টেলিফোন সম্পর্কে কিছু বললেন না।

: সমাদ্দার আপনি কার কাছে শুনলেন যে কাল বিকেলে আমি কনট-সার্কাসে গিয়েছিলুম, মিসেস সেন প্রশ্ন করলেন।

আমি মানিকলালের নাম উল্লেখ করলুম না। ভাবলুম, কথা বাড়িয়ে কী লাভ ! কারণ আমি জানতুম সত্যি ঘটনা আর মিসেস সেনের কাছ থেকে জানতে পারবো না।

জানো জি-বি-এম, আজ বিকেলে মিসেস সেন যখন মানিকলালের চিঠিখানা পড়ছিলেন তখনই আমার এই কথাটা মনে পড়েছিলো। একবার মনে হলো আমার প্রতি কর্তাদের সন্দেহ জাগাবার জন্যই মিসেস সেন সেই চিঠিখানা পড়ছেন। উনি আমাকে ওই চিঠির কথা জানান নি কেন সেই কথাটিও ভাবলুম একবার। মাথায় একটা বুদ্ধি এলো, ভেতরে ভেতরে কী হচ্ছে তা জানতে হবে। কিন্তু যতোদিন আমি এই অপারেশন মারলবরোর কর্তা থাকবো ততোদিন কিছুই জানা সম্ভব নয়। আর এই কাজের জন্য আমার একজন বিশ্বস্ত লোকেরও প্রয়োজন। তাই তখনই আমি তোমার নাম করলুম। আমি জানি তোমার প্রতি সতীনাথের খুব আস্থা আছে। তাই আমার প্রস্তাব সবাই মেনে নিতে দ্বিধা করল না। কিন্তু তখনই আমার মনে হল মিসেস সেন এই প্রস্তাবটি একেবারেই পছন্দ করেন নি। তা হোক, এবার আমি জানতে চাই ওই তৃতীয় ব্যক্তিটি কে ? কে ভারত সরকারের দপ্তরে আমাদের কাজকর্মের খবরাখবর দিচ্ছে। হু ইজ দিস থার্ড ম্যান, এই কথাটাই আমি জানতে চাই জি-বি-এম ?

আমি সমাদ্দারের কথার জবাব না দিয়ে, চুপ করে গেলুম।

*   *   *

আমার নতুন জীবন আরম্ভ হলো।

আজ থেকে গোবিন্দবিহারী মালকানি হলো অপারেশন মারলবরোর কর্তা। গোপন সামরিক ও সরকারী সংবাদ সংগ্রহের দায়িত্ব নিলুম আমি।

আজ অপারেশন মারলবরোর দায়িত্ব নেবার পর আমার মনে চিন্তা হলো।

আমি হলুম স্পাই। সামান্য দুটি শব্দ, কিন্তু শব্দ দু'টির ভেতর যেন অনেক রহস্য লুকানো। মাদকতা আর উত্তেজনায় ভরা। স্পাই ধরা পড়লে তার নিষ্কৃতি নেই। পদে পদে জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে হয়।

এতোদিন সমাদ্দারের তাঁবেদারী করতুম, এবার নিজের প্রতিভা প্রকাশ করবার সুযোগ মিললো। আর আমার কাজের ঢং ভিন্ন। তাই কাজ হাসিল করবার জন্যও নতুন পন্থা অবলম্বন করলুম।

সমীর সেন জীবিত নেই। ডিফেন্স মিনিষ্ট্রির সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ছিন্ন হয়েছে। ভাবনা হলো এখন কী করে খবর সংগ্রহ করি। কাকে পাকড়াও করি খবরও সংগ্রহের জন্যে। সবার কাছে তো আর গোপন খবর থাকে না। এমন লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে, যে থাকবে সবার সন্দেহের বাইরে। এমন লোক চাই যার প্রতি সরকারের অগাধ বিশ্বাস অটুট, আর যার কাছে থাকে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের খবর। আমি ভারত সরকারের হাঁড়ির খবর জানতে চাই।

হঠাৎ আমার মতি সরখেলের কথা মনে পড়লো। অনেকদিন আগে সমাদ্দারের মুখে মতি সরখেলের নাম শুনেছিলুম। বাজারে সবাই ওকে এক ডাকে চেনে।

মতি সরখেল, দিল্লীর বাসিন্দা হয়েও মতি সরখেলের নাম শোনেনি এ কখনও সম্ভব নয়। সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকলেও নামটা নিশ্চয় শুনেছে। সরকারী দপ্তরে মন্ত্রী মহলে ওর যথেষ্ট সুনাম। সবাই বলে ওর মতো এ্যাফিসেন্ট কর্মচারী আর দ্বিতীয় নেই। ওর পরামর্শ ছাড়া নাকি ডিফেন্স মিনিষ্ট্রির কোন কাজই হয় না। ভারত সরকারের প্রত্যেকটি জরুরী সংবাদ ও টপ্-সিক্রেট ফাইল ওর কাছে যায়।

মতি সরখেল বেশ খাটিয়ে লোক। ভোর আটটা থেকে দপ্তরে বসে কাজ শুরু করেন। রাত আটটা অবধি দপ্তরেই পড়ে থাকেন। তারপর বাড়ীতে ফাইল নিয়ে বসেন। মন্ত্রীরা অনবরত ওর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন। কথায় কথায় শলা-পরামর্শ হয়।

আমি হিসেব করে দেখলুম যে মতি সুরখেলকে দিয়ে আমার কাজ হবে না। কারণ, মতি সরখেল হলেন ভারত সরকারের অতি অনুগত ভৃত্য। তাই আমার শিকার হলো মতি সরখেলের স্ত্রী রেখা সরখেল। এখানে রেখা সরখেল সম্পর্কে কিছু গৌরচন্দ্রিকা করতে চাই। কারণ এই কাহিনী বর্ণনায়, রেখা সরখেলের জীবনের পূর্বাভাস বর্ণনারও একান্ত আবশ্যকতা আছে।

দিল্লীর শৌখিন সমাজে মিশলে রেখা সরখেলের নামটাও অবশ্যই শুনতে পাবেন। তবে তা কোন প্রশংসার নয়, নিন্দের। সমাজে রেখা সরখেল হলো মুখরোচক গল্প। তার কাহিনী বলে বা শুনে লোকের সকাল সন্ধ্যে কাটে। রেখা সরখেলের গল্প করা হলো দিল্লীর ফ্যাসান।

বলুন বব্ চুল কাটে কে? রেখা সরখেল।

দিল্লীতে মিনি স্কার্টের প্রচলন করলে কে? রেখা সরখেল। মেয়েরা স্মোক করছে ড্রিংক করছে কারও মুখে এই কথা শুনলেই বুঝবেন যে সে রেখা সরখেলের কথা বলছে। বেপরোয়া বেগে গাড়ী চালানোর অপরাধে দু'তিনবার পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিলো যে মহিলা সেও ওই রেখা সরখেল। কিন্তু হাজার হোক তার স্বামী উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। সরকারী দপ্তরে তার প্রচুর সম্মান ও খ্যাতি। তাই থানার দারোগার হাত ছাড়িয়ে আসতে তাকে একটুও বেগ পেতে হয় নি।

ঠিক করলুম রেখা সরখেলের হৃদয় জয় করতে হবে। তারপর তাকে ব্ল্যাকমেল করে কাজে নামাবো। এ না করলে কাজ উদ্ধার হবে না। নিজের প্রয়োজনে কোন মেয়েকে সর্বস্বান্ত করতে আমার মনে কোনদিন কোন গ্লানি আসে নি। আজকেও দ্বিধা বা সংকোচ হলো না।

আমি কাজ শুরু করলুম।

*　　　　*　　　　*

আমার তাস খেলার বাই আছে। হরেক রকমের তাস খেলা আমি জানি। বলতে পারেন আমি হলুম তাসের রাজা।

আমি কোনদিন ধর্ম করতে তাস খেলিনি। জাল জোচ্চুরী হলো আমার ব্যবসা ও পেশা। তাস খেলায় আমি প্রচুর জোচ্চুরী করতুম। ইচ্ছে মতো তাস বাটতে শিখেছিলুম। তিনখানা তাস এমন করে বাটতে পারতুম যে কার হাতে কী তাস পড়েছে তা না দেখেই বলে দিতে পারতুম।

রেখা সরখেলও তাস খেলতো। দিল্লীর জিমখানা ক্লাবে তাদের তাসের বৈঠক বসতো। এই তাস খেলায় রেখা সরখেল যোগ দিতো।

আমি সেই তাসের আড্ডায় যোগ দিতে শুরু করলুম। প্রথমে আমি

ছিলুম দর্শক। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের খেলা দেখতুম। এইভাবেই আমি দু'একবার রেখা সরখেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলুম। তার চাউনির অর্থ বুঝতে আমার কষ্ট হয়নি। ক্ষুধার্ত দৃষ্টি। বুঝতে পারলুম আমি শ্রীমতীর হৃদয় জয় করতে পেরেছি।

একদিন তাসের আসরের এক ভদ্রলোক অনুপস্থিত হলেন। আমার পানে তাকিয়ে রেখা সরখেল জিজ্ঞেস করলো: আপনি তাস খেলতে জানেন? আমরা পোকার খেলছি।

মৃদু হেসে জবাব দিলুম: অল্প-বিস্তর খেলতে জানি।

: তাহলে আসুন না, একটু অনুরোধের সুরে রেখা সরখেল বললো।

সঙ্গী অন্য দুই ভদ্রলোক তার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বললেন: নিশ্চয় নিশ্চয়, ইউ আর ওয়েলকাম।

খেলার আসরে যোগ দিলুম। আমি খুব হুঁশিয়ার। তাস খেলতে যে খুব ভালোই জানি তার কোন আভাস দিলুম না। সেদিন খেলার আসরে বেশ কিছু টাকা গচ্চা দিলুম।

খেলার শেষে রেখা সরখেল আমার প্রতি সহানুভূতি জানালো। বললো: আপনি বড্ডো আবোল-তাবোল খেলেন। বেশ ভুল করেন।

জবাব দিলুম: পোকার তো বড়ো খেলিনে, তাস খেলতে বসলে ফ্লাসই খেলি বেশি।

: আপনি ফ্লাস খেলেন? স্ট্রেঞ্জ কয়েনসিডেন্স। আমি প্রচুর ফ্লাস খেলি। খুব বড়ো স্টেকে খেলি। খেলবেন আমাদের সঙ্গে?

তাস খেলায় আমার কোনদিনই অনাসক্তি ছিলো না। আজও হলো না। বরং ভাবলুম এই তাস খেলার মাধ্যমেই হয়তো রেখা সরখেলকে বাগানো যাবে। তাই আমি জবাব দিলুম: রাজী, ফ্লাস খেলতে আপত্তি নেই কোন।

: আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে এই তাসের আড্ডা বসে। প্রতি সন্ধ্যায় আমরা খেলতে বসি। আউরংজেব রোডে ওর বাড়ী। কাল বিকেল ছ'টার সময় আসুন না আমাদের আড্ডায়।

কথা দিলুম, নির্দিষ্ট সময়ে আমি তাসের আসরে উপস্থিত হবো। রেখা সরখেল কী তখন ছাই জানতো যে সে খাল কেটে কুমীর ঘরে আনছে! সে যে অজ্ঞাতসারে আমার হাতের মুঠোয় চলে আসছে একবারও সে কথা তাকে ভাবতে দিইনি।

পরের দিন আউরংজেব রোডের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলুম। বেশ বড়ো বাড়ী, দেখলেই মনে হয় কোন সমৃদ্ধ ব্যবসায়ীর। বাড়ীর সামনে একটি ছোট

লন আর ফুলের বাগিচা। লনে দোল্‌না ঝুলছে।

বাড়ীটায় ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই দরোয়ান ছুটে এলো। কোন ভণিতা না করে সোজা প্রশ্ন করলো : কাকে চাই?

জবাব দিলুম : মিসেস সরখেল।

: মেমসাহেব? দরোয়ান আবার জিজ্ঞেস করে।

দরোয়ানের কথায় একটু বিস্মিত হলুম। রেখা সরখেলের মুখেই শুনেছিলুম বাড়ীর কর্তা ব্যাচেলর। তাহলে এখানে আবার মেমসাহেব এলো কোত্থেকে? কিন্তু মনের সে অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করা শোভন নয় ভেবে আবার বললুম,

: মিসেস সরখেলকে চাই।

: আমরা ওকেই মেমসাহেব বলে ডাকি। আসুন আমার সঙ্গে, দরোয়ান বলল।

আমি দরোয়ানের সঙ্গে বাড়ীর ভেতরে ঢুকলুম। বেশ সুন্দর সাজানো বাড়ী। গৃহকর্তা যে শৌখিন তাতে কোন সন্দেহ নেই। সুসজ্জিত ঘরের দেওয়ালের গায়ে বিভিন্ন ছবি ও ফটো। বুক সেলফ ভর্তি বই। প্রতিটি ঘর বেশ দামী কার্পেটে ঢাকা।

গাড়ী বারান্দায় চার পাঁচখানা নতুন মডেলের গাড়ী ছিলো। গাড়ীগুলো দেখেই বুঝলুম যে তাদের তাসের আসর বসে গেছে। আমাকে দেখেই রেখা সরখেল এগিয়ে এলো। বললো : এসেছেন, ভালোই হলো, আসুন আমার বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। লাল, সরোজ, বোনার্জি, দেশমুখ আর লিলি।

রেখা সরখেলের স্তাবকের অভাব নেই। আমি একবার লিলির পানে তাকালুম। লিলির যৌবন আছে আর আছে দেহ-সৌন্দর্য।

লিলিও আমার পানে তাকালো। প্রলুব্ধ দৃষ্টি। পুরুষকে আকর্ষণ করে। বুঝতে পারলুম, আজ তাসের আসর জমবে।

আমি যে বেশ কিছুক্ষণ লিলির পানে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলুম তা রেখা সরখেলের নজর এড়ালো না। রেখা সরখেল নাম ধরে ডাকতেই আমার চেতনা ফিরে এলো। আমি হলুম রেখা সরখেলের অতিথি। এক্ষেত্রে অন্য মেয়ের দিকে দৃষ্টি দেয়া শোভন বা সমীচীন নয়।

রেখা সরখেল বললো : মালকানি লেট আস প্লে।

খেলা শুরু হলো। তাসের আসর বেশ বড়ো। অনেক টাকার লেনদেন হয়। খেলোয়াড় সবাই অর্থশালী। ব্যবসা করে। পৈত্রিক বিত্তেরও প্রাচুর্য আছে। লিলি লালের বান্ধবী।

কিন্তু রেখা সরখেল টাকা পান কোথেকে? হাজার হোক ওর স্বামী মতি সরখেল সরকারী কর্মচারী। তার আয় সীমিত।

খেলা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে আমি সবাইকে বাজিয়ে দেখলুম। সরোজ ও দেশমুখ ভালোই খেলে। ওদের ভাগ্যও ভালো। তিন পাত্তি তাসের খেলায় প্রথম প্রয়োজন হলো ভাগ্য। তারপর জাল জোচ্চুরী।

রেখা সরখেল অতি বাজে খেলে। দেখলেই বোঝা যায় একেবারে আনাড়ী। বাজে তাসে অনেক বাজী ধরে। পয়সার প্রতি ভ্রূক্ষেপ বা মায়ামমতা নেই। জীবনের প্রতিও নেই।

সেদিন রেখা সরখেল প্রচুর হারলো। আমি সামান্য টাকা জিতলুম। সেদিন আমি কোন জাল জোচ্চুরী করলুম না। কারু মনে কোন সন্দেহ জাগতে দিইনি যে আমি হলুম ফ্লাস খেলার বাদশাহ। আমি ঠিক করেছিলুম যে ধীরে ধীরে জাল গোটাবো।

তাসের আসর ভাঙলো বেশ রাত্রে। রাত প্রায় দুটো। রেখা সরখেল আমাকে জিজ্ঞেস করলো: জি-বি-এম, আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দেবো কি?

: বাড়ী নয়, হোটেল। আমি হোটেলে থাকি। আমি তো আর দিল্লীর স্থায়ী বাসিন্দা নই। দুদিনের জন্যেই এসেছি মিসেস—

: আমাকে মিসেস সরখেল বলে ডাকবেন না, রেখা বলে ডাকবেন। আর আপনি নয় তুমি বলবেন।

আমাদের আলাপ পরিচয় গভীর হচ্ছে। জলের মাছ ডাঙ্গায় উঠছে।

: তুমি বড্ডো রেকলেস খেলো রেখা। তিন পাত্তি একটু সামাল হয়ে খেলতে হয়, আমি বললুম।

রেখা আমার কথার কোন জবাব দিলো না। মৃদু হাসলো।

আমি রেখার গাড়িতে উঠে বসলুম। গাড়ীতে বসে রেখা জিজ্ঞেস করলো: কোথায় যাবেন?

: হোটেলে, আমি জবাব দিলুম।

: না, একটু ঘুরে যাই।

বলে গাড়ীর স্টিয়ারিংএ বসলো রেখা। রাতের পাগলা হাওয়ায় গাড়ী তীব্র বেগে ছুটে চললো। নিঝুম রাতে তখন সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ দিল্লী শহর। বাতাসের ঝাপ্‌টায় রেখা সরখেলের শাড়ী উড়ছে। চুলগুলো এলোমেলো হয়েছে। আমি একমনে খানিকক্ষণ রেখা সরখেলের পানে তাকিয়ে থাকলুম।

উপন্যাস নাটকে পড়েছেন, সিনেমাতে দেখেছেন প্রেম দরিয়াতে স্পাই হাবুডুবু খায়। সুন্দরীরা সদা সর্বদাই স্পাই-এর প্রেম-বন্ধনে আটকা পড়ছে।

উপন্যাস নাটকে পড়েছেন, সিনেমাতে দেখেছেন প্রেম দরিয়াতে স্পাই হাবুডুবু খায়। সুন্দরীরা সদা সর্বদাই স্পাই-এর প্রেম-বন্ধনে আটকা পড়েছে। কিন্তু এ প্রেম নয়, এ হলো পাপ। এর ভেতরে কোন ভালবাসা নেই, আছে শুধু দেনা-পাওনার হিসেব। কর্তৃপক্ষের চোখে ধূলো দেবার জন্ম মেয়েদের সাহায্য নিতে হয়।

আজ আমাকেও সেই প্রেমের অভিনয় করতে হবে। আমি মূল্যবান গোপনীয় খবর চাই। এই কাজে সাহায্য করবে রেখা সরখেল।

আমার চিন্তায় বাধা পড়লো। রেখা সরখেল জিজ্ঞেস করলো,

: তুমি কী করো জি-বি-এম?

: কণ্ট্রাক্টর, সেলসম্যান—এক ইংরেজ কোম্পানী, হান্জ উন্ত মারিয়ার প্রতিনিধি হয়ে ভারতবর্ষে এসেছি মাল বিক্রি করতে। কাজ শেষ হলে আবার ফিরে যাবো।

: থাকো কোথায়? কৌতূহলী হয়ে রেখা সরখেল আবার প্রশ্ন করলো।

: আমি বেরুটে থাকি। আমি হলুম ঐ কোম্পানীর নিয়ার এণ্ড ফার ইস্টের প্রতিনিধি। একটা সরকারী কন্ট্রাক্ট পাবার লোভে ভারতবর্ষে এসেছি।

: বেরুট! শুনেছি ওদেশের মেয়েরা নাকি খুব সুন্দরী?

আমি প্রমাদ গুনলুম। হয়তো বেফাঁস কিছু বলে ফেলেছি। কী প্রয়োজন ছিলো বেরুটের নাম বলবার। নিজের বিপদ নিজেই ডেকে এনেছি। আমি রেখা সরখেলের কথা হেসেই উড়িয়ে দিয়ে বললুম: ও দেশের মেয়েদের তুলনায় তুমিই বা কম সুন্দরী কিসে?

: সত্যি কথা বলছো তো? জানো জি-বি-এম, তোমার কথাগুলো ভারী সরল। এই দিল্লীতে সবাই বাঁকা সুরে কথা বলে। এই শহরে আমার অনেক কেচ্ছা, অনেক দুর্নাম শুনতে পাবে। সবই মন গড়ানো কথা। তুমি অনেকদিন থেকেই বিদেশে আছো তাই তোমার মনে কোন জটিলতা নেই।

রাত প্রায় তিনটে বাজলো। এতো রাতে দিল্লীর নির্জন রাস্তা দিয়ে একটি মেয়ের সঙ্গে গাড়ীতে ঘোরার অনেক বিপদ আছে। পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করার ভয়ও আছে। তাই আমি বললুম,

: রেখা, অনেকটা বেড়ানো তো হলো, চল এবার ঘরে ফেরা যাক। মিঃ সরখেল নিশ্চয় তোমার জন্ম চিন্তা করবেন।

আমি ইচ্ছে করেই মতি সরখেলের নাম উল্লেখ করলুম। কারণ, মতি সরখেলের প্রতিটি কার্যকলাপ আমি জানতে চাই।

: উনি কী আর আমার জন্মে বসে আছেন, এতোক্ষণে হয়তো নাক ডাকিয়ে

ঘুমুচ্ছেন।

: মিঃ সরখেল নিশ্চয় অনেক রাত অবধি কাজ করেন? আমি কৌতূহল প্রকাশ করলুম।

: হ্যাঁ, দেড়টা দুটো পর্যন্ত।

: এতো কী কাজ?

: ওঃ তুমি জানো না বুঝি? আমার স্বামী ভারত সরকারের একজন উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী। সরকারী মহলে ওঁর প্রচুর সুখ্যাতি। জানো, মিঃ সরখেল ডিফেন্স মিনিষ্ট্রির একজন হর্তা-কর্তা-বিধাতা।

: ওঁর কাছে তাহলে নিশ্চয় প্রচুর সিক্রেট কাগজপত্র থাকে? আমি প্রশ্ন করলুম।

রেখা সরখেল প্রথমটায় আমার প্রশ্নের কোন জবাব দিলো না। বেশ খানিকক্ষণ আমার পানে তাকিয়ে থেকে তারপর বললো: ফাইলের কথা বলছো মিঃ বি-এম। বাপস্‌রে বাপ! আমার স্বামী তো আর আমাকে বিয়ে করেন নি, বিয়ে করেছেন কতকগুলো সরকারী ফাইলকে।

রেখা সরখেল এমন নির্লিপ্ত কণ্ঠে জবাব দিলো যে আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললুম। রেখা সরখেলের মনে সন্দেহ জাগলে আমার কাজ বাগাতে অসুবিধে হবে।

রেখা সরখেল বললো: জানো মিঃ বি-এম, এইসব কাজকর্ম নিয়ে প্রায়ই আমাদের ঝগড়া হয়। কিন্তু আমার স্বামী কী আর আমার কথা শোনেন? তাইতো অজানা, অজ্ঞাত উত্তেজনায় নিজের জীবনটা ভাসিয়ে দিয়েছি।

আমি সেদিন আর কথা বাড়ালুম না। ধীরে ধীরেই রেখা সরখেলের মুখ থেকে সমস্ত খবর বের করতে হবে। মতি সরখেলের প্রতিটি খবর আমার জানা চাই। নইলে কাজ বাগাবো কী করে। তাই বললুম: থাক, আর একদিন তোমার গল্প শুনবো, আজ অনেক রাত হয়ে গেছে। এবার বাড়ী চলো।

রেখা সরখেল বললো: বেশ।

এর পর আমাকে হোটেলের সামনে নামিয়ে দিয়ে রেখা সরখেল তার গাড়ী নিয়ে চলে গেলো।

*   *   *

পরের দিন ফাঁদের জাল পাতলুম। ঠিক করলুম, প্রথম কয়েকটা দিন রেখা সরখেলকে জেতাতে হবে। তার লোভ বাড়িয়ে দিতে হবে। তারপর ধীরে ধীরে জাল গুটিয়ে আনবো। রেখা সরখেলের ভাগ্য পরিবর্তন হবে। আর তাস খেলার এমনি নেশা যে ঘর-সংসার সবই ভুলে যেতে হয়। রেখাও ভুলবে।

দেশমুখ বেশ ভালো খেলে। বড্ডো হুঁশিয়ার ও ধড়ীবাজ। সর্বদাই আমার ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে।

তবে দেশমুখ বড়লোকের ছেলে। নিজেরও ব্যবসা আছে। আসরে বসে বড়ো বড়ো স্টেকে বাজী ধরে। কিন্তু আমি এমন পাঁয়তাড়া করলুম যে প্রথম কয়েকটা দিন দেশমুখ প্রচুর হারলো। সবই আমার হাতের কাজ। প্রতিবারই রেখা জিতলো।

ভাগ্যের এই পরিবর্তন দেখে রেখা সরখেল আনন্দে উত্তেজিত হলো। দেশমুখ ও সরোজের মুখ গম্ভীর হলো। প্রথম রাত্রির খেলাতেই রেখা সরখেল প্রায় তিন হাজার টাকা পেলো।

দেশমুখ আর সরোজের মতো আমিও হারলুম। কিন্তু আমার হারাতে কিছু এসে যায় না। আমার শিকার হলো রেখা সরখেল। আমি চাই ও বাজী জিতুক।

খেলার শেষে রেখা বললো : জি-বি-এম, ইউ আর এ লাকী গাই। তুমি আসার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভাগ্য পরিবর্তন শুরু হয়েছে।

আমি রেখা সরখেলকে জানালুম না যে ওর এই ভাগ্য পরিবর্তনের অন্য কারণ আছে। সেদিন অনেক রাত অবধি আমরা দু'জনে নির্জন দিল্লীর পথে পথে দু'টি প্রেমিক-প্রেমিকার মতো ঘুরে বেড়ালুম।

বেড়াতে বেড়াতে আবার মতি সরখেলের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলুম আমি। রেখাকে জিজ্ঞেস করলুম : এতো রাত অব্দি যে বাইরে থাকো তোমার স্বামী আপত্তি করেন না?

: আমার প্রতি নজর দেবার সময় কোথায় মিঃ সরখেলের। সম্প্রতি একেবারেই সময় পান না আমার দিকে মুখ তুলে তাকাবার। রেখা জবাব দিলো।

: এতো কাজ? আবার প্রশ্ন করলুম আমি।

: হ্যাঁ, জি-বি-এম। এই চীনিদের সঙ্গে বিরোধের শুরু থেকেই আমার স্বামীর কাজ অনেক বেড়ে গেছে। আজকাল পুরোদিন মিটিং আর কনফারেন্স করে সময় কাটান। গভীর রাত অবধি সরকারী ফাইলের পাতা ওল্টান। জানো, দেশরক্ষা সংক্রান্ত যতোগুলো কমিটি হয়েছে সব কমিটিরই মেম্বার আমার স্বামী। এই তো সেদিন আমেরিকা থেকে একদল জেনারেল এলো আর্মস সাপ্লাই নিয়ে আলোচনা করতে। এক ককটেলে ওদের সঙ্গে দেখা হয়েছিলো। বেশ লোক। কাল থেকে আমার স্বামী ওদের তৈরি রিপোর্ট পড়ছেন।

: কোন সিক্রেট রিপোর্ট নাকি? আমি জিজ্ঞেস করলুম।

: হ্যাঁ, টপ-সিক্রেট, রেখা জানালো। তারপর আবার একটু ভেবে বললো,

আচ্ছা জি-বি-এম, সিক্রেট, টপ-সিক্রেট ফাইল সম্বন্ধে তোমার এতো আগ্রহ কেন বলতো ?

আমি একটু হেসে রেখা সরখেলের কথাটা উড়িয়ে দিলুম। বললুম : রেখা, জীবনে কোনদিন আমি সিক্রেট বা টপ-সিক্রেট, কোন ফাইলই দেখিনি। তবে সিক্রেট ফাইল সম্বন্ধে এতো গল্প শুনেছি যে তার জন্তেই কৌতূহলী হয়ে তোমাকে প্রশ্ন করেছি।

: মিঃ সরখেল সেদিন আমাকে কী বলেছিলেন জানো ?

: কী ? আমি প্রশ্ন করলুম।

: এইসব ফাইল চীনিরা দেখলে লুফে নেবে। এতো গোপনীয় এইসব ফাইল যে আমারও ভয় হয় ফাইলগুলো নাড়াচাড়া করতে।

: তুমি কি আগে কখনো সিক্রেট, টপ-সিক্রেট ফাইল দেখোনি নাকি ? আমি জিজ্ঞেস করলুম।

: পাগল হয়েছো, ওসব ফাইল দেখে কী করবো ? আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবরে আমার কী লাভ হবে। উনি রোজই তো দপ্তর থেকে কতো সব ফাইলপত্র নিয়ে আসেন। আবার পরেরদিন দপ্তরে ফিরিয়ে নিয়ে যান। অফিসের একটা ডেস্‌প্যাচ বাক্স আছে। সেই বাক্সটার ভেতরে ফাইলগুলো থাকে।

: ডেস্‌প্যাচ বাক্সটা কোথায় রাখা হয় ? শোবার ঘরে না বসবার ঘরে ? —আমার যেন একটু সাহস বাড়ে। আমি কৌতূহল প্রকাশ না করে পারি না।

: সত্যি জি-বি-এম, তোমার প্রশ্ন শুনলেই যেন মনে হয় তুমি চীনিদের স্পাই। বাপ্‌রে গোপন খবর জানবার কী তীব্র আকাঙ্ক্ষা তোমার। পাগল হয়েছো, এইসব ফাইল কখনো শোবার ঘরে রাখা যায়। লাইব্রেরী রুমে একটা আয়রনসেফ আছে। উনি ফাইলগুলোকে সেই সিন্দুকটার মধ্যেই ঢুকিয়ে রাখেন।

রেখা সরখেলের মুখে চীনি স্পাই-এর নাম শুনে আমি একটু সতর্ক হলুম। ভয়ও হলো, হয়তো বড্ডো বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি। অতএব কথার মোড় ঘোরালুম। বললুম : সত্যি রেখা তোমার এতো সরল মন। এরকম মেয়ে আমি আগে কখনও দেখিনি।

: বাঁচালে! এতোক্ষণ কী সব ছাইপাঁশ বকছিলে। যাক্‌, তবু এবার একটা ভালো কথা বললে।

এর পর বেশ খানিকক্ষণ আমরা দু'জনেই চুপ করে থাকলুম। আমি ভাবতে লাগলুম, এবার আর কী প্রশ্ন করা যায়। মতি সরখেলের সব খবর আমি

চাই। তিনি কখন অফিস যান, কখন বাড়ীতে ফেরেন, কার কার সঙ্গে কথা বলেন, সব।

রেখা সরখেল হঠাৎ-ই বললো: আচ্ছা জি-বি-এম, ওরা আমাকে খারাপ মেয়ে কেন বলে বলতো? আমি তো কোন দোষ করিনে।

স্ত্রীর এই দুর্নামের জন্য মতি সরখেলও যে বেশ কিছুটা দায়ী এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ ছিলো না। স্ত্রীর প্রতি কর্তা উদাসীন। স্ত্রীর মনের কোন আশা-আকাঙ্ক্ষাই পূরণ করতে পারেন নি ভদ্রলোক। তাই রেখা সরখেল আজ উচ্ছৃঙ্খল উত্তেজনার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। এখন আর সে জীবনধারা পাল্টানো যায় না।

সেদিন আর কোন কথা হলো না আমাদের মধ্যে।

তারপর, পর পর আরও কয়েকদিন তাস খেললুম।

প্রতিদিনই রেখা সরখেল বাজী জিততে লাগলো। এবার খেলার নেশা তাকে পেয়ে বসলো। রেখা সরখেল প্রতিদিনই জেতে। অতএব দেশমুখ ও সরোজেরও হার হচ্ছে রোজই। হঠাৎ তাদের এই ভাগ্য পরিবর্তনের কারণ খুঁজে পাচ্ছে না তারা। সরোজ ও দেশমুখের মনেও জেদ চাপে। যেমন করেই হোক জিততে হবে। প্রচুর টাকা তারা রোজই আসরে ঢালতে থাকে। সব টাকাই গিয়ে আশ্রয় নেয় রেখা সরখেলের ভ্যানিটি ব্যাগে। দু'দিনেই বেশ জমজমাট হয়ে উঠলো তাসের আড্ডাটি।

*　　　*　　　*

ইতিমধ্যে আমার কাজও আমি অনেকটা হাসিল করে এনেছিলুম। রেখা সরখেলের মুখ থেকে একটু একটু করে জেনে নিয়েছিলুম মতি সরখেলের সম্পূর্ণ জীবনধারা। সকাল থেকে শুরু করে আবার আর একটা সকাল পর্যন্ত প্রতিদিনকার প্রত্যেকটি পদক্ষেপ। কখন বেরোন, কখন ফেরেন সব কিছুই। পড়বার ঘর শোবার ঘর, কোন্‌টা কোথায় কিছুই আমার অজানা থাকলো না। মনে মনে তাদের বাড়ীর একটা নক্‌শা করেছিলুম। রেখা সরখেলকে প্রশ্ন করে করে নক্‌শাটা যাচাই করে নিলুম।

একদিন জিজ্ঞেস করলুম: রেখা, তোমাদের পড়বার ঘরের বাতির পাওয়ার কতো?

: হঠাৎ এই প্রশ্ন করলে কেন? বিস্মিত কণ্ঠে রেখা জানতে চাইলো।

: অল্প পাওয়ারের বাতিতে রাতে পড়তে অসুবিধে হয় না? আমি আবার অল্প আলোয় পড়তে পারি না কিনা তাই জিজ্ঞেস করছি। অল্প কোন

কারণ নেই, আমি বললুম।

: ঠিক বলতে পারবো না, জবাব দিলো রেখা সরখেল।

এমনি করে গভীর রাতে দিল্লীর পথের নির্জনতায় আমি রেখা সরখেলের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করতুম আর গোপন খবর সংগ্রহ করতুম।

* * *

একদিন এই নাটকের যবনিকা পতনের সময় হলো। আমি খেলার মোড় ঘোরালুম।

এবার রেখা সরখেল হারতে শুরু করলো। যতোই হারে ততোই খেলার নেশা বাড়ে। কয়েকদিনেই রেখার পুঁজি ফুরিয়ে গেলো।

রেখা এবার টাকা ধার করতে লাগলো। প্রথমে দেশমুখের কাছ থেকে ধার নিতো, তারপর আমার কাছ থেকেও টাকা ধার নিতে লাগলো। অর্থাৎ আমার পাতা ছক্ মতোই ঘটনা ঘটতে লাগলো।

খেলার শুরুর দিকে রেখাকে ভালো তাস দিতুম। ভালো তাস পেয়ে তার খেলার নেশা বাড়তো। তারপর খেলার শেষ দিকে দিতুম খারাপ তাস। জেতা টাকা সবই বেরিয়ে যেতো দু' দানে। তারপর ধার। প্রতিদিনই ধারের মাত্রা বাড়তে লাগলো এই করে।

কয়েকদিনের ভেতরই রেখা সরখেল সর্বস্বান্ত হয়ে দেনায় ডুবে গেলো। আমারও মনস্কামনা পূরণ হলো। এবার আমি রেখা সরখেলকে হাতের মুঠোয় পেলুম। শুধু এখন আমার কাজ বাগালেই হয়।

* * *

একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে রেখা বললো,

: বিস্তর ধার হয়ে গেলো জি-বি-এম।

: কতো? নির্লিপ্তকণ্ঠে আমি প্রশ্ন করলাম। যেন কিছুই জানিনে এমন একটা ভাব দেখিয়ে প্রশ্ন করলাম।

: প্রায় ত্রিশ হাজার। তুমিই তো আমার কাছে উনত্রিশ হাজার পাবে।

: না, বত্রিশ হাজার। আমি ওর ভুল সংশোধন করে বললুম।

: জানো জি-বি-এম, আমার সমস্ত হিসেব গুলিয়ে গেছে। কার কাছে যে কতো ধার আমি নিজেই ঠিক বলতে পারবো না। আচ্ছা বলতো, আমার ভাগ্যের পরিবর্তন হলো কেন?

: লাক, রেখা সবই লাক! একেই বলে ভাগ্যচক্র। কিন্তু ভয় পাবার কী আছে? একটা প্রবাদ আছে জানো। টাকায় টাকা আনে। টাকা খরচ করো টাকা আসবে। ত্রিশ বত্রিশ হাজার তুমি ইচ্ছে করলে দু'দিনেই

রোজগার করতে পারবে। ভয় পাবার কিছু নেই। টাকার চিন্তা করে তুমি শরীর নষ্ট করো না।

: তুমি আমাকে আরো টাকা দেবে জি-বি-এম। অবিশ্বাসের সুরে রেখা সরখেল প্রশ্ন করলো।

: নিশ্চয়! একবার কেন, বহুবার।

টাকার আশ্বাস পেয়ে রেখা আবার জুয়াড়ীর মতো খেলতে লাগলো। সপ্তাহখানেকের মধ্যে তার ধারের অঙ্ক উঠলো চল্লিশ হাজারে।

এবার জাল গুটোবার পালা। মাছ ডাঙ্গায় তুলতে হবে।

* * * *

অভিনয়ের শেষ দৃশ্য, শেষ অঙ্ক।

সেদিন খেলাটা প্রথম থেকেই জমে উঠলো।

শেষ দশ ডিল হলো আসল খেলা। রেখা ও দেশমুখকে খুব ভালো তাস পেলো। খেলার আসরে সবাই উত্তেজিত। রেখা আজ প্রচুর হেরেছে। অতএব টপ তাস পেয়ে সে বেশ একটু চঞ্চল হলো। এই ডিল খেলবার জন্য আমার কাছ থেকে আবার দু' হাজার টাকা নিলো। দেশমুখও ছাড়বার পাত্র নয়। তারও খেলার রোখ চাপলো। টাকার অঙ্ক বাড়তে লাগলো।

রাত তখন আড়াইটে। রেখার পুঁজি নিঃশেষিত। ধার করে আর কতোক্ষণ খেলা যায়। রেখা সরখেলের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিলো। উত্তেজনায় তার হাত কাঁপতে লাগলো। শেষ অবধি রেখা বললো: দেশমুখ তোমার তাস দেখাও।

রেখা তার হাতের তাস চীৎ করে দেখালো, টপ রান।

দেশমুখ তার তাস দেখে হাসলো। বললো: আমারও টপ রান রেখা। কিন্তু 'শো' তুমি দিয়েছো, সুতরাং বাজী আমার।

বোর্ডে প্রায় তিন হাজার টাকা ছিলো। সমস্ত টাকা দেশমুখ তার নিজের কোলে টেনে নিলো। মুখ কালো হয়ে গেলো রেখা সরখেলের। আর একটি কথাও বের হলো না তার মুখ দিয়ে। সে আসন ছেড়ে উঠে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো ঘরের বাইরে। আমিও ওর পিছু নিলুম।

* * * *

অন্ধকার রাত, নির্জন রাস্তা।

পাগলের মতো ছুটে চলেছে রেখার গাড়ী। আমি বসে আছি রেখার পাশে। কোথায় যাচ্ছি জানিনে। চলছি তো চলছিই।

হঠাৎ রেখা আমাকে জিজ্ঞেস করলো: আগ্রা যাবে জি-বি-এম?

: আগ্রা !

রেখার এই প্রস্তাব একেবারেই অপ্রত্যাশিত। আমি একটু আতঙ্কিত হলুম। এই রাত্রে রেখা সরখেলকে নিয়ে আগ্রা যাওয়ায় বিপদ আছে।

পাগল হলো নাকি রেখা ! আগ্রা যাওয়া ইমপসিবল।

আমি আপত্তি জানালুম। বললুম : তুমি পাগল হলে নাকি রেখা ?

: জি-বি-এম, আজ রাত্রে আমি একটা কিছু করতে চাই। সামথিং ডেঞ্জারাস।

: বোকামি করো না রেখা, তুমি নিজের বিপদ ডেকে আনবে।

: আমি আর বিপদের পরোয়া করি না, রেখা জবাব দিলো।

এবার আমি নিজের মুখোশ খুললুম। আর দেরি করলে সমস্ত প্ল্যান ভেস্তে যাবে। এখুনিই কাজ শুরু করতে হবে।

নিজের পকেট থেকে কতকগুলো কাগজ বের করলুম। সবই রেখার সই করা প্রমিসারী নোট। আই-ও-ইউ।

সেই প্রমিসারী নোটগুলোর দিকে তাকিয়ে বললুম : হ্যাঁ, অনেক টাকাই ধার করেছো রেখা। আমার কাছ থেকেই প্রায় চল্লিশ হাজার।

চল্লিশ। হাজার ! আতঙ্ক মিশ্রিত বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠলো রেখা। বললো,—জানো, চল্লিশ হাজার টাকা শুধু তোমার কাছে। দেশমুখ আর সরোজও পাবে অনেক টাকা। এতো টাকা শোধ দেবো কী করে বলতে পারো ?

সত্যি জি-বি-এম, বললে না একটু চিন্তা করে রেখা আবার জিজ্ঞেস করল কী করে এই টাকা শোধ করবো। একটা কিছু পথ বাত্‌লাও।

: উপায় একটা আছে বটে, কিন্তু জানিনে তুমি সে কাজ করতে রাজী হবে কি না, আমি বললুম।

তারপর একটু চুপ করে থেকে আবার বললুম : এই কাজ করা ছাড়া আর তো কোন উপায় দেখছিনে।

আমার কথা শুনে রেখা কী মনে করলো জানিনে, সে আমাকে একটা ধমক দিয়ে বললো : সত্যি জি-বি-এম, তুমি ভারী নীচু, মীন।

আমি কিন্তু রাগ করলুম না। বললুম : তুমি অনর্থক রাগ করছো রেখা। আমি তোমাকে আমার শয্যাসঙ্গিনী হতে বলিনি। আমি ভিন্ন একটা কাজের কথা বলেছি।

আমার কথায় রেখা একটু লজ্জা পেলো। কৈফিয়তের কণ্ঠে বললো : সরি জি-বি-এম, আমি তোমার প্রস্তাবের কুশ্রী অর্থ করেছিলুম। মাপ করো…

তারপর কণ্ঠস্বর একটু নীচু করে আবার বললো : এমন কী কাজ আমি করতে পারি বলতো ? চল্লিশ হাজার টাকা তো সামান্য টাকা নয় ! এই টাকা শোধ করতে হয়তো আমার সমস্ত জীবনটাই শেষ হয়ে যাবে !

আমি এবার গলার স্বর একটু উঁচু করলুম। এবার দাবার চাল দেবার সময় হয়েছে। আর দেরি করা যায় না। বললুম,

: কাজটা কিছু কঠিন নয়। সংবাদের ব্রোকারী। সাংবাদিকের ভাষায় বলতে পারো নিউজ রিপোর্টিং।

: মানে ? তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারলুম না। রেখা সরখেলের চোখে-মুখে যেন বিস্ময় ফুটে উঠলো।

বললুম তো, নিউজ রিপোর্টিং। হাই কনফিডেন্সিয়াল নিউজ রিপোর্টিং। পৃথিবীতে একদল লোক আছে যাদের কাজ হলো সংবাদ সংগ্রহ করা। এরা সাধারণ নিউজ রিপোর্টারদের থেকে অনেক বেশি টাকা পায়। চল্লিশ হাজার তো কিছুই নয়। ইচ্ছে করলে তুমি এর চেয়েও অনেক বেশি উপায় করতে পারো।

: তুমি কী বলছো জি-বি-এম ? সামান্য সংবাদের জন্য কেউ যে আমাকে এতো টাকা দেবে এ আমি ভাবতেই পারিনে।

: সংবাদ সামান্য নয়। খুবই জরুরী ও মূল্যবান সংবাদ। শোন রেখা, তোমার স্বামী মতি সরখেল এই শহরের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। বিস্তর দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান খবর ওঁর কাছে থাকে। এইসব খবর খুবই চড়া দামে বাজারে বিক্রি করা যায়। ধরো আমেরিকা ভারতের কাছে আর্মস বিক্রি করছে। এইসব হাতিয়ারের একটা লিস্ট তুমি যে কোন দামে বাজারে বিক্রি করতে পারবে। মিগ প্লেনের নামও শুনেছো নিশ্চয়। রুশ দেশের ফাইটার প্লেন। শুনেছি এই প্লেন এখন থেকে ভারতেই তৈরি করা হবে। কোথায় এই প্লেন তৈরির কারখানা বসবে সে খবরও খুবই মূল্যবান। ইচ্ছে করলেই হাজার দশেক টাকার বিনিময়ে তুমি তুচ্ছ এই খবরটাও বিক্রি করতে পারো। চীনিদের সঙ্গে যুদ্ধ হবার পরে ভারত সরকার সমস্ত বর্ডার এরিয়াতে নতুন নতুন রাস্তা তৈরি করছেন। এই বর্ডার এরিয়ার ম্যাপ যদি সংগ্রহ করা যায়, তাহলে টাকার জন্য তোমাকে আর কোন চিন্তা-ভাবনা করতে হবে না।

আমার কণ্ঠস্বর একধাপ নীচে নামলো। বললুম,

: রেখা, এই সমস্ত খবরই তোমার স্বামীর কাছে আছে। ঐ ডেসপ্যাচ বাক্সে কিংবা স্টাডি রুমে। একবার কোনক্রমে যদি ঐসব সংবাদ যোগাড় করতে পারো তাহলে টাকা ধারের কথা আর তোমাকে চিন্তা করতে হবে না !

: মানে তুমি আমাকে গোপনীয় সংবাদ চুরি করতে বলছো,—রেখার কণ্ঠে বেশ একটু তীব্রতা ছিলো।

: শ্রীকৃষ্ণের শত নাম। যে কোন নামেই তুমি তাকে ডাকতে পারো, আমি জবাব দিলুম।

: অর্থাৎ স্পাইং।

: হ্যাঁ, ইংরেজী ভাষায় কথাটা স্পাইংই বটে।

: জি-বি-এম···!

রেখা সরখেলের কথাটা শেষ হলো না। একটা তীব্র আর্তনাদ করে রেখার গাড়ীটা মাঝ রাস্তায় থেমে পড়লো।

এবার আমার পানে তাকিয়ে রেখা বললো: আমি ভেবেছিলুম তুমি ভদ্রলোক। কিন্তু এখন দেখছি যে তুমি দেশদ্রোহী, স্পাই। কথাটা আমি আগে বুঝতে পারিনি।

: রাগ করে লাভ নেই রেখা। আজ তুমি জীবনের এমনই এক পর্বে এসে পৌঁছেচো যখন, তোমার পক্ষে আর রাগ প্রকাশ করা চলে না। এই যে কাগজগুলো দেখছো, যাকে আমরা বলি প্রমিসারী নোট, এগুলো সবই তোমার নিজের হাতে সই করা। এই সামান্য কাগজের পরিবর্তে তুমি চল্লিশ হাজার টাকা ধার নিয়েছো। এবার তাহলে তুমিই বলো কী করে এই ধার শোধ করবে। একটু আগে বলেছো, সারা জীবন তুমি এই ঋণের দায়ে আবদ্ধ হয়ে থাকবে, কিছুতেই এই দায় শোধ করতে পারবে না। কিন্তু আমি তো তোমাকে কোন ঋণের দায়ে আটকে রাখতে চাইনে রেখা। আমি তোমাকে ঋণের হাত থেকে মুক্ত করতে চাই।

: সোয়াইন, প্রায় চীৎকার করেই রেখা সরখেল বললো।

রেখার কথা শুনে আমি হাসলুম। মৃদু হেসে জবাব দিলুম: রেখা, তুমি আমাকে যতোই গালমন্দ করো না কেন আমি রাগ করবো না। তুমি যে কাগজে সই করে টাকা নিয়েছো সেই কথাটাই একবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলুম। একবার নিজের ভবিষ্যতের কথাটা ভেবে দেখেছো কী?

আমার কথা ভাবছি না রেখা। আমি শুধু তোমার ভবিষ্যতের কথাই ভাবছিলুম। কারণ, হয় আজ তোমাকে এই চল্লিশ হাজার টাকা শোধ করতে হবে, না হয়তো এখনই এই রিপোর্টিং-এর কাজে নামতে হবে আমি বললুম।

আমি তাকিয়ে দেখলুম রেখা সরখেলের মুখ শুকিয়ে গেছে। উত্তেজনায় ভয়ে আতঙ্কে ঠোঁট কাঁপছে।

ভাবছেন, সেদিন রেখা সরখেলের এই দুর্গতি দেখে আমার একটু দয়া হয়ে-

ছিলো। ভুল, একেবারেই ভুল। মেয়েদের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য গোবিন্দবিহারী মালকানি কোনদিনই করে নি। আজও করলুম না।

আমি আবার বলতে লাগলুম: রেখা কাজটা খুব কঠিন নয়। মাত্র এক ঘন্টার জন্ম আমি এইসব জরুরী ফাইলগুলো দেখতে চাই। তোমাকে এই কাগজ চুরি করতে হবে না। একদিন রাতে আমি তোমার বাড়ীতে যাবো। সেইখানেই বসেই আমি ফাইলগুলো দেখবো।

এবার রেখা তার মুখ খুললো: মাপ করো কি বি-এম, তোমার এই হীন প্রস্তাব আর বার বার শুনতে ইচ্ছে করছে না। রেখা সরখেল অর্থের জন্তে তার দেহ বিক্রি করতে পারে কিন্তু দেশকে বিক্রি করতে পারে না। তুমি যে এতো নীচ প্রকৃতির তা আমি কখনই কল্পনা করিনি। আগে তোমার চরিত্রের আভাস পেলে আমি তোমার সঙ্গে মিশতুম না। তোমার সঙ্গে কথা বলতেও এখন আমার ঘৃণা হচ্ছে। কী জঘন্য। একটি মেয়েকে বিপদে ফেলতে তোমার একটুও লজ্জা করলো না।—

আমি জবাব দিলুম: লাজ-লজ্জার বালাই গোবিন্দবিহারী মালকানির চরিত্রে নেই রেখা।

: মানুষ এতো স্কাউন্ড্রেল হয় জানতুম না, রেখা বললো।

: তোমার মতো মেয়েদের এই কথাটা জানা উচিত ছিলো। যাক মাদাম, এবার তোমার কাছ থেকে স্পষ্ট জবাব চাই। কী ঠিক করবে, তাই বল? টাকা শোধ দেবে না এই প্রমিসারী নোটগুলো তোমার স্বামীর কাছে, পার্লামেন্টের সদস্যদের কাছে পেশ করবো?

: ওরা কেউ তোমাকে বিশ্বাস করবে না রেখা। কেউ না। এতোদিন তুমি যেভাবে আমার সঙ্গে মিশেছো তাতে কেউই তোমার কোন কথায় কান দেবে না। এই নিয়ে বাজারে বিস্তর কানাঘুষো হবে। আমি যদি দেশদ্রোহী হই ওরা তোমাকে বলবে দেশদ্রোহীর বান্ধবী। মিসেস রেখা সরখেল কোথেকে এই টাকা পেলো? কে দিয়েছে? দিয়েছে গোবিন্দবিহারি মালকানি। সে কে? সে স্পাই। আর রেখা সরখেল তার বান্ধবী। কেন গোবিন্দবিহারী মালকানি রেখাকে টাকা দিয়েছে, না সংবাদ সংগ্রহের জন্তে।

এইবার রেখা একটু কল্পনা করে দেখো তোমার বিপদ কোথায়। হাঁ, আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমার সঙ্গে সহযোগিতা করলে কেউ জানতে পারবে না যে বাজারে তোমার চল্লিশ হাজার টাকার দেনা আছে। তোমার এইটুকু সহায়তার বিনিময়ে আমি এইসব প্রমিসারী নোটগুলো ছিঁড়ে ফেলে দেবো। তোমার সঙ্গে কী লেনদেন হল তা কেউ জানতে

পারবে না।

রেখার মুখের পানে তাকিয়ে দেখলুম, সে বেশ উত্তেজিত হয়েছে। এবার সে একটু ধীর ও শান্তকণ্ঠে বললো: জি-বি-এম, প্লীজ। আমি তোমার মুখ আর দেখতে চাইনে। আমাকে রেহাই দাও। আমি তোমাকে সামনের ট্যাক্সী স্ট্যাণ্ডে নামিয়ে দিচ্ছি। প্লীজ গো অ্যাওয়ে ফ্রম মী।

আমি হেসে জবাব দিলুম: আমাকে সামনের ট্যাক্সী স্ট্যাণ্ডে নামাতে হবে না, আমি এখানেই নেমে যাচ্ছি। বাকী পথটা না হয় হেঁটেই যাবো। কিন্তু আমার এই প্রস্তাব তুমি তুচ্ছ করো না রেখা। সাতদিন সময় দিলুম তোমাকে। এর মধ্যে ভেবেচিন্তে বল আমার সঙ্গে কাজ করতে রাজী কি না? যদি আমার সঙ্গে সহযোগিতা না কর তাহলে বাধ্য হয়েই আমাকে প্রকাশ করতে হবে যে তুমি আমার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছো। আর যদি আমার সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজী হও তাহলে আমি তোমার সঙ্গে তোমাদের বাড়ীতে যাবো। কতকগুলো সিক্রেট ও টপ-সিক্রেট ফাইলের ফটো নিতে হবে। থাক, এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে দেখার জন্য তোমাকে সাতদিনের সময় দিলুম। সাতদিন বাদে সন্ধ্যে ঠিক সাতটায় আমি গেলর্ড রেস্তোরাঁয় তোমার জন্য অপেক্ষা করবো। নাউ, থিঙ্ক ইট ওভার এ্যাণ্ড গিভ মি রিপ্লাই।

রেখা সরখেল আমার কথার কোন জবাব দিলো না। গাড়ীতে স্টার্ট দিয়ে হুস করে গাড়ি চালিয়ে চলে গেলো।

মনে মনে আমি ভাবতে লাগলুম, মাছ কী ডাঙ্গায় উঠবে!

* * *

সাতদিন বাদে সন্ধ্যে ঠিক সাতটায় আমি গেলর্ড রেস্তোরাঁয় গিয়ে হাজির হলুম। এই সাতদিন যেন আমার কাছে সাত যুগ বলে মনে হয়েছিলো। খালি ভেবেছি রেখা সরখেল কী জবাব দেবে।

বহু চিন্তা তখন আমার মাথায় গিজগিজ করছিলো। মনে মনে ভাবলুম, আজ শুধু রেখার বিপদ নয়। আজ গোবিন্দবিহারী মালকানিরও বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। 'সাকসেস্ অর ফেলিওর' এই দুই-এর ভেতর তার জীবন ঝুলছে।

ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে। রেস্তোরাঁয় কোলাহলের মধ্যেও আমি যেন ঘড়ির কাঁটার টিক্‌টিক্ শব্দ শুনতে পেলুম।

সাতটা বেজে পাঁচ মিনিট হয়ে গেলো কিন্তু তখনও রেখা সরখেল এলো না। আমি জানতুম রেখা আসবে না। সাতটা বেজে দশ। মনে হলো পাশের টেবিলের লোকগুলো একদৃষ্টে আমার দিকেই চেয়ে আছে। ওরাও কী আমাকে

সন্দেহ করেছে নাকি ?

রেস্তোরাঁর ওয়েটার দু' একবার আমার পাশ দিয়ে ঘুরে গেলো। ঘড়ির কাঁটার শব্দ আরও তীব্র হলো। ভাবলুম, আরও পাঁচটা মিনিট অপেক্ষা করা যাক।

কিন্তু মুহূর্তে সেই পাঁচটা মিনিটও কেটে গেলো। এবার আমি ওঠার আয়োজন করলুম। বিনা কাজে গেলর্ডে বসে থাকলে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

এই সময়ে হঠাৎ দরজার দিকে তাকাতে মনে হলো রেখা সরখেলই ধীরে ধীরে ভেতরে প্রবেশ করছে।

রেস্তোরাঁর ভেতরে ঢুকে রেখা সরখেল একবার চারদিকে তাকালো। রঙীন চশমা পরে এসেছে রেখা। তাই-ই ওকে দেখে প্রথমে চিনতে পারিনি।

আমাকে দেখতে পেলো রেখা। ধীরে ধীরে সে আমার টেবিলের পানে এগিয়ে এলো। আমি একবার চারদিকটায় তাকিয়ে দেখে নিলুম। কেউ আমাদের দিকে লক্ষ্য রাখছে কি না দেখে নিলুম। এই হট্টগোলে আমাদের পানে তাকাবার অবসর কারও নেই। মনে মনে একটু স্বস্তি বোধ করলুম এবার।

: বসো। আমি মৃদুকণ্ঠে রেখাকে বসতে বললুম। রেখা আমার কথার কোন জবাব দিলো না। সামনেই একটা চেয়ার টেনে বসলো।

: কোন খবর আছে ? আমিই আবার প্রশ্ন করলুম আগে। এক নজর তাকিয়ে দেখলুম রেখার মুখটা ম্লান, একেবারেই অন্ধকার।

: খবর নেই কোন। বেশ একটু রুক্ষ স্বরেই রেখা জবাব দিলো,—আমি শুধু জানতে এসেছি, তুমি কী চাও আমার কাছে ?

: বলেছি তো, মতি সরখেলের কাছে যে গোপনীয় কাগজপত্র আছে আমি শুধু একটু সময়ের জন্য একবার সেই কাগজগুলো দেখতে চাই।

: তার পরিবর্তে তুমি আমাকে সমস্ত প্রমিসারী নোটগুলো ফেরত দেবে।

: এই ব্যাপারে আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারো।

: কবে থেকে কাজ শুরু করতে চাও! বেশ একটু দৃঢ়কণ্ঠে রেখা আবার জিজ্ঞেস করলো।

: কাল বা পরশু। যে কোনদিনই আমি কাজ শুরু করতে প্রস্তুত আছি। আমি দেরি করার পক্ষপাতী নই। কারণ, হয়তো দু' একদিনের মধ্যেই মিঃ সরখেল ঐসব কাগজগুলো আবার দপ্তরে ফেরত দিয়ে দেবেন।

: অফিসের পরে আমার স্বামী প্রতিদিন ঘণ্টাখানেকের জন্য বেড়াতে যান।

সাতটা থেকে আটটা। কোনদিন হয়তো আধ ঘণ্টা, কোনদিন পঁয়তাল্লিশ মিনিট বেড়ান। এই সময়ের ভেতর তুমি আমার বাড়ীতে আসতে পারো। স্টাডির চাবি ওর কাছেই থাকে। অতএব ঐ দরজার চাবি তোমাকেই তৈরি করিয়ে নিতে হবে। মাত্র আধঘণ্টার জন্য তুমি আমাদের বাড়ীতে আসবে। ব্যস, এর অতিরিক্ত এক মিনিটও নয়।

: এক্সলেণ্ট আইডিয়া, আমি জবাব দিলুম, বাড়ীর কর্তা বাড়ীতে থাকবেন না বটে কিন্তু চাকর বেয়ারারা থাকবে। ওদের নিয়ে কী করবে? আমি তোমাদের বাড়ীতে ঢুকেছি একথা যেন কেউ জানতে না পারে।

: কেউ জানতে পারতে পারবে না। আধ ঘণ্টার জন্য একটা চাকরকে বাজারে পাঠাবো। দ্বিতীয় চাকর আমার সঙ্গে রান্নাঘরের কাজে ব্যস্ত থাকবে। মনে রেখো, ঠিক সাতটা পনেরোতে তুমি আমার বাড়ীতে ঢুকবে। সাতটা পঁয়তাল্লিশের ভেতর আবার বেরিয়ে চলে যাবে। কিন্তু চাবির ব্যবস্থা কী করবে তাই বলো এবার।

আমি হাসলুম, বললুম: আমার কাছে মাস্টার কী আছে। যে কোন দরজা আমি ঐ চাবি দিয়ে খুলতে পারি। আর যে সিন্দুকে ওই সব সিক্রেট কাগজপত্র আছে সে সিন্দুকের তালার কম্বিনেশন বের করতেও আমার একটুও বেগ পেতে হবে না।

: বেশ, কাল বিকেল সাতটা পনেরো মিনিটে তুমি আমাদের বাড়িতে এসো। এবার বলো আমার প্রমিসারী নোটগুলো কখন ফেরত পাবো?

: তোমাদের বাড়ীতে ঢুকবার আগেই আমি তোমাকে এইসব কাগজ ফেরত দেবো। রাজী?

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে রেখা সরখেল বললো: বেশ, একটা কথা মনে রেখো। যদি কোন বিপদে পড়ো তাহলে আমি তোমাকে কোন ভাবেই সাহায্য করতে পারবো না।

বরং তোমাকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে আমার একটুও দ্বিধা বা সংকোচ হবে না।

: পুলিশকে আমি ভয় করিনে রেখা। জীবনে অনেক বিপদের বেড়াজাল কাটিয়ে বের হয়ে এসেছি। আশা করি এবারেও নির্বিঘ্নে কাজ সমাধা করতে পারবো।

: আর একটা কথা শোন, রেখা বললো।

আবার কী কথা থাকতে পারে? আবার কী চায় রেখা? আমি কিছুই অনুমান করতে পারলুম না, তাই প্রশ্ন করলুম—

: শুনছি বলো।

: এই কাজের পরে তুমি আর কোনদিন আমার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করবে না। সম্ভব হলে যত শিগ্‌গির পারো দিল্লী ছেড়ে চলে যাবে।

রেখার কথা শুনে আমি হাসলুম। বললুম: তোমার সঙ্গে যে দেখা করার চেষ্টা করবো না, সেই প্রতিশ্রুতি দিতে পারি। কিন্তু দিল্লী ছেড়ে যাবার কোন প্রতিজ্ঞাই করতে পারি না।

আমার কথার আর কোন জবাব না দিয়ে রেখা সরখেল ধীরে ধীরে চলে গেলো। খানিক বাদে আমিও রেস্তোরাঁর বিল চুকিয়ে বাইরে চলে এলুম।

* * *

পরের দিন শুধু ভাবলুম কী করে এই কাজ নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন করা যায়। নিজের মনে মনে কল্পনা করলুম, সন্ধ্যা ঠিক সাতটা পনেরোতে যাবো। শফদরজং রোডে মতি সরখেলের বাড়ী। সামনে বেশ খানিকটা লন। লনের পাশ দিয়ে সুরকি বাঁধানো রাস্তা বাড়ীর ভেতরে চলে গেছে। অতি নিঃশব্দে এই পথটা দিয়ে আমি বাড়ীর ভেতরে ঢুকবো। বাড়ীটা খালি থাকবে। গিয়ে দেখবো সরখেল মশাই সান্ধ্য ভ্রমণে বেরিয়েছেন আর তার স্ত্রী রান্নাঘরের কাজে ব্যস্ত। গাড়ীবারান্দায় একটা গাড়ী দাঁড়িয়ে থাকবে। আমি সেই গাড়ীটার পেছনে গিয়ে দাঁড়াবো। আমাকে কেউ দেখতে পাবে না অথচ আমি সব কিছুই দেখবো। দেখবো বৈঠকখানায়ও কেউ নেই। এবং তার পাশেই শোবার ঘর এবং স্টাডি।

স্টাডিতে ঢুকবার দুটো পথ। বৈঠকখানার ভেতর দিয়ে বা পেছনের জানলা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে পারি। কিন্তু. জানলা দিয়ে ঢুকবো কী করে? জানলাগুলো সব ভেতর থেকে বন্ধ করা। অতএব বৈঠকখানার ভেতর দিয়েই আমাকে ঢুকতে হবে।

এমনি ধরনের বহু চিন্তা-ভাবনা যখন শেষ করলুম তখন প্রায় সন্ধ্যে সাতটা বাজে। আর অহেতুক বিলম্ব না করে আমি একটা ট্যাক্সী চেপে শফদরজং রোডের কাছে এলুম। তখনও সাতটা পনেরো হয় নি। গলির মুখে দাঁড়িয়ে রইলুম। এই রাস্তা দিয়েই মতি সরখেল সান্ধ্য ভ্রমণে বের হবেন। উনি চলে যাবার পরেই আমি ওঁর বাড়ীতে ঢুকবো।

রাস্তা অন্ধকার, নির্জন। এই অঞ্চলে লোকজনের চলাফেরাও নেই বেশি। গাছের শুকনো পাতাটা ঝরে পড়লেও তার শব্দ শোনা যায়। একটু পরে হঠাৎ মনে হলো দূর থেকে যেন কার পদধ্বনি শুনতে পেলুম। সে পদধ্বনি ক্রমেই তীব্র হলো। টক্ টক্ টক্ জুতোর শব্দ ভেসে এলো।

বেশ ধীর পদক্ষেপে মতি সরখেল আমার সামনে দিয়ে চলে গেলেন।

মতি সরখেল চলে যেতেই আমি তার বাড়ীতে ঢুকলুম। ঘড়ির পানে তাকিয়ে দেখলুম সাতটা বেজে প্রায় কুড়ি মিনিট হয়েছে। অন্ধকারের অস্পষ্ট আলোয় আমি চোরের মত বাড়ীর ভেতরে ঢুকলুম।

একটা কেডস্ জুতো পরে এসেছিলুম পায়ে। যেন পায়ের আওয়াজ না হয়। হাতে পরেছিলুম রবার গ্লাভস। চোখে রঙীন চশমা। কেউ দেখলে যেন আমাকে চিনে রাখতে না পারে। আমার সঙ্গে ছিলো একটা ছোট মিনল্টা স্পাই ক্যামেরা আর পকেটে একটা তিনশো পাওয়ারের বাল্ব।

আমি বাড়ীর ভেতরে ঢুকলুম। বাড়ী নির্জন। বৈঠকখানা খালি অথচ বাতি জ্বলছে। রান্নাঘরের বাতিও জ্বালানো। বুঝতে পারলুম, রেখা সরখেল রান্নাঘরে ব্যস্ত।

হঠাৎ আমার মনে হলো একটা অস্পষ্ট ছায়া এসে সামনের বারান্দায় দাঁড়ালো। বুঝতে পারলুম সে রেখা সরখেল। আমার কাছ থেকে প্রমিসারী নোটগুলো ফেরত নিতে এসেছে।

কোন কথা না বলে আমি পকেট থেকে প্রমিসারী নোটের তাড়াটা বের করে রেখার হাতে তুলে দিলুম। রেখাও কোন কথা বললো না। সমস্ত আদান-প্রদানটা নিঃশব্দেই সম্পন্ন হলো। কাগজগুলো হাতে তুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে আমি সমস্ত বন্ধন থেকে রেখা সরখেলকে মুক্তি দিলুম।

এবার এখুনি আমার কাজ হাসিল করতে হবে। আমি অতি নিঃশব্দে বৈঠকখানার ভেতর দিয়ে ঢুকলুম। রেখা বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো বারান্দায়।

কিন্তু এখন বাড়ীতে রেখা সরখেল ছাড়া আর আছে একটি মাত্র চাকর। সেও রান্নাঘরের কাজে ব্যস্ত। তবু যদি কোনক্রমে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করি তাহলে বিপদের ভয়।

রেখা সরখেল আমাকে আগেই সতর্ক করে দিয়েছে যে ধরা পড়লে সমস্ত বিপদের ঝুঁকি আমাকে নিজেই নিতে হবে। সে কোনও সাহায্য করতে পারবে না।

চিন্তা-ভাবনা করে সময় নষ্ট করার পাত্র আমি নই। আমার হাতে মাত্র আধ ঘণ্টা সময় আছে। এই সময়টুকুর মধ্যেই আমাকে কাজ শেষ করতে হবে।

প্রথমে করিডরের ভেতরে এলুম। করিডরে বাতি জ্বলছিলো। আমি বাতিটা নিভিয়ে দিলুম। সমস্ত করিডরে অন্ধকার নেমে এলো।

করিডরের শেষ প্রান্তে হলো স্টাডি। আমি সেই ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালুম। পকেট থেকে মাস্টার কী বের করলুম।

অন্ধকারে দরজার তালায় চাবি ঢোকাতে কষ্ট হলো। বাতি জ্বালানো সম্ভব নয়। আমি একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললুম।

দেশলাইয়ের কাঠির আলোয় দরজায় চাবি ঢোকালুম।

সামান্য একটু মোচড় দিতেই দরজাটা খুলে গেলো। আমি ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলুম। তারপর ঘরের বাতি জ্বালালুম।

এবার আয়রনসেফ খোলার পালা।

বেশ খানিকক্ষণ সেফের হাতলটা ধরে নাড়াচাড়া করলুম। খানিক বাদে সিন্দুকটা খুলে গেলো। সিন্দুকের ভেতরে ছিলো একটা কালো বাক্স। আমি জানতুম এই বাক্সটার ভেতরেই আছে আমার প্রয়োজনীয় সংবাদের কাগজগুলো।

কালো বাক্সটা বের করে মাস্টার কী দিয়ে খুলে ফেললুম। ডালা উঁচু করতে প্রথমেই চোখে পড়লো একটা টপ-সিক্রেট ফাইল। ফাইলের ওপরে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা 'টপ-সিক্রেট'। এই পাঁচটা অক্ষর পড়তেই আমার শরীরে একটা শিহরণ জাগলো।

লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা ছিলো ফাইলটা। আমি ফিতে খুললুম। ফাইলের ভেতরে প্রথম পাতায় লেখা ছিলো 'আর্মস পার্চেজ ফ্রম আমেরিকা। ফর প্রাইম মিনিষ্টারস্ আইজ অনলি।'

আমি আর এক মুহূর্তও ইতস্তত করলুম না। তখনই কাজ শুরু করলুম। পাশেই টেবিলের ওপরে ছিলো একটা টেবিল ল্যাম্প। সেই টেবিল ল্যাম্পের বাল্‌বটা পাল্টালুম। পকেটের তিনশো পাওয়ারের বাল্‌বটা বের করে টেবিল ল্যাম্পটায় পরালুম।

ফাইল খুললুম। দ্বিতীয় পাতায় ছিলো সামরিক হাতিয়ারের লিস্ট। আমার সঙ্গে ছিলো মিনল্টা স্পাই ক্যামেরা। একটা সিগারেট লাইটারের মতোই ছোট। দ্রুত হাতে ক্যামেরায় শাটার টিপলুম। ফাইলটা খুব বড়ো ছিলো না। হয়তো পনেরো কি কুড়ি পাতার ফাইল। ফিল্ম ফুরিয়ে গেলো। তাড়াতাড়ি আবার ফিল্ম পাল্টে নিলুম। তারপর আর একটি ফাইল খুললুম। সেই ফাইলটা ছিলো 'মিগ ফ্যাক্টরী' সংক্রান্ত। তৃতীয় ফাইল হলো 'ফ্রন্টিয়ার রোডস'। সবসুদ্ধ পাঁচটি ফিল্ম শেষ করলুম।

আমি এতোক্ষণ একমনে কাজ করে যাচ্ছিলুম। অন্য কোন দিকে নজর দেবার ফুরসুৎ পাইনি। এবার ঘড়ির পানে তাকালুম। পৌনে আটা বাজতে মাত্র পাঁচ মিনিট বাকী।

হঠাৎ মনে হল দূর থেকে যেন কার পায়ের শব্দ ভেসে আসছে। ক্রমেই সে শব্দ নিকটতর হলো। আমি একটু সচকিত হলুম। কাজ বন্ধ করলুম।

হঠাৎ করিডরের বাতি জলে উঠলো। উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হলো করিডর।

মুহূর্তের জন্যে আমি আতঙ্কিত হলুম। এবার আর নিষ্কৃতি নেই। নিশ্চয় মতি সরখেল সান্ধ্য ভ্রমণ শেষ করে ফিরে এসেছেন!

আমার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিলো। উত্তেজনা বাড়লো। এই মুহূর্তেই মতি সরখেল হয়তো এই ঘরে ঢুকবেন। কিন্তু তারপর?

হঠাৎ দূর থেকে রেখা সরখেলের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

: কী করছো গো, এদিকে এসো একবার।

মতি সরখেল হয়তো স্টাডি রুমে ঢুকতে যাচ্ছিলেন কিন্তু স্ত্রীর ডাক শুনে আবার ফিরে গেলেন। আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। তবুও খানিকটা সময় হাতে পাওয়া গেছে। এখুনি পালাবার চেষ্টা করতে হবে।

তাড়াতাড়ি ফাইলগুলোকে ডেসপ্যাচ বাক্সে ভরলুম। তারপর বাক্সটাকে সিন্দুকে ভরলুম। এবার সিন্দুক বন্ধ করলুম।

করিডরের ভেতর থেকে আবার পদধ্বনি ভেসে এলো। মতি সরখেল ফিরে আসছেন। আমি টেবিল ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিলুম। ঘর অন্ধকার হয়ে গেলো। পদধ্বনি ঘরের সামনে এসে থামলো। বুঝতে পারলুম, মতি সরখেল এবার ঘরের ভেতর ঢুকবেন।

কোথায় লুকোবো? হঠাৎ ভাবলুম সেক্রেটারিয়েট নীচে খানিকটা জায়গা আছে বসবার মতো। এক মুহূর্তও নষ্ট করলুম না। টেবিলের নীচে আশ্রয় নিলুম।

দরজা খোলার শব্দ হলো। মতি সরখেল ঘরে ঢুকছেন। ভাবলুম, ঘরে ঢুকে যদি উনি দেখতে পান যে ঘরটা বিশৃঙ্খল হয়ে আছে তাহলে নিশ্চয় ওর মনে সন্দেহ জাগবে।

ঘরের বাতি জলে উঠলো। টেবিলের ওপরেই কী যেন খুঁজছেন মতি সরখেল। একবার যদি নীচে তাকান তাহলেই দেখতে পাবেন যে নীচে একটি চোর ঘাপটি মেরে বসে আছে। তখন কী হবে?

কিন্তু আমার সৌভাগ্য বলতে পারেন, সেই রাত্রে মতি সরখেল টেবিলের নীচে তাকালেন না। টেবিলের ওপরটাই তন্নতন্ন করে কী যেন খুঁজলেন। কিন্তু যা খুঁজছিলেন তা পেলেন না।

ঘর ছেড়ে আবার বেরিয়ে গেলেন মতি সরখেল। আর সময় নেই! এবার যেমন করেই হোক আমাকে বেরিয়ে যেতে হবে।

হঠাৎ ঘরের জানালার পানে নজর গেলো। জানালা দিয়ে পালানোই হবে

বুদ্ধিমানের কাজ।

আমি দৌড়ে জানালার কাছে গেলুম। বেশ শক্ত করেই জানলাটা আঁটা ছিল। সহজে খুলতে পারলুম না। এখন প্রতিটি সেকেণ্ডের ওপরে আমার জীবন নির্ভর করছে।

গায়ের জোরে টান দিতে জানালাটা খুলে গেলো এবার। আমি আর সময় নষ্ট করলুম না। এক লাফে জানালা টপকে লনে পৌছলুম। মনে হলো মতি সরখেলও সেই মুহূর্তেই ঘরে ঢুকলেন। উনি আমাকে দেখতে পাননি। কারণ, একটু বাদেই ঘরের বাতি জ্বলে উঠলো।

আমি আর পেছনের দিকে তাকালুম না। সোজা বড়ো রাস্তায় বেরিয়ে এলুম। উত্তেজনায় আতঙ্কে তখন আমার বুক কাঁপছিলো। আমি হাঁটতে লাগলুম।

হঠাৎ পেছন থেকে কে জানি আমার গলা চেপে ধরলো। আমি পালাবার চেষ্টা করলুম কিন্তু পারলুম না।

তাকিয়ে দেখলুম, তিনি সমাদ্দার।

*   *   *

সমাদ্দার আমার গলা ছেড়ে দিলেন। চাপা কণ্ঠে বললেন: ইডিয়ট, এমন বিপজ্জনক কাজ করতে আছে!

আজ এই শফদরজং রোডে সমাদ্দারকে দেখতে পাওয়া একেবারেই অপ্রত্যাশিত। বিস্মিত হতবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে বললুম: আপনি এখানে?

: হ্যাঁ, যে উদ্দেশ্যে তুমি এসেছিলে আমিও সেই সব কাগজের সন্ধানে এসেছিলুম। মাপ করো, তোমাকে না বলেই এসেছিলুম। কিন্তু কাগজ চুরি করা বা সিক্রেট ডকুমেন্টের ছবি তোলা কাজই আমার উদ্দেশ্য ছিলো না। ভেবেছিলুম, একবার বাড়ীর নকশাটা দেখে যাই আজ, তারপর অন্য একদিন এসে কাজ হাসিল করা যাবে। এসে দেখলুম যে আমার আগেই তুমি কাজ শুরু করে দিয়েছো। তাই তোমাকে আর বাধা দিলুম না।

সমাদ্দার একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন: বড্ডো ঝুঁকি নিয়েছিলে জি-বি-এম। এতোটা সাহস দেখানো উচিত হয়নি। আর একটা কথা মনে রেখো, আমাদের বিপদের ফাঁড়া এখনো কাটে নি।

আমি এবার একটু বিস্মিত হয়ে বললুম: আপনার কথা কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছি না। রেখা সরখেল প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সে মুখ খুলবে না।

: আমি রেখা সরখেলের কথা বলছিনে। তোমার বোকামির কথা বলছি।

দ্বিতীয় ভুল করলে লোদী রোড থেকে রেডিওয় খবর পাঠাতে গিয়ে। এক প্যাকেট মারলবরো সিগারেট ফেলে এলে সেই বাড়ীতে। এবারও আমি একটু আশ্চর্য হলুম। এই মারলবরোর প্যাকেট নিয়েও পুলিশ কোন তদন্ত করলো না। তারপর তৃতীয় বার ভুল করলে আজ।

জি-বি-এম, স্টাডি রুমের টেবিল ল্যাম্পে তিনশো পাওয়ারের বাল্বটা এখনও জ্বলছে। টেবিল ল্যাম্প জ্বালালেই মতি সরখেল বুঝতে পারবেন যে তার স্টাডি রুমে কেউ ঢুকেছিলো। কারণ, তিনি কোনদিনই তিনশো পাওয়ারের বাতি ব্যবহার করেন না। তারপর যখন দেখবেন লনের দিকের জানালাটাও খোলা আছে তখনই ওর মনের সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হবে।

আমি দিব্যচোখে দেখতে পাচ্ছি মতি সরখেল এই মুহূর্তে থানায় খবর দিচ্ছেন। এই দিল্লী শহরে তোমার আমার আর বেশিক্ষণ থাকা উচিত হবে না। যাক সব কাগজের ফটো কপি করতে পেরেছো তো?

: পাঁচটি ফিল্ম ফটো করেছি।

: চমৎকার! এবার আমাদের কাজ অনেকদূর এগিয়েছে। এই কাজের জন্যে তোমাকে তারিফ করতে হয় জি-বি-এম। তুমি চমৎকার কাজ করেছো। এবার কাজের শুভ সমাপ্তি হলেই হয়।

জি-বি-এম, এই ফিল্ম নিয়ে তুমি সোজা কলকাতায় চলে যাও। আজ রওনা হলে পরশু ভোরে কলকাতায় পৌঁছবে। এখন আটটা বাজে। সাড়ে দশটায় স্টেশনের ন'নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে কলকাতার গাড়ী ছাড়বে। সেই ট্রেনে করেই চলে যাও। আজ রাতের প্লেনে আমিও কলকাতায় যাচ্ছি। আমার সঙ্গে মিসেস সেনও যাবেন।

গলার স্বর একটু নীচু করে সমাদ্দার আবার বললেন: মিসেস সেনকে আমি একদম বিশ্বাস করতে পারছিনে। তাই ওকে একা দিল্লীতে রেখে যাওয়া সমীচীন মনে করিনে। আমি তোমায় হলপ করে বলতে পারি মিসেস সেনের সঙ্গে ভারত সরকারের কোন যোগাযোগ আছে।

থাক, বৃথা কথা বলে আর সময় নষ্ট করতে চাইনে। কলকাতায় গিয়ে আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে। তুমি ট্রেন থেকে নেমে সোজা হুইলারের স্টলে যাবে। সেখানে একটি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েকে দেখতে পাবে, নাম ডরোথী: মেয়েটির হাতে থাকবে একখানা 'ফেমিনা' ম্যাগাজিন। মেয়েটি তোমাকে নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যাবে। আর সময় নষ্ট করো না জি-বি এম।

বন্ধুরা আমাদের জন্য কলকাতায় প্রতীক্ষা করছে। ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে সেখানেই আলোচনা হবে। হয়তো এই কাজের পর বেশ কিছুদিন আমাদের

গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে। এবার তুমি বেরুটে ফিরে যেতে পারবে।

তোমার বেরুটে ফিরে যাবার টিকিটও ঐ এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েটির কাছে পাবে। জি-বি-এম, তোমার পাশপোর্টে কী নাম আছে? আরও একটা চিন্তার কারণ হলো যে তোমার এই পাশপোর্টের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এই পাশপোর্ট নিয়ে দমদম থেকে বেরুট যেতে গেলে নিশ্চয় ধরা পড়বে।

আমি হাসলুম। বললুম: সেজন্য আপনি চিন্তা করবেন না সমাদ্দার সাহেব। আমার সঙ্গে একটি ব্রিটিশ পাশপোর্টও আছে। সেই পাশপোর্টে আমার নাম হলো গগনবিহারী বাজপেয়ী। আপনি ঐ নামে একটি কাটবেন। ঐ পাশপোর্টে আমি দিল্লী বিমান বন্দরের সীলমোহর দিয়ে রাখবো। অতএব আমি কোন প্রকারেই পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো না। ভারতবর্ষ থেকে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে কী করে পালাতে হবে তা জি-বি-এম জানে।

: চমৎকার! তোমার ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস আছে। আজ তুমি যে গোপনীয় খবর সংগ্রহ করেছো সে খবর তোমার সাহায্য ছাড়া সংগ্রহ করা যেতো কিনা সন্দেহ। যাক, আবার কলকাতায় গিয়ে দেখা হবে।

এই বলে সমাদ্দার অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন। আমিও হোটেলে ফিরে এলুম।

এবার কলকাতায় পাড়ি দেবার আয়োজন করতে হবে।

*　　　*　　　*

রাত সাড়ে দশটায় দিল্লীর স্টেশন থেকে আমাদের গাড়ী ছাড়লো। স্টেশন প্ল্যাটফর্মে প্রতিটি পুলিশকে দেখেই আমার মনে আতঙ্কের সঞ্চার হচ্ছিলো। ভাবছিলুম, ওরা হয়তো আমার সন্ধানেই এসেছে। ওদের কেউই আমার পানে তাকালো না। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললুম।

রাত কেটে গেলো। পরের দিন দুপুর দুটোয় সময় ট্রেন এলাহাবাদে পৌঁছলো। লাঞ্চের অর্ডার দিলুম। এক পেট খেয়ে বেশ একটু আরাম করছি এমন সময় একটি পানওয়ালা এসে আমার কামরায় ঢুকলো। সহযাত্রী এক ভদ্রলোক পানওয়ালাকে কামরার ভেতরে ঢুকতে দেখে রুষ্ট হলেন। হয়তো ভর্ৎসনার সুরে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু আমার পানে তাকিয়ে চুপ করে গেলেন।

পানওয়ালা আমাকে জিজ্ঞেস করলো: সিগ্রেট, সিগ্রেট নেবেন স্যার?

: দিশি সিগ্রেট খাইনে, আমি বললুম।

: আমার কাছে বিলিতি সিগ্রেট আছে স্যার, মারলবরো সিগ্রেট।

আমি এবার গলার স্বর নীচু করে বললুম: কী খবর?

: সমস্ত খবর এই প্যাকেটের ভেতরে লেখা আছে স্যার।

আমি ভেণ্ডারকে সিগারেটের দাম দিয়ে এক প্যাকেট সিগারেট নিলুম। ইতিমধ্যে গাড়ী চলতে শুরু করেছিলো। সিগারেটের প্যাকেটটা আমার হাতে দিয়েই ভেণ্ডার তাড়াতাড়ি চলন্ত গাড়ী থেকে নেমে গেলো। আমিও সিগারেটের প্যাকেট হাতে নিয়ে বাথরুমে ঢুকলুম।

সিগারেটের প্যাকেটটার ভেতর এক টুকরো কাগজ ছিলো। সেই কাগজের ওপরে লেখা ছিলো একটি সংবাদ—'পুলিশ তোমার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে। কাল ভোরে ট্রেন হাওড়া স্টেশনে পৌছলেই পুলিশ তোমাকে গ্রেপ্তার করবে। এই ট্রেনটা রাত বারোটার পরে গয়া স্টেশনে পৌছবে। সাড়ে বারোটায় ডাউন বোম্বাই মেলও এসে পৌছবে গয়ায়। তুমি সবার অজ্ঞাতসারে দিল্লীর গাড়ী থেকে নেমে বোম্বাই মেলের নির্দিষ্ট কামরায় আশ্রয় নিও। ঠিক ইঞ্জিনের পরেই যে থার্ড ক্লাস কম্পার্টমেণ্ট আছে সেই কামরায় ঢুকবে। হাওড়াতে পুলিশ এসে দিল্লীর গাড়ীটা সার্চ করবে। অতএব পুলিশের চোখে ধুলো দিতে তোমার কোন বেগ পেতে হবে না।

যদি ইতিমধ্যে আমাদের প্ল্যানের কোন পরিবর্তন হয় তাহলে বর্ধমান স্টেশনে আবার তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবো। বর্ধমানে পৌছেও যদি আমাদের কাছ থেকে আর কোন খবর না পাও তাহলে বুঝবে যে রাস্তা অল ক্লিয়ার।

আমি কাগজটি পড়ে বাথরুমের প্যানে ফেলে দিলুম। তারপর শেকল টানলুম। নিমেষে জলের তোড়ে কাগজটা নীচে পড়ে গেলো। তারপর একটু পরে আবার নিজের সিটে ফিরে গেলুম।

সিটে বসে লক্ষ্য করলুম, আমার পূর্বের সহযাত্রীটি বেশ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন।

*   *   *

রাত বারোটার কিছু পরে ট্রেন গয়াতে পৌছেই দেখতে পেলুম অন্য প্ল্যাটফর্মে তখনও ডাউন বোম্বাই মেল দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ীটাকে সেইখানেই দেখতে পেয়ে মনের চিন্তা-ভাবনা দূর হলো।

প্ল্যাটফর্ম লোকে লোকারণ্য। আমি কম্পার্টমেণ্ট থেকে নামলুম। আমার সহযাত্রীটি তখনও নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। তার অজ্ঞাতে নিঃশব্দে কামরা থেকে নেমে এলুম। আমার একহাতে ছিলো একটা এটাচী কেস। স্যুটকেস ও বেডিংটার মায়া ত্যাগ করলুম।

বোম্বাই মেলের ইঞ্জিন স্টেশন প্ল্যাটফর্মের একপ্রান্তে দাঁড়িয়েছিলো। তার

পাশের কম্পার্টমেন্টটায় আমাকে বসতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতোটা পথ এই ভিড় ঠেলে যাওয়া সহজ নয়। ইতিমধ্যে বোম্বাই মেল প্ল্যাটফর্ম ছাড়বার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। ট্রেনের ইঞ্জিন সিটি দিলো। মুহূর্ত বাদেই হুম করে ট্রেন ছাড়বে। আমি ছুটে ইঞ্জিনের পাশের কম্পার্টমেন্টে উঠে পড়লুম।

* * *

খুব ভোরে ট্রেন বর্ধমানে পৌঁছলো।

আমি দু' তিনটে সিগারেট ভেণ্ডারের কাছে মারলবরো সিগারেটের খোঁজ করলুম। কিন্তু সবাই বললো : স্যার আমরা বিলিতি সিগ্রেট রাখিনে।

বুঝতে পারলুম যে আমার জন্যে এখানে আর কোন টাট্‌কা খবর নেই। অর্থাৎ পথ পরিষ্কার। সামনে কোন বিপদ নেই।

বর্ধমান থেকে ট্রেন এক ছুটে হাওড়ায় এসে পৌঁছলো।

স্টেশন প্ল্যাটফর্মে ট্রেন ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে আমি একবার কম্পার্টমেন্টের বাইরে তাকালুম। কিন্তু সমস্ত প্ল্যাটফর্মে আমি একটিও পুলিশকে দেখতে পেলুম না। এবারে একটু নিশ্চিন্ত মনে ট্রেন থেকে নামলুম।

প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে সোজা চলে গেলুম হুইলারের বুক স্টলে। কিন্তু সেখানে কোন মেয়েকে দেখতে পেলুম না।

কোথাও সেই এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েটিকে না দেখে ভাবলুম, হয়তো প্ল্যান পাল্টানো হয়েছে। অথচ কেউ আমাকে সে কথা জানবার সুযোগ পায়নি। হঠাৎ সেদিনকার দৈনিক কাগজটার প্রথম পাতাটার ওপরে আমার নজর পড়লো। ভারতীয় পার্লামেণ্টের খবর। ভারতবর্ষে বিদেশী স্পাইদের আনা-গোনা নিয়ে সেখানে তুমুল আলোচনা হয়েছে। আমি যখন খবরটি পড়ছি তখন একটি মেয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়ালো। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে। নিশ্চয় এই হলো ডরোথী। ওর হাতে ছিলো একখানা ফেমিনা কাগজ। আমি ডরোথীকে কোন প্রশ্ন করলুম না। পকেট থেকে মারলবরো সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট ধরালুম। ডরোথী একবার আমার পানে তাকালো কিন্তু কোন কথা বললো না। একটু বাদে সে রাস্তার দিকে হাঁটতে লাগলো। আমিও ওর পেছু নিলুম।

একবার পেছনে তাকিয়ে দেখলুম কেউ আমাদের 'ফলো' করছে কিনা? কেউ নেই দেখে একটু খুশি হলুম।

স্টেশনের বাইরে প্রাইভেট গাড়ীর স্ট্যাণ্ডে ডরোথীর একটি ছোট ফিয়াট গাড়ী দাঁড়িয়েছিলো। ডরোথী গিয়ে ঐ গাড়ীতে বসলো। আমি ওর পাশে উঠে বসলুম।

গাড়ীর ভেতরে বসে আমাদের আলাপচারী শুরু হলো।

: সরি, ট্রেন আজ বিফোর টাইমে এসে পৌঁছেছে। তাই আসতে দেরি হলো।

আমি একটু হেসে জবাব দিলুম: ভাবনার কিছু নেই। আমার হাতে প্রচুর সময় ছিলো।

: কিন্তু এতো লোকের সামনে বেশি সময় দাঁড়িয়ে থাকা বিপজ্জনক। কারণ, পুলিশ তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

: আমাকে? বিস্মিত ও উৎকণ্ঠিত হয়ে আমি প্রশ্ন করলুম।

: হ্যাঁ, আজ সকালের কাগজে বেরিয়েছে যে কিছুদিন হলো রাজধানীতে স্পাই-এর তৎপরতা বেড়েছে। পুলিশ কিছু লোককে সন্দেহ করেছে এবং তাদের গ্রেপ্তার করার চেষ্টায় আছে।

আমি আলোচনার মোড় ঘোরালুম। জিজ্ঞেস করলুম,

: সমাদ্দার কোথায়?

: কাল কলকাতায় এসেছেন। কোথায় আছেন জানিনে। শুধু তোমার সঙ্গে স্টেশনে এসে মোলাকাৎ করার নির্দেশ দিয়েছেন আমাকে।

: আর কিছু বলেন নি?

: হ্যাঁ বলেছেন। বলেছেন আজ বিকেলে শ্রীরামপুরে তুলসী গোস্বামী লেনের একটা বাড়ীতে তোমার সঙ্গে দেখা করবেন।

: শ্রীরামপুরে? বিস্মিত কণ্ঠে আমি প্রশ্ন করলুম।

: হ্যাঁ, শ্রীরামপুর কলকাতার শহরতলী। হাওড়া ছেড়ে কয়েকটা স্টেশন গেলেই শ্রীরামপুর। কলকাতায় তোমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করার অনেক বিপদ আছে। কারণ, তোমার ওপরে পুলিশ তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে। আর শ্রীরামপুরে মাল সংগ্রহ করার বিপদ অনেক কম। কারণ, শ্রীরামপুরের অপর প্রান্তে অর্থাৎ নদীর ওপারে হলো ব্যারাকপুর। এই মাল নিয়ে উনি নৌকো করে ব্যারাকপুরে যাবেন। ব্যারাকপুর থেকে রানাঘাট হয়ে পাকিস্থান থেকে প্লেনে যাবেন হংকং। এবার এই মাল উনি নিজের হাতেই পাচার করতে চান। অন্য কারও হাতে দায়িত্ব দিতে চান না।

আমি চুপ করে শুনে গেলুম। কোন কথা বললুম না। ভাবলুম, প্ল্যান মন্দ ফাঁদেন নি সমাদ্দার সাহেব। মাল নিয়ে একবার পাকিস্তানে যেতে পারলে আর তার নাগাল পায় কে? সমাদ্দার খুবই হুঁশিয়ার। ভারত সরকারের চোখে ধুলো দেবার যে খুব ভালো ব্যবস্থাই করেছেন তা স্বীকার করতেই হবে।

সমাদ্দার চলে গেলে মিসেস সেনের কী হবে? উনি বলেন, মিসেস সেন

হলেন স্পাই। মিসেস সেন একবার সমাদ্দারের হাত ছাড়াতে পারলে নিশ্চয় পুলিশের কাছে গিয়ে সমস্ত কথা খুলে বলবেন। কিন্তু সমাদ্দার তো তখন পুলিশের নাগালের বাইরে চলে যাবেন। তখন এই বান্দার কী হবে?

নিজের কথা ভেবে একটু চিন্তিত হলুম। ডরোথীকে বললুম: আজ শেষ রাতে আমার বেরুটে ফিরে যাবার কথা আছে।

: জানি। গগনবিহারী বাজপেয়ীর নামে বি-ও-এ-সি প্লেনে একটি টিকেট কাটা হয়েছে। তোমার পাশপোর্ট আর হেল্‌থ সার্টিফিকেট তৈরি আছে তো?

: হ্যাঁ, শুধু পাশপোর্টে দিল্লীর পালাম বিমান বন্দরের একটা জাল সীল-মোহর বসাতে হবে।

: ব্যস, তাহলে আর চিন্তা করো না। আমরা দলের কর্তাদের কাছ থেকে নির্দেশ পেয়েছি যে এখন কিছুদিনের জন্য আমাদের গা ঢাকা দিতে হবে। অর্থাৎ এখন কিছুদিনের জন্য কাজকর্ম বন্ধ থাকবে।

: কতোদিন? আমি প্রশ্ন করলুম।

: যতো দিন না পুলিশের নজর ঢিলে হয়, ল্যাঠা হাঙ্গামা চুকে যায়।

: কতোদিন থেকে দলের সঙ্গে কাজ করছো? আমি ডরোথীকে জিজ্ঞেস করলুম।

ডরোথী একটু বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো। আমি তার বিস্ময়ের সঠিক কারণ বুঝে উঠতে পারলুম না।

: প্রায় তিন বছর। ডরোথী বললো,—আমি হলুম এয়ার হোস্টেস, কলকাতায় বাড়ী। কিন্তু কাজের খাতিরে প্রায়ই আমাকে হংকং লণ্ডনে যাতায়াত করতে হয়। আমার কাজ হলো গুপ্ত খবর এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া।

আমি হেসে বললুম: আমার নাম গোবিন্দবিহারী মালকানি। ইণ্টার-ন্যাশনাল গোল্ড স্মাগলার। আমি লাসভেগাস থেকে টোকিও অবধি সোনা আমদানী রপ্তানী করি। তুমি হলে স্পাই আর আমি স্মাগলার। একই পথের পথিক।

: কবে থেকে তুমি এদের সঙ্গে কাজ করছো? ডরোথী আমাকে জিজ্ঞেস করলো।

: আমি হলুম গেস্ট স্টার। অর্থাৎ আমি স্বাধীনভাবে কাজ করি। এই কঠিন কাজে সাহায্যের জন্য এরা আমাকে ভাড়া করেছেন।

ডরোথী আমার কথা শুনে হাসলো। বেশ লাগলো ডরোথীর সেই হাসিটা। আমি ডরোথীর পানে তাকালুম। দেখতে মন্দ নয় ডরোথী।

ডরোথী বললো : সবাই আমাকে ডরোথী রিঙ্ক বলে ডাকে। আমার বাবা মা সবাই থাকেন অষ্ট্রেলিয়াতে। দেশ স্বাধীন হবার পর ওরা সবাই সংসারের পাত্‌তাড়ি গুটিয়ে অষ্ট্রেলিয়া চলে গেছেন। আমি একটা ছোট ফ্ল্যাট নিয়ে পার্ক ষ্ট্রীটে থাকি। এই তো আমার বাড়ী।

আমাদের গাড়ী এসে এক বিরাট বাড়ীর সামনে দাঁড়ালো।

বিরাট বাড়ী। অনেকগুলো ফ্ল্যাট। তারই তিনতলায় একটা ফ্ল্যাটে ডরোথী থাকে। লিফটে করে উঠতে হয়।

আমাকে নিয়ে ডরোথী তার ঘরে ঢুকলো। ঘরের চারিদিকে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতার চিহ্ন ছড়িয়ে আছে। বুঝতে পারলুম যে ডরোথীর যৌবনে এখন উদ্দামতার পূর্ণ জোয়ার চলছে। দেয়ালের চারদিকে তারই বিভিন্ন ভঙ্গীমার ছবি টাঙ্গানো। সে ছবি, যে কোন পুরুষকে আকর্ষণ করে।

আমি জামা কাপড় পালটালুম। ডরোথী আমার হাতে ঘরের একটি চাবি দিয়ে বললো : আমি বেরুচ্ছি। তুমি নির্দিষ্ট সময়ে শ্রীরামপুরে তুলসী গোস্বামী লেনে যেও। সেখানে সমাদ্দার তোমার জন্যে প্রতীক্ষা করবেন। দলের অন্য সবাইও সেখানে উপস্থিত থাকবেন। সেখানে বসেই সব কথাবার্তা ও সমস্যার আলোচনা হবে।

: আমার টিকিট ?

ডরোথী এবার আমার হাতে বি-ও-এ-সির একখানা টিকিট দিলো। দেখলুম, গগনবিহারী বাজপেয়ীর নামে টিকিট কাটা হয়েছে। আমি টিকিটটা পকেটে ভরলুম। সঙ্গে নিলুম পাশপোর্ট ও হেল্‌থ সার্টিফিকেট। সাবধানের মার নেই। কখন কী ঘটে বলা যায় না। প্রয়োজন হলে সোজা দমদম এয়ার পোর্টে পাড়ি জমাবো।

সারাটা দিন শহরে ঘুরে সন্ধ্যা ছ'টায় আমি হাওড়া স্টেশনে পৌছলুম। শ্রীরামপুরের টিকিট কাটলুম।

বেলুড়-বালী-রিষড়া-উত্তরপাড়া করে ট্রেন এসে শ্রীরামপুরে পৌছলো।

শ্রীরামপুর আমার কাছে অপরিচিত। এই শহরের নাম আজ আমি প্রথম শুনলুম। এবার কী করে তুলসী গোস্বামী লেন খুঁজে বের করি সেইটেই হলো সমস্যা। তারপরেও আবার ৩/২ নম্বর বাড়ী খুঁজে বের করতে হবে। ঝামেলা কম নয়।

একটা সাইকেল রিকশা নিলুম। বললুম : তুলসী গোস্বামী লেন চলো।

রিকশওলা আমার পানে বেশ একটু অবাক হয়ে তাকালো।

: তুলসী গোস্বামী লেন, বাবু ?

আমি কোন জবাব দিলুম না। শুধুই মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে বললুম : হ্যাঁ।

বেশ খানিকটা পথ অতিক্রম করে এক ছোট গলির সামনে এসে রিকশা দাঁড়ালো। রিকশাওলা বললো : বাবু তুলসী গোস্বামী লেন।

: ৩/২ তুলসী গোস্বামী লেন, আমি হিন্দীতে বললুম।

: একটু দাঁড়ান, ঐ পানের দোকানে একবার জিজ্ঞেস করে নিই, ৩/২ তুলসী গোস্বামী লেন কোথায়?

পানওলার দোকানে এগিয়ে গেলো রিকশাওলা।

তাকে প্রশ্ন করতে সেও বিস্ময় প্রকাশ করে বললে : ও বাড়ীতে তো কেউ থাকে না। আজ অনেকদিন হলো ও বাড়ীর লোকেরা উঠে গেছে

পানওলার জবাব শুনে কিন্তু আমি একটুও ঘাবড়ালুম না বললুম : জানি, ঐ বাড়ী খালি পড়ে আছে। আমি বাড়ীটা ভাড়া নেবার জন্য এসেছি।

: আপনি ঐ বাড়ী ভাড়া নেবেন?

আমার কথায় পানওলার বিস্ময় যেন উপচে পড়ে। সে যেন আমার কথা বিশ্বাস করতে চায় না।

: আমার জন্যে নয়, আমি বলি.—আমার এক বন্ধুর জন্য।

: কিন্তু ওই বাড়ী তো ভাড়ার জন্যে নয়—পানওলা বললো।

: এতোদিন ছিলো না, কিন্তু এবার বাড়ীওলা ভাড়া দেবার সঙ্কল্প করেছেন।

আমার জবাব শুনে পানওলা আর কোন উচ্চবাচ্য করলো না। রিকশাওয়ালাকে বললো : এই গলির ডান দিকের শেষ বাড়ী। তারপর সে যেন বেশ একটা সন্দেহের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো।

রিকশায় চেপে সোজা গলির শেষ মাথায় চলে গেলুম ডান দিকের বাড়ীটা একতলা। সামনে ছোট উঠোন। আমাকে এই ধরনের একটা পড়ো বাড়ীতে ঢুকতে দেখে রিকশাওলাও আমার দিকে তাকালো। বুঝতে পারলুম এই অঞ্চলে আমার আগমন তাদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করেছে।

রিকশাওলাকে বিদায় দিলুম। কিন্তু পয়সা পেয়েও লোকটা গেলো না। খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। আমি ওর পানে আর না তাকিয়ে বাড়ীর ভেতরে ঢুকলুম।

হঠাৎ বাতাসে দরজাটা নড়ে উঠলো। তীব্র ও কর্কশ শব্দ হলো একটা। মনে হলো কোথাও যেন কোন রুগীর আর্তনাদ শুনলুম। অতি সন্তর্পণে আমি বাড়ীর ভেতরে ঢুকলুম। বাড়ী একদম খালি। কোথায় সমাদ্দার? আমি খানিকটা বারান্দার এদিক-ওদিক ঘুরলুম। আমার পায়ের শব্দের প্রতিধ্বনি বাজতে লাগলো। হঠাৎ একটা ঘরের ভেতর থেকে নারীকণ্ঠ শুনতে পেলুম।

জি-বি-এম,—! আমাকে ডাকলো কেউ ?

মিসেস সেনের কণ্ঠ। না, এই কণ্ঠস্বর আমি চিনতে ভুল করিনি।

কিন্তু এই ভুতুড়ে বাড়ীতে মিসেস সেন কেন? কী করে উনি এখানে এলেন? সমাদ্দার কোথায়?

: মিসেস সেন—আমি বেশ একটু জোর দিয়ে ডাকলুম।

আমার জবাব পেয়ে মিসেস সেন সেই ঘরটা থেকে বেরিয়ে এলেন।

সেই মিসেস সেন, যেমনি প্রথম দিন তাকে দেখেছিলুম, ঠিক তেমনি। আজও কোন পরিবর্তন হয়নি। প্রথম দিনের দর্শনে আমি যেমন মিসেস সেনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলুম আজও মিসেস সেনের রূপ, তার দেহ-লাবণ্য আমাকে তেমনই আকৃষ্ট করলো।

হঠাৎ আমার মনে পড়লো, সমাদ্দার বলেন, মিসেস সেনই হলেন ভারত সরকারের এজেন্ট।

মিথ্যে কথা বলেছেন সমাদ্দার। এমন যার সৌন্দর্য সে কী কখনো মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করতে পারে!

হয়তো ভুল বললুম। শুনেছি সুন্দরীরাই প্রতারণা করে বেশি।

মিসেস সেন আজ আমাকে নিরাশ করলেন। বললেন: মস্তো বড়ো ফাঁদে পা দিয়েছেন জি-বি-এম। আজ আর পুলিশের বেড়াজাল থেকে রেহাই নেই।

: পুলিশের বেড়াজাল! আপনি কী বলছেন মিসেস সেন? আমি উৎকণ্ঠিত ভীত হয়ে জিজ্ঞেস করলুম।

: আমার কথা বিশ্বাস না হয় একবার ছাদে আসুন। আপনি যখন বাড়ীতে ঢুকলেন তখনই আমি ছাদে দাঁড়িয়ে পুলিশের আনাগোনা দেখছিলুম।

আমি মিসেস সেনের সঙ্গে ছাদে গেলুম। দেখলুম, রাস্তার মোড়ে, পাশের বাড়ীতে চারদিকেই পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। পুলিশের এই বেড়াজাল ভেদ করে বেরুনো মানুষের কর্ম নয়।

: জি-বি-এম, সমাদ্দার আমাদের সঙ্গে শয়তানি করেছে। আজ আপনি আমাকে এই বাড়ীতে দেখে নিশ্চয় বিস্মিত হয়েছেন। আমি সরল মনে সমাদ্দারের নির্দেশেই এই বাড়ীতে এসেছিলুম। সমাদ্দার আমাকে বলেছিল: মিসেস সেন, আজ তুলসী গোস্বামী লেনের বাড়ীতে পার্টির বৈঠক বসবে। আপনি পাঁচটার সময় ঐ বাড়ীতে যাবেন। মালকানিও আসবে। আমি সতীলাকে সঙ্গে নিয়ে যাবো। কিন্তু এ পর্যন্ত তাদের কেউ এলো কী?

শুনুন জি-বি-এম, সমাদ্দার ভারত গভর্ণমেন্টের স্পাই। আমি প্রথম থেকেই

এ কথা জানতুম। মানিকলালও তার চিঠিতে এই কথা বলেছিলো। কিন্তু সেদিন আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করলেন কৈ? সতীনা স্পষ্ট বললো, —সমাদ্দার আমাদের পুরনো কর্মী। কখনই আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করতে পারে না। সমাদ্দার জানে পুরনো কর্মী বলে আজ কেউ আর তাকে সন্দেহ করবে না। তাই আজ সমাদ্দার ভারত সরকারের ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করছে।

জি-বি-এম আজ পুলিশ তার জাল গুটোচ্ছে। আজই আমাদের স্বাধীন জীবনের শেষ রাত।

কিন্তু আমার মনে প্রশ্ন জাগলো, কার কথা বিশ্বাস করবো? সমাদ্দার না মিসেস সেন? স্পাই কে?

আমার প্রথম কাজ হলো মিসেস সেনকে আশ্বাস দেয়া। বললুম: ভয় পাবেন না মিসেস সেন। গোবিন্দবিহারী মালকানি সঙ্গে থাকতে আপনার একটুও ভয় নেই।

: গোবিন্দবিহারী মালকানি তো এমন কিছু ম্যাজিক জানে না যে তুড়ি মেরে এই পুলিশের বেড়াজাল এড়িয়ে যাবে,—মিসেস সেন একটু বিদ্রূপের সুরে বললেন।

: মালকানি যে কতো বড়ো করিতকর্মা সে ধারণা আপনার নেই তাই বলছেন। আপনি একটুও ভয় পাবেন না মিসেস সেন। আমার ওপর বিশ্বাস রাখুন। দেখবেন, আজও আমরা এই বিপদের হাত থেকে রেহাই পাবো। আমি বললুম।

: কী করে? সন্দিগ্ধ মনে প্রশ্ন করলেন মিসেস সেন।

: ধৈর্য ধরুন। জি-বি-এমকে আরও একটু বিশ্বাস করতে শিখুন। তারপর দেখবেন আমরা সমাদ্দারের তৈরি ফাঁদ কেটে কেমন বেরিয়ে গেছি। আচ্ছা মিসেস সেন, আপনি দেয়াল টপকাতে পারেন?

: দেয়াল! কী বলছেন জি-বি-এম।

: হ্যাঁ, দেয়াল। এই বাড়ীর পাশেই রয়েছে একখানা একটা লম্বা দেয়াল। দেয়ালের ওপাশে রেলওয়ে লাইন। আর এই লাইন গিয়েছে কলকাতায়। মিসেস সেন, আমরা ট্রেনে করেই কলকাতায় ফিরে যাবো।

আমার কথায় মিসেস সেন একটু জোরে হাসলেন। হয়তো ভাবলেন যে আমি একেবারেই অবিশ্বাস্য একটা কথা বলেছি।

: বলুন মিসেস সেন, আপনি দেয়াল টপকাতে পারবেন কি না?

: কোনদিন চেষ্টা করিনি। তবে আজ জীবন বাঁচাবার জন্য নিশ্চয় দেয়াল

টপকাবো।

: তাহলে এবার আমার সঙ্গে আসুন।

রাতের অন্ধকার তখন বেশ গভীর হয়েছিলো। আমি মিসেস সেনকে নিয়ে ছাদের এক প্রান্তে গেলুম। ছাদ থেকে পা বাড়ালেই দেয়াল। আমরা দুজনেই দেয়ালে পা দিলুম।

: একটু সতর্ক হয়ে হাঁটুন। আমাদের বেশ খানিকটা পর্যন্ত এই দেয়ালের উপর দিয়ে হাঁটতে হবে। আমি বললুম।

বেশ সন্তর্পণে আমরা হাঁটতে লাগলুম। দেয়ালের উপর দিয়ে কোন মেয়েমানুষের পক্ষেই হাঁটা খুব সহজ কথা নয়। প্রতি পদক্ষেপেই মিসেস সেন টলছিলেন। আমি এগিয়ে গিয়ে ওর হাত ধরলুম। বেশ খানিকটা হাঁটবার পর মিসেস সেনকে আমি বললুম: দেখুন, এবার আমরা পুলিশের দৃষ্টির বাইরে চলে এসেছি। এখন আমাদের ট্রেনটা পাকড়াও করতে হবে।

: ট্রেন! জি-বি-এম, আপনি কী বলছেন? মিসেস সেনের প্রশ্নে শুধু উত্তেজনা নয়, কৌতূহলও ছিল।

হ্যাঁ, ঐ যে লাইন দেখতে পাচ্ছেন, আসুন আমরা ঐ লাইন ধরে খানিকটা পথ হাঁটি।

: কিন্তু ট্রেন ধরতে হলে তো আমাদের শ্রীরামপুর স্টেশনে যেতে হবে?

: না, আমরা ট্রেন থামাবো। কী করে ট্রেন থামাই তাই দেখুন।

মিসেস সেন কিন্তু আমার কথা একটুও বিশ্বাস করলেন না। হয়তো ভাবলেন আমি কোন রূপকথা বলছি। ট্রেন থামাবো আমি! নিশ্চয় জি-বি-এম পাগল হয়েছে।

আমরা দু'জনে লাইন ধরে হাঁটতে লাগলুম। অন্ধকার রাত। ধারে-কাছে পুলিশও নেই কোথাও। অতএব আমরা নিশ্চিন্ত মনে হাঁটতে লাগলুম।

খানিকটা হেঁটে আমরা হোম সিগনালের কাছে এলুম। আমি মিসেস সেনকে বললুম: দাঁড়ান, এখানে দাঁড়িয়েই ট্রেনের প্রতিক্ষা করতে হবে।

: ট্রেন কী করে থামাবেন জি-বি-এম?

: আমি ট্রেন থামাবার ফন্দীফিকির জানি মিসেস সেন, আমি বললুম।

এর পর প্রায় পনেরো মিনিট কেটে গেলো। হঠাৎ দেখতে পেলুম ডিসট্যান্ট সিগনাল ডাউন হয়েছে। একটু বাদে হোম সিগনালও ডাউন হলো। সিগনাল পোস্টের মাথায় সবুজ বাতি জ্বলে উঠলো।

আমি বুঝতে পারলুম এই ট্রেন শ্রীরামপুর স্টেশনে থামবে না। শ্রীরামপুরে ট্রেন থামলে হোম সিগনাল ডাউন হতো না। দুটো সিগনাল ডাউন মানেই

থ ট্রেন।

আমি লোহার সিঁড়ি বেয়ে সিগনাল পোস্টের ওপরে উঠলুম। আমার পরনে ছিলো একটি কোট। আমি কোটটা ছিঁড়লুম। তারপর কোটের ছেঁড়া একটি অংশ সবুজ বাতিটার মুখে চেপে ধরলুম। লাইট বন্ধ হলো। এখন আর কে বলবে যে সিগনাল ডাউন করা হয়েছে।

সিগনাল পোস্টটার ওপর থেকে নেমে আবার মিসেস সেনের পাশে এসে দাঁড়ালুম। তাকে বললুম: দেখুন গাড়ী এবার এই সিগনাল পোস্টের সামনে এসে থামবে। তারপর এই গাড়ীতে করেই আমরা আবার কলকাতায় ফিরেবো। ওদিকে সেই বাড়ীটার সামনে এখনো পেয়াদা পুলিশ বসে আছে। বসে বসে ভাবছে, বাড়ীটা থেকে কেউ বেরোলেই তাকে পাকড়াবে। কিন্তু এতোক্ষণে যে উড়ে পালিয়েছে তা কী আর ওরা জানে?

আমাদের বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হলো না। খানিক বাদেই ঝুম করে তুফান মেল এলো। হোম সিগনালের সামনে থেমে দাঁড়িয়ে রাগে গম গম করতে লাগলো। আমরা আর এক মুহূর্তও দেরি করলুম না। ট্রেনের একটা কামরায় উঠে পড়লুম।

এদিকে সিগনাল ডাউনের জন্য ইঞ্জিন থেকে অবিরাম সিটি দিচ্ছে। খানিক বাদে একজন পয়েন্টস্‌ম্যান সবুজ বাতি দেখাতে ট্রেনটা আবার চলতে শুরু করলো।

আমরা দু'জনে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লুম।

* * *

তারপর একটানা হাওড়া।

ট্রেনে আমাদের ভেতর বেশি কথাবার্তা হলো না। বিপদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে মিসেস সেন যেন পরম আনন্দবোধ করছিলেন। আরামে তার চোখ বুজে আসছিলো।

ট্রেনটা হাওড়া স্টেশনের কাছাকাছি আসতেই জিজ্ঞেস করলেন: এবার কী করবেন?

: ভাবছি কী করা যায়, কোন কিছু না ভেবেই আমি এই জবাব দিলুম। প্রশ্ন করলুম তার পরেই,—সমাদ্দার এখন কোথায় তা জানেন কি?

: নিশ্চয় এখন ওর মনিবদের কাছেই আছে। সমাদ্দারের খবর ঠিক জানিনে জি-বি-এম, তবে আজ রাত এগারোটায় দলের বৈঠক হবার কথা ছিলো দক্ষিণেশ্বরে।

এবার আমার বিস্মিত হবার পালা। বললুম সেকি, এই যে একটু আগে

বললেন শ্রীরামপুরে তুলসী গোস্বামী লেনের বাড়ীতে দলের বৈঠক হবার কথা ছিলো?

: ও তো সমাদ্দারের কথা। আমাদের ভাঁওতা দিয়ে শ্রীরামপুর পাঠিয়েছিলো। আমার ভুল আমি ওকে সরল মনে বিশ্বাস করেছিলুম। কিন্তু আমাদের দলের হেড কোয়ার্টার হলো দক্ষিণেশ্বরে। ঐখানেই দলের সবাইকে পাবেন। ঐখানে বসেই আমাদের সব শলা-পরামর্শ, রেডিও ট্রান্সমিশন, ফটোগ্রাফী ইত্যাদির সব কাজ হয়। আসুন না আমার সঙ্গে।

আমি কোনও আপত্তি করলুম না। ঠিক হলো আমরা দু'জনে এখন পার্টি হেড কোয়ার্টারে যাবো।

গাড়ী হাওড়া স্টেশনে থামলো।

রাত তখন প্রায় দশটা।

ট্যাক্সীর সন্ধানে আমরা দু'জনে স্টেশন থেকে বের হলুম।

স্টেশনের বাইরে বের হতেই আমার মনটা কেমন ছমছম করে উঠলো। বাতাসে কেমন একটা বিপদের আভাস পেলুম। মিসেস সেনকে সতর্ক করে দেবার জন্য বললুম: মিসেস সেন, আমাদের বিপদ বোধ হয় এখনো কাটে নি। ওদিকে একবার লক্ষ্য করে দেখুন, কেমন নিরীহ চেহারার একটা পুলিশের গাড়ী নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে। আমার মন বলছে, গাড়ীটা এখানে আমাদের জন্যই এসেছে। এবার শুনুন মিসেস সেন, দু'জনে একসঙ্গে দক্ষিণেশ্বর যাবার চেষ্টা করে কাজ নেই। আপনি একাই একটা ট্যাক্সী করে গ্রাণ্ড ট্যাঙ্ক রোড দিয়ে চলে যান। দু'জনে একসঙ্গে যেতে গিয়ে আমি পুলিশের হাতে ধরা পড়তে চাই না। আমি একটু পরে আসছি।

আমাকে ছেড়ে যেতে মিসেস সেন একটু ইতস্তত করলেন। খানিকক্ষণ কী যেন ভাবলেন। আমি আবার বললুম: যান, আর এক মুহূর্তও দেরি নয়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর ভাবতে হবে না।

: জি-বি-এম, ভাবছি ফিল্মগুলোর কথা। ফিল্মগুলো কোথায়?

: আমার বুক পকেটেই আছে। আপনি চিন্তা করবেন না। বৃথা সময় নষ্ট করবেন না। চলে যান। আমিও খানিক বাদে যাচ্ছি। দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে আপনার সঙ্গে দেখা করবো।

মিসেস সেন চলে গেলেন।

হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি গজালো। ভেবে দেখলুম, অন্যের অজ্ঞাতে দক্ষিণেশ্বরে যাবার সহজতম পন্থা হলো গঙ্গায় নেমে সাঁতার কেটে যাওয়া। কোন রকমে যদি একবার অন্যের অলক্ষ্যে গঙ্গার জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি

তাহলে আর আমায় পায় কে? গঙ্গায় নেমে আপনি স্রোতের জলে গা ভাসিয়ে দিন, আধ ঘণ্টার মধ্যেই দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে পৌছোবেন। মনে শুধু একটু সাহস থাকলেই হলো।

তাকিয়ে দেখলুম পুলিশের গাড়ীটা আরও খানিকটা এগিয়ে এসেছে। না, আর দেরি করা ঠিক নয়। আরও দেরি করলে স্টেশনের লোক আরও পাতলা হয়ে যাবে। একেবারেই নিরুপায় হয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়তে হবে।

চার পাঁচ জনের একটা জনতায় মিশে রাস্তায় পা দিলুম। তাদের সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সী স্ট্যাণ্ডটা পার হয়ে ব্রীজ এ্যাপ্রোচের উঁচু ফুটপাথে গিয়ে উঠলুম। গঙ্গার দিকের ফুটপাথ। ফুটপাথের পাশে বেশ উঁচু পাঁচিল। পাঁচিলের ওপর দিয়ে এক নজর গঙ্গার দিকে তাকালুম। পাঁচিলের অনেকটা নীচে মাটি। তা প্রায় তেরো চোদ্দ হাতের কম নয়। এতো উঁচু থেকে লাফিয়ে নামার চেষ্টা করা ভুল। পেছনে ফুটপাথটা আরও নীচু হয়ে গেছে। সেদিকে দিয়ে গেলে একটা সহজ পথ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সেদিকে যাবার উপায় নেই। পুলিশের গাড়ীটা দাঁড়িয়ে আছে ঠিক সেই পথের মুখেই। যেচে সিংহের মুখে কে আর পড়তে চায়!

এবার ব্রীজটার দিকে তাকালুম। ব্রীজের গোড়ায় উঁচু থামটার পাশে একটা সিঁড়ির দিকে নজর পড়লো। সিঁড়িটা সেখান থেকে নেমেছে নীচের মাটিতে। ওই সিঁড়ি দিয়ে একবার নামতে পারলে গঙ্গার তীরে জলের কাছে পৌছনো কঠিন হবে না। স্থানটাও বেশ নির্জন বলেই মনে হলো।

মনে আরও একটু সাহস সঞ্চয় করে নিলুম। আরও একটু দৃঢ় পায়ে আমার সঙ্গী লোকগুলোর সঙ্গে মিলেমিশে চলতে লাগলুম।

মুহূর্ত পরেই একটা বাঁশী বেজে উঠলো পেছন দিক থেকে। নিশ্চয় পুলিশের বাঁশী।

পায়ের গতি না থামিয়ে আমিও একবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকালুম। পুলিশের ভাবসাব দেখে সত্যিই একটু আতঙ্কিত হলুম আমি। চলার বেগ আরও বাড়িয়ে দিলুম।

একবার দৌড়ে যাবার ইচ্ছে হলো। কিন্তু ইচ্ছেটা মনের মধ্যেই চেপে রাখতে হলো। রাস্তায় চলতে চলতে হঠাৎ একটা লোককে দৌড়তে দেখলেই পুলিশের নজরে পড়ে যাবো। না, দৌড়নো চলবে না। বাকি পথটুকু আমাকে হেঁটেই যেতে হবে।

হাওড়া ব্রীজের বড়ো থামটার কাছে একটা মোড় ঘুরে ফুটপাথটা যেখানে এসে ব্রীজের সঙ্গে মিশেছে সেখানে এসে পৌছলুম। সামনে তাকাতেই দেখলুম

সাইরেন বাজাতে বাজাতে সামনের দিক থেকেও অন্য একটা পুলিশের গাড়ী এগিয়ে আসছে আমার পানে। পুলিশের গাড়ীটা কেন আসছে তা আমি জানতুম। সামনে পেছনে দু'দিকেই পুলিশ। ঠাণ্ডা মাথায় হাঁটা যায় না। আর পুলিশের হাতে ধরা পড়া মানেই দীর্ঘ কারাবাস, মৃত্যুদণ্ড।

ফুটপাথের মোড় পাড় হয়ে ব্রীজের ওপরে পা দিলুম। সামনের দিকের পুলিশের গাড়ীটা তখনও প্রায় একশ' হাত দূরে।

একটু বাদে পুলিশের গাড়ীটা আমার কাছাকাছি ব্রেক কষলো। সেই মুহূর্তে আমিও নেমে পড়লুম ব্রীজের উঁচু থামের পাশের সিঁড়িটা দিয়ে। পায়ের শব্দে বুঝতে পারলুম পুলিশের গাড়ী থেকে মাটিতে লাফিয়ে পড়ল কয়েকজন। আমি আর এক মুহূর্তও ফিরে তাকিয়ে তাদের দেখার চেষ্টা করলুম না। প্রাণপণ গতিতে ছুটে গঙ্গার জলের কাছে এসে দাঁড়ালুম।

সাঁতার কাটতে জানি। আর সময় নেই। মা গঙ্গার নাম নিয়ে জলে ঝাঁপ দিলুম।

জলের স্পর্শ পাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার সে চেতনা ফিরে এলো। জলের অনেক নীচে নেমে গেলুম।

খানিক বাদে আবার ভেসে উঠলুম জলের ওপরে। নদীর জলের তীব্র স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলুম।

হঠাৎ দেখতে পেলুম গঙ্গার চারদিক থেকে অনেকগুলো আলো জলে উঠলো। ঠিক আলো বললে ভুল হবে। মোটর বোট ও লঞ্চের সার্চ লাইট। জানি ওরা গোবিন্দবিহারী মালকানিকে খোঁজ করছে। আমি পকেটে হাত দিলুম। ফিল্মগুলো ঠিকই আছে। কিন্তু ভিজে যায়নি তো? হঠাৎ মনে পড়লো একটা ছোট বাক্সে ফিল্মগুলো ভরা ছিলো। আজ এই ফিল্মগুলোই আমার সব চাইতে মূল্যবান সম্পত্তি।

পুলিশের দল চারপাশ থেকে ঘিরে আসছে। যখনই জলের উপরে মাথা তুলি দেখতে পাই আলো-আলো-আলো।

এবার কী করি!

আমি দম বন্ধ করে জলের নীচে ডুব দিলুম। কিন্তু জলের নীচে আর কতোক্ষণ থাকা যায়। খানিক বাদে আবার মাথা তুললুম। হঠাৎ চারদিক থেকে চীৎকার শুনতে পেলুম, ঐ যে!

এর পরে আমি আর চিন্তা করার সময় পেলুম না। আমার মনে হলো কে যেন আমায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারলুম আমি একটা স্রোতের আবর্তে পড়েছি। নিজের গা ছেড়ে দিলুম। তীব্র বেগে ভেসে চললুম।

হয়তো মিনিট কুড়ি জলে ভেসে ছিলুম। হঠাৎ একটা শক্ত জিনিসের সঙ্গে ধাক্কা লাগলো। আমি মাথা তুলবার চেষ্ট করলুম। একটা শক্ত হাত আমার হাতটা চেপে ধরলো। বুঝতে পারলুম পুলিশের খপ্পরে পড়েছি।

হতাশায় তখন আমার গা এলিয়ে গিয়েছে। বুদ্ধির চৈতন্যও একটু একটু করে লোপ পেতে চলেছে। এই অবস্থায় যেন কারও একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর কানে ঢুকলো। আমাকেই সম্বোধন করে কে যেন বললো: জি-বি-এম, ভয় পেয়ো না। আমরা তোমাকে জল থেকে তুলে নিতে এসেছি।

এ সমাদ্দারের কণ্ঠস্বর। না, কোন ভুল করিনি। সমাদ্দারই আমাকে ডেকে বলছেন কথাটা।

* * *

একটা ছোট মাছ ধরার নৌকোয় সমাদ্দার বসেছিলেন। অন্ধকারে আমি তার মুখটা স্পষ্ট দেখতে পেলুম না।

সমাদ্দারকে পেয়ে আমি যেন প্রাণ ফিরে পেলুম। বুঝতে পারলুম, এই যাত্রায় রক্ষা পেলুম। সমাদ্দারই আমাকে হাত ধরে টেনে নৌকায় তুললেন।

: সরি জি-বি-এম। আজ পুলিশের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য তোমাকে অনেক কসরৎ করতে হয়েছে।

স্রোতের সঙ্গে সংগ্রাম করে আমি তখন একেবারেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম। সমাদ্দারের কথার জবাব দেবার মতো সামান্য শক্তিটুকুও অবশিষ্ট ছিলো না।

হঠাৎ আমার মনে পড়লো সমাদ্দার স্পাই। মিথ্যে কথা বলেন নি মিসেস সেন। সরকারের গুপ্তচর না হলে কী করে সমাদ্দার জানলেন যে আমি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছি? কী করে তিনি মাছ ধরার ডিঙ্গি নিয়ে মাঝ গঙ্গায় এলেন?

: জি-বি-এম, আমার জন্যেই তোমাকে এতো কষ্ট করতে হয়েছে। এর জন্য আমি ভারী দুঃখিত। চলো, দলের কর্তারা এখন তোমার সঙ্গে মোলাকাৎ করার জন্য অধীর আগ্রহে প্রতিক্ষা করছেন। উই আর অল হ্যাপী উইথ ইয়োর ওয়ার্ক। আজ তোমার ছুটি মিলবে।

: কেন, কোথায় যাবো? পুলিশের হেপাজতে? বেশ একটু রুক্ষ স্বরেই আমি জবাব দিলুম।

আমার কথায় কিন্তু সমাদ্দার কোন রাগ প্রকাশ করলেন না। হাসি মাখানো কণ্ঠেই জবাব দিলেন: জানি, মিসেস সেন তোমার কাছে আমার নামে অনেক কেচ্ছা করেছেন।

চলো আমার সঙ্গে সবার সঙ্গেই তোমার দেখা হবে।

ডিঙি এসে দক্ষিণেশ্বরের তীরে থামলো। আমরা দুজনেই নৌকা থেকে নামলুম। গভীর রাত। চারদিক নিস্তব্ধ। শুধু দূর থেকে ঝিঁঝি পোকার ডাক শুনতে পাচ্ছি। আমার মন থেকে তখনও কিন্তু পুলিশের আতঙ্ক দূর হয় নি। হয়তো সমাদ্দার আমার মনের এই আতঙ্কের কথা বুঝতে পারলেন। বললেন: ভয় পেয়ো না। এখানে পুলিশ নেই। আজকের মতো তুমি পুলিশের চোখে ধুলো দিতে পেরেছো। তোমার এই কৃতিত্বের জন্যে তোমায় বাহবা দিচ্ছি।

আমি জানতুম জি-বি-এম, তুমি করিতকর্মা লোক। প্রথম দিনই আমি বুঝতে পেরেছিলুম স্পাই-এর কাজে তুমিই হবে যোগ্যতম ব্যক্তি। সেই জন্যেই সেদিন দলের বৈঠকে আমি সবার সামনে তোমাকেই 'লীডার' করার প্রস্তাব করেছিলুম। আজ দেখছি আমি লোক চিনতে ভুল করিনি। জি-বি-এম শুধু মাত্র সাকসেসফুল স্মাগলার নয়, হি ইজ এ গ্রেট স্পাই। যাক্, মাল সব মজুত আছে তো?

: ফিল্মের কথা বলছেন তো?

: ছাটস রাইট।

আমি পকেটে হাত দিলুম। ঠিকই আছে ফিল্মগুলো। ভিজে যায়নি তো? মনে হলো জলের স্পর্শ লাগেনি। বললুম: ঘাবড়াবেন না, জি-বি-এম কাঁচা কাজ করে না।

সমাদ্দার হাসলেন। অন্ধকারের ভেতর থেকেও আমি তার সাদা দাঁত-গুলো দেখতে পেলুম। মনে হলো সমাদ্দার আমার জবাবে সন্তুষ্ট হয়েছেন। তার এতোদিনের পরিশ্রম আজ সার্থক হতে চলেছে। ভারত সরকারের মূল্যবান গোপনীয় তথ্য আজ আমাদের হস্তগত হয়েছে।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা এক জীর্ণ বাড়ীর কাছে এলুম। মাঠের পাশেই বাড়ী। এখানে যে কোন লোকের বসতি হতে পারে তা ভাবাই যায় না। চারদিক তখন নীরব নিস্তব্ধ।

সমাদ্দার বললেন: আমাদের হেড কোয়ার্টার, জি-বি-এম। এইখানে বসেই আমাদের সমস্ত কাজ হয়। বৈঠক হয়, আলোচনা করি, প্ল্যান নকশা তৈরি করি। এই অঞ্চলে এটাই হলো আমাদের স্পাই-এর সেন্টার। এখানে বসেই আমরা জাল নোট ছাপি, রেডিওতে হংকং-এ খবর পাঠাই।

: জাল নোট? আমার এই প্রশ্নে শুধু বিস্ময় নয়, উত্তেজনাও ছিলো।

: হ্যাঁ জি-বি-এম। জাল নোট ছাপাও আমাদের একটা নিত্যনৈমিত্তিক কাজ। আগে আমারা ব্যাঙ্ক অব চায়না থেকে প্রয়োজনীয় টাকা পেতুম।

কিন্তু এখন সে পথ বন্ধ। ভারত সরকার আমাদের ব্যাঙ্ক বন্ধ করে দিয়েছেন। ফলে ব্যাঙ্কের সঙ্গে টাকার লেনদেনও বন্ধ হয়েছে। এই গোটা দেশে আমাদের বিস্তর সাগরেদ ছড়িয়ে আছে। ওদের জন্য প্রচুর টাকার প্রয়োজন হয়। সে টাকার যোগান দেবার জন্যই আমরা জাল নোট ছাপাতে শুরু করলুম। জাল নোট বাজারে চালু করাও আমাদের স্পাইদের একটা প্রধান কাজ।

আমি এবার একটু ভয় পেলুম। বললুম: সমাদ্দার সাহেব, আমাকে এ পর্যন্ত যে সব টাকা দিয়েছেন, সেগুলোও কী জাল?

: না। সে টাকা তোমার নামে বিদেশ থেকে পাঠানো হয়েছিলো। সে টাকা জাল নয়। কিন্তু তাসের আসরে তুমি যে টাকা ঢেলেছিলে সেগুলো সবই আমাদের এই ছাপাখানায় তৈরি নোট।

: অর্থাৎ, রেখা সরখেলকে আমি যে চল্লিশ হাজার টাকা ধার দিয়েছিলুম তা সবই মেকী, জাল নোট?

: তোমার অনুমান একটুও মিথ্যে নয়। তাসের আসরে বাজী হারলেন রেখা সরখেল। সে টাকা জিতলো দেশমুখ। বড়ো একটা ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার দেশমুখ। এতোক্ষণে তার হাত দিয়ে আমাদের ছাপা সেই নোট ঐ ব্যাঙ্কের মারফৎ বাজারে পাচার হয়েছে।

: মিঃ সমাদ্দার!

আমার উত্তেজনা এতো বেশি হয়েছিলো যে আমি সমাদ্দারকে মিস্টার বলে সম্বোধন করলুম।

: আপনি কী বলেছেন মিঃ সমাদ্দার?

: ঠিকই বলেছি জি-বি-এম। রেখা সরখেল তাসের আসরে বাজী হেরেছে। এবার দেশমুখের হারবার পালা। ও কি ছাই জানে যে চল্লিশ হাজার টাকার জাল নোট নিয়ে বসে আছে। শোন জি-বি-এম, আমাদের কাছে আশ্চর্য বা বিস্ময়কর বলে কোন বস্তু নেই। জীবনে সবই সম্ভবপর। আর আমাদের এই কাজকর্মে আমরা কি আসল টাকা ব্যবহার করি। নিজেরাই নোট ছাপি আর বাজারে চালু করি।

জাল নোটের ব্যাপারে সমাদ্দারও যে লিপ্ত ছিলেন সে কথা আমার অজ্ঞাত ছিলো। মনে হলো, আজ সমাদ্দারের জীবনের অনেক রহস্যই আমার কাছে স্বচ্ছ পরিষ্কার হয়ে এলো।

: চলো জি-বি-এম, আসরে যাবার আগে একবার আমাদের হেড কোয়ার্টারটা তোমাকে দেখিয়ে আনি। আমাদের ফ্রিকোয়েন্সী মডুলেশন অর্থাৎ এফ এম ট্রান্সমিটার দেখেছো? আমারা এই ট্রান্সমিটার মারফৎ হংকং-এ

খবর পাঠাই। আমাদের এই দক্ষিণেশ্বরের হেডকোয়ার্টারে এমন অনেক কাজকর্ম হয়।

এবার সমাদ্দার আমাকে বাড়ীটার সমস্ত অংশ ঘুরিয়ে দেখালেন। মস্তো বড়ো নির্জন বাড়ী। গ্যারেজের মতো একটি ছোট ঘরে রেডিওর এ্যান্টেনা বসানো। বাড়ীটার মাটির নীচে আছে আর একটি তলা। সেই তলায় জাল নোটের ছাপাখানা। ছাপাখানার পাশে জাল পাশপোর্ট বানাবার ঘর। তার পাশেই ফটোগ্রাফীর ঘর।

আধঘণ্টা বাড়ীর চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখলুম। আমার হাত ধরে চলতে চলতে সমাদ্দার বললেন: চলো জি-বি-এম, এবার আসরে গিয়ে বসা যাক্। আজ তোমাকে অভিনন্দন জানাবার জন্যই দলের সকলে উপস্থিত হচ্ছেন। বলতে গেলে আজ অনেকদিন বাদে দলের পুরো বৈঠক হচ্ছে। বেরুট থেকে সতীলাও এসেছে। কিন্তু বৈঠকে ঢুকবার আগে তোমাকে একটা কথা বলতে চাই।

: বলুন? নির্লিপ্ত কণ্ঠে আমি বললুম।

: সিক্রেট ডকুমেন্টের ফিল্মগুলো কার কাছে? তোমার কাছে না মিসেস সেনের কাছে?

আমি পকেটে হাত দিলুম। দেখলুম ফিল্মগুলো পকেটেই আছে। ফিল্মগুলো সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে হেসে বললুম: ভয় পাবেন না। ফিল্মগুলো আমার জিম্মাতেই আছে। কিন্তু হঠাৎ আবার এই প্রশ্ন করলেন কেন?

: ভাবলুম হয়তো তুমি ফিল্মগুলো মিসেস সেনের কাছে দিয়েছো। কারণ, ওর হাতে ফিল্মগুলো দিলে আমাদের সর্বনাশ হতো। আমাদের এতোদিনের পরিশ্রম সব পণ্ড হতো।

: কেন? বিস্মিত ও কৌতূহলী হয়ে আমি আবার জিজ্ঞেস করি।

: আজ তোমাকে একটা দুঃসংবাদ দেবো জি-বি-এম। ঠিক আধঘণ্টা আগে হাওড়া স্টেশনের কাছে মিসেস সেনকে আজ পুলিশে গ্রেপ্তার করেছে।

: গ্রেপ্তার করেছে? আমি এতোটা বিস্মিত হয়ে পড়েছিলুম যে প্রায় চীৎকার করেই প্রশ্নটা করলুম।

: হ্যাঁ জি-বি-এম, আমি সত্যি কথাই বলছি। গ্রেপ্তার হয়তো করে নি, তবে আমার মন বলছে মিসেস সেন পুলিশের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

আমি জানতুম জি-বি-এম, মিসেস সেন ছিলো পুলিশের লোক। মিসেস সেন আজ আমাদের দুজনকেই পুলিশের হাতে তুলে দেবার সংকল্প করেছিলো। নইলে পুলিশ কী করে জানলো যে আমি তোমার সঙ্গে শ্রীরামপুরের তুলসী

গোস্বামী লেনের একটা বাড়ীতে যাচ্ছি দেখা করতে।

মিসেস সেনকে যাচাই করবার জন্যই আমি আজ তোমার সঙ্গে শ্রীরামপুরে দেখা করবার ব্যবস্থা করেছিলুম। মিসেস সেন ছাড়া আর কেউ এ খবর জানতো না। ডরোথীর কাছে শুনলুম তুমি নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই শ্রীরামপুরে যাবার জন্য রওনা হয়ে গিয়েছে।। তাই তোমাকে সতর্ক করে দেবার সুযোগ পাইনি। আমি তোমার একটু পরেই শ্রীরামপুরে গিয়েছিলুম। সেখানে গিয়ে দেখলুম পুলিশ আগে থেকে এসেই বাড়ীটার চারদিকে মোতায়েন হয়ে আছে।

সমস্ত ব্যাপারটি আঁচ করে নিতে বেগ পেতে হলো না। বুঝতে পারলুম মিসেস সেনই পুলিশ তলব করেছে।

: মিসেস সেন পুলিশ তলব করেছে? সমাদ্দার সাহেব, আপনি বলছেন কী?

: যা সত্যি তাই বলছি জি-বি-এম। অতি খাঁটি কথা। আমার কথায় কোন খাদ নেই।

সমাদ্দারের কথার পরে আমি বললুম: জানেন সমাদ্দার সাহেব, আজ শ্রীরামপুরে মিসেস সেন আমাকে বললেন, এই যে পুলিশ দেখছো, এ সবই সমাদ্দারের কারসাজি। আমি বুঝতে পারছিনে সাহেব, কী করে আপনার কথা বিশ্বাস করবো। যদি মিসেস সেন সত্যিই ভারত সরকারের এজেন্ট হয়ে থাকেন তাহলে পুলিস ওকে গ্রেপ্তার করবে কেন?

: গ্রেপ্তার তো করে নি, সমাদ্দার বললেন,—ও ওর নিজের দলেই ফিরে গেছে।

এবার আমার মনে একটু আতঙ্ক হলো। বললুম: মিঃ সমাদ্দার, মিসেস সেন নিশ্চয় এই আড্ডাখানার খবরটাও জানেন। উনি যদি সত্যিই পুলিশের লোক হন তাহলে আমি হলপ করে বলতে পারি ইতিমধ্যেই পুলিশ আমাদের এই খুপরির সন্ধানে এসেছে।

আমার কথা শুনে সমাদ্দার একটু হাসলেন। তারপর বললেন: জি-বি-এম, তোমাকে তো কতোবার বলেছি যে স্পাইং-এর কাজে কাউকেই বিশ্বাস করতে নেই। মিসেস সেন আমাদের এই আড্ডার কথা জানে না। মাত্র দু' চারজন ছাড়া আমরা কোথায় বসে কাজ করি তা জানে। আজ তুমি দলের জন্য অতি দুঃসাহসিক একটা কাজ করেছো। জি-বি-এম, এখন আর তোমাকে বিশ্বাস না করে পারি না। তাই-ই আজ তোমাকে আমাদের আড্ডায় নিয়ে এলুম। তবু বলবো, মিসেস সেন পুলিশের দলে যোগ দেবার পর এখন আমাদের কিছুদিনের জন্য গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে। কারণ, সাবধানের

মার নেই। অসতর্ক হলেই বিপদ।

তারপর খানিকটা উদাসকণ্ঠে আবার বললেন: জি-বি-এম, জীবনে অনেক বিপদের ঝুঁকি নিতে হয়। মিসেস সেন আমাদের অনেক গুপ্ত কাহিনী জানে। তার কিছু আভাসও যদি পুলিশ পায় তাহলে আমাদের বিস্তর বেগ পেতে হবে। কিন্তু কী করবে বল? একদিন সরল মনে ওকে বিশ্বাস করেই দলে টেনেছিলুম। পার্টিতে আমিই ওকে রিক্রুট করি। কোনদিন বিশ্বাসঘাতকতা করবে ভাবতে পারিনি। আর এ বিশ্বাসঘাতকতা কেনই বা করলো? নিশ্চয় হৃদয়ের দুর্বলতার জন্যে। বেচারা নিশ্চয় সমীর সেনের প্রেমে মশগুল হয়ে পড়েছিলো।

সমীর সেনের সঙ্গে মিসেস সেনের প্রেম ছিলো, একথা আমি বিশ্বাস করতে পারলুম না। এ কি সম্ভব। হয়তো সমাদ্দার ঠিক কথাই বলেছেন? আমার সঙ্গে মিসেস সেন শুধু অভিনয়ই করেছিলেন। এই তো স্পাই-এর জীবন। প্রেম ভালোবাসা বলে কী কোন বস্তুই নেই তার জীবনে।

ভেবে ভেবে আমার মনটা হঠাৎ মিসেস সেনের ওপরে বিরক্তিতে ভরে উঠলো।

*   *   *

এবার আমরা দু'জনে ঘরে ঢুকলুম।

আজ সতীলা ও চীনি ভদ্রলোক আগে থেকেই এসে বসে ছিলেন আমাদের জন্য। আমরা ঢুকতেই সতীলা আমার হাত ধরে বললো: মালকানি, তুমি যে এতো কর্মদক্ষ একথা আগে কখনই ভাবিনি। আজ শ্রীরামপুরে এবং হাওড়ায় তোমার কর্মকুশলতার কথা শুনে আমরা সত্যিই অভিভূত হয়েছি। জি-বি-এম, আজ থেকে তুমিও আমাদের দলের দায়িত্বশীল সদস্য। সামান্য কর্মী নও।

অতএব কণ্ঠে একটা ক্ষীণ প্রতিবাদের সুর তুলে বললুম: আমি কিন্তু দেশে ফিরে যাচ্ছি।

: দেশে! সতীলার কণ্ঠে ছিলো বিস্ময়।

: আই মীন বেরুট।

: নিশ্চয়। আজ রাতেই তুমি বেরুটে ফিরে যেতে পারো। কিন্তু যাবার আগে আমরা তোমার কাছ থেকে ফিল্মগুলো চাই।

বুঝতে পারলুম। আমার এই ফিল্মগুলোর অনেক কদর। সবাই এর কথা জিজ্ঞেস করছে। হেসে জবাব দিলুম: নিশ্চয় পাবেন। ফিল্মের জন্য আপনাকে কোন চিন্তা করতে হবে না। যাবার আগেই ফিল্মগুলো আপনার হাতে তুলে

দিয়ে যাবো।

এই বলে আমি ঘড়ির পানে তাকালুম। রাত এখন দেড়টা। ভোর পাঁচটায় আমাকে প্লেন ধরতে হবে।

আমাকে ঘড়ির পানে তাকাতে দেখে সমাদ্দার জিজ্ঞেস করলেন : অতো ঘন ঘন ঘড়ির পানে তাকাচ্ছো কেন ?

: পাঁচটার সময় আমার প্লেন মিঃ সমাদ্দার।

: চিন্তা করো না জি-বি-এম, আজকের শেষ রাতের প্লেনেই তুমি বেরুটে ফিরতে পাবে—

সমাদ্দারের কথা শেষ হলো না, হঠাৎ ঘরের বাতি নিভে গেলো।

অন্ধকার হলো ঘর।

চারদিক থেকে চীৎকার শুনতে পেলুম, পুলিশ, পুলিশ।

আমিও সচকিত হয়ে উঠলুম। পকেটে হাত দিলুম। ফিল্মগুলো ঠিকই আছে। আজ পুলিশ তো আমার সন্ধানেই এখানে এসেছে। নিশ্চয় মিসেস সেনই এই পুলিশ পাঠিয়েছেন এখানে। কিন্তু সমাদ্দার যে বললেন মিসেস সেন এ আড্ডার খবর জানেন না। তাহলে পুলিশ এলো কী করে ? এখন ভাববার সময় নেই। সবাই পালাবার জন্য ব্যস্ত। চারদিকে চীৎকার হট্টগোল। হঠাৎ দেখতে পেলুম পুলিশ ঘরের ভিতরে ঢুকছে।

সতীলা নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করলো। রিভলবার বের করে গুলী চালালো। কিন্তু নিশানা ব্যর্থ হলো।

সমাদ্দার আমার পানে তাকিয়ে বললেন : জি-বি-এম, পালাও। বেরুটে চলে যাও। আমাদের লোক সেখানে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

এই কথার পরে আমি আর দেরি করলুম না। সামনেই একটা জানলা ছিলো। জানলা টপকে লাফিয়ে পড়লুম।

চারদিক অন্ধকার। কোথায় যাবো জানি না। আমি কলকাতায় অপরিচিত। রাস্তাঘাট আমার কাছে অজানা। অতএব হাঁটা ছাড়া আমার কোন উপায় ছিলো না।

ঘড়ির পানে তাকালুম। রাত প্রায় দুটো বাজে। ভোর পাঁচটায় আমার প্লেন। আর মাত্র তিন ঘণ্টা আছে। এর মধ্যে যেমন করে হোক দমদম এয়ারপোর্টে পৌছতে হবে। আজই কলকাতা ত্যাগ না করলে কাল সকালেই আমাকে পুলিশের হাতে ধরা দিতে হবে।

রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলুম। পেছনে একবার তাকিয়ে দেখলুম। বিস্তর পুলিশের গাড়ী জমায়েত হয়ে বাড়ীটাকে এখন সম্পূর্ণ ঘিরে ফেলেছে। সতীলা

ও সমাদ্দারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। বন্দীদের পুলিশের কালো গাড়ীতে তোলা হচ্ছে।

আর সময় নষ্ট করা উচিত নয়। যে কোন মুহূর্তেই পুলিশ আমাকে পাকড়াও করতে পারে। আমি আরও একটু জোরে হাঁটতে লাগলুম।

কতোক্ষণ হেঁটেছিলুম জানি না। হয়তো আধ ঘন্টা হবে। একটা বড়ো রাস্তার সামনে এলুম। রাস্তা দিয়ে দু'একটা লোক চলাচল করছিলো। একজনকে জিজ্ঞেস করলুম: বলতে পারেন, দমদম এয়ারপোর্ট কোন্ দিকে?

আমার প্রশ্ন শুনে লোকটা এমন দৃষ্টি আমার পানে তাকালো যেন আমি এক মস্তো অপরাধ করেছি। তারপর সে-ই আবার প্রশ্ন করলো: দমদম?

: হ্যাঁ। ক্ষীণ কণ্ঠে আমি জবাব দিলুম।

: অনেক দূর। বাসে বা ট্যাক্সী করে যেতে হয়।

: বাস-ট্যাক্সী করে?

: হ্যাঁ।

: বাস বা ট্যাক্সী পাওয়া যাবে কী?

: কেন পাওয়া যাবে না। সামনের দিকে আর একটু হাঁটুন, ট্যাক্সী স্ট্যাণ্ড পাবেন।

আমি আর কোন কথা না বলে আবার হাঁটতে লাগলুম। কিন্তু খুব বেশিক্ষণ আর আমাকে হাঁটতে হলো না। একটু বাদেই ট্যাক্সী স্ট্যাণ্ডের কাছে এলুম।

একটা ট্যাক্সী মজুত ছিলো।

কিন্তু এতো রাতে ট্যাক্সীওয়ালা ভাড়া যেতে চাইলো না। তাকে ভালো বকশিসের আশ্বাস দিলুম। কিন্তু ট্যাক্সীওয়ালার দুটি চোখেই তখন বিস্তর ঘুমের আবেশ। ঘুম জড়ানো চোখেই সে বললো: না।

এবার কী করি? আবার হাঁটতে লাগলুম। খানিক বাদে আর একটা ট্যাক্সী পেলুম। এই ট্যাক্সীওয়ালা যেতে রাজী হলো।

ঠিক করলুম প্রথমেই ডরোথীর কাছে যাবো। তার কাছ থেকে আমার সুটকেস নেবো। জামা-কাপড় পাল্টাবো। তারপর দমদম হয়ে বেরুট।

বিদায় কলকাতা! এ যাত্রায় কলকাতার জীবনের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য হলো না। ডরোথীর সঙ্গেও আলাপ জমাতে পারলুম না। মনে একটা খেদ রয়ে গেলো।

একটা ট্যাক্সী করে ডরোথীর বাড়িতে এলুম। পার্ক স্ট্রিটের বাড়ীতে ডরোথী ছিলো না। তার ঘরের দরজা খুলতে অসুবিধে হলো না। ডরোথী

আমাকে আগেই একটা পৃথক চাবি দিয়েছিলো।

আমি পোশাক পাল্টালুম। ফিল্মগুলো পকেটে ভরলুম। আজ আমার কাছে এগুলোই হলো সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। ভাগ্যিস সমাদ্দার বা সতীনার হাতে ফিল্মগুলো তুলে দিইনি। ওদের হাতে গেলে ফিল্মগুলো এতোক্ষণে পুলিশের হাতে গিয়ে পড়তো।

পাশপোর্টটা নিলুম।

আজ আমার নাম গগনবিহারী বাজপেয়ী। গোবিন্দবিহারী মালকানির মৃত্যু হয়েছে। বেরুটে গিয়ে আবার তার পুনর্জন্ম হবে।

*　　　　*　　　　*

দমদম এয়ারপোর্টে যখন এসে পৌছোলুম তখন রাত প্রায় শেষ হয়েছে। ঘড়িতে সকাল সাড়ে চারটে।

প্লেন ছাড়বার আর আধ ঘন্টা বাকী। টিকিট কাউন্টারে গিয়ে 'চেন ইন' করলুম। কাউন্টার ক্লার্ক আমার পানে বেশ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালো। আমার মনে একটু আতঙ্ক হলো। লোকটা কী আমাকে সন্দেহ করলো ?

: গগনবিহারী বাজপেয়ী ?

কাউন্টার ক্লার্ক বেশ জোরেই আমাকে ডাকলো। তার ডাক শুনে আমি সচকিত হলুম। বললুম,

: ইয়েস স্যার।

: আপনার মাল ? কাউন্টার ক্লার্ক জিজ্ঞেস করলো।

: শুধু একটা এটাচী কেস। সঙ্গে আর কিছু নেই।

এর পরে গেলুম সিকিউরিটি পুলিশের দপ্তরে।

গগনবিহারী বাজপেয়ী !

বেশ একটু রাশভারী কণ্ঠে পুলিশ আমায় ডাকলো।

: ইয়েস স্যার ! আমি জবাব দিলুম।

: কোথায় যাবেন ?

: বেরুট।

: ক'দিন ছিলেন ভারতবর্ষে ?

: দু মাস।

: পেশা ?

: বিজনেস।

পুলিশ অফিসার এবার আমার পাশপোর্টটা নিয়ে একবার ভেতরে গেলেন। আমার উৎকণ্ঠা বাড়লো। ভাবলুম, হয়তো ওরা আমাকে চিনতে পেরেছে গগন-

বিহারী বাজপেয়ী যে আমার জাল নাম তা বুঝতে পেরেছে।

এক এক করে আরও অনেক প্রশ্ন জাগলো আমার মনে। খানিক বাদে পুলিশ অফিসারটি ফিরে এলেন আবার। বললেন: সরি, আপনাকে অযথা দেরি করালুম। আপনি যেতে পারেন।

কেন জানিনে এবার আমার মনে একটা প্রশ্ন জাগলো। বললুম: এনিথিং রং অফিসার?

আমার পানে না তাকিয়েই পুলিশ অফিসারটি বললেন: না, আমরা একটা লোকের সন্ধান করছি। তাই সবার পাশপোর্টই পরীক্ষা করছি।

: স্মাগলার? আমি কৌতূহল প্রকাশ করি।

আমার প্রশ্ন শুনে পুলিশ অফিসার এবার মুখ তুললেন। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,

: না, স্পাই। চীনি স্পাই। ইনকুইজিটিভ?

: না, এমনিই প্রশ্ন করলুম, আমি এবার একটু তাচ্ছিল্যের কণ্ঠে বললুম।

: কাল রাত্রে পুলিশ এক স্পাই গ্যাংগকে পাকড়াও করেছে। তারা এই দেশের বিরুদ্ধে এক বিরাট ষড়যন্ত্র করেছিলো। এই দলের চাঁই ছিলো এক ওভারসিজ ইণ্ডিয়ান। আমরা তারই খোঁজ করছি।

: সরি অফিসার, আমি হলুম, ইণ্ডিয়ান। পুরো ইণ্ডিয়ান। আমার ন্যাশনালিটিতে কোন ক্যারাট নেই। থ্যাঙ্কস।

এই বলে আমি কাস্টমসের পানে হাঁটা দিলুম। কাস্টমসে আমার কোন বেগ পেতে হলো না।

তার পর এসে বসলুম ট্রান্সমিট্ লাউঞ্জে।

* * *

ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে।

আর কয়েক মুহূর্ত বাদেই আমার প্লেন শূন্য আকাশে উঠবে।

গগনবিহারী বাজপেয়ী ওরফে গোবিন্দবিহারী মালকানি ভারতবর্ষ থেকে বিদায় নেবে। গুড বাই টু ইণ্ডিয়া।

আমার মন থেকে এদেশের স্মৃতি বিলীন হয়ে যাবে। ভুলে যাবো সমাদ্দার, মিসেস সেন আর মানিকলালকে।

রেখা সরখেলকেও আমি ভুলে যাবো। আবার মনে হবে বেটী নাদিয়ার কথা। মনে পড়বে জায়তুনীর নাইট ক্লাব।

বারম্যান জি-বি-এম আবার আসর জাঁকিয়ে বসবে।

সবাই আমার কাছে এসে বলবে: জি-বি-এম, ওয়ান ডবল স্কচ্, প্লিজ।

: জি-বি-এম, গীভ মী এ কালভাদো।

কেউ বা কণ্ঠস্বর নীচু করে বলবে : জি-বি-এম, আমিনা কোথায় ?

এয়ার হোস্টেসের কণ্ঠস্বরে আমার চিন্তাধারা ছিন্ন হলো।

: উইল অল প্যাসেঞ্জার বাউণ্ড ফর বাহেরিন-:বরুট-রোম-পারী-লণ্ডন প্লিজ প্রসিড টু প্লেন।

বিদায় নেবার সময় এসেছে। আমার সহযাত্রীরা প্লেনের পানে হাঁটা দিলেন। আমিও তাদের সঙ্গ নিলুম। আজ কেন জানিনে ভারতবর্ষের মায়া কাটাতে কষ্ট হচ্ছিলো। যাবার আগে সমাদ্দার ও মিসেস সেনের কথা মনে পড়লো। আমি এখন মুক্ত বিহঙ্গের মতো শূন্য আকাশে ছুটে বেড়াবো আর ওরা হয়তো কয়েদখানায় বসে মুক্তির দিন গুণবে! একই বলে জীবনের ভাগ্যচক্র।

যাত্রীরা এক এক করে প্লেনে উঠতে লাগলেন। আমি একটু পেছনে পড়েছিলুম। প্লেনে উঠতে আমার মন চাইছে না। যাবো কি যাবো না এই নিয়ে মতদ্বৈধ হলো।

হঠাৎ পেছন থেকে এক সাইরেনের আওয়াজ শুনতে পেলুম। সাইরেন নয় এ্যাম্বুলেন্স গাড়ীর তীক্ষ্ণ ধ্বনি। না, এ্যাম্বুলেন্সও নয় পুলিশের গাড়ী। পুলিশের একটা গাড়ী তীব্র বেগে এয়ার পোর্টের রানওয়ের পানে ছুটে আসছে। কিন্তু পুলিশের গাড়ী কেন ?

কী ব্যাপার ? ওরা কী আমার সন্ধানেই আসছে নাকি! টের পেয়েছে নাকি যে গোবিন্দবিহারী মালকানি ভারতবর্ষের মাটি থেকে বিদায় নিচ্ছে!

কিন্তু আজ আর গোবিন্দবিহারী মালকানির মনে আতঙ্ক নেই। ভয় নেই। কারণ আজ আমি তো আর গোবিন্দবিহারী মালকানি নই। জি-বি-এম-এর মৃত্যু হয়েছে। আমি হলুম নতুন মানুষ…।

পুলিশের গাড়ীটা আমার সামনে এসেই দাঁড়ালো। গাড়ী থেকে এক পুলিশ অফিসার নামলো।

: মিঃ গোবিন্দবিহারী মালকানি!

আমি পুলিশ অফিসারের প্রশ্নের কোন জবাব দিলুম না। আপন মনে হাঁটতে লাগলুম।

: মিঃ মালকানি!

এবার পুলিশের কণ্ঠস্বরে কর্কশতা ছিলো। অতএব এবার আমি জবাব দিলুম—

: আমার নাম গোবিন্দবিহারী মালকানি নয় পুলিশ অফিসার। আমার

নাম—

আমার কথা শেষ হবার আগেই পুলিশ অফিসার বললো : ভারতীয় পুলিশের খাতায় আপনার নাম লেখা আছে গোবিন্দবিহারী মালকানি।

আমি হাসলুম। বললুম : সরি অফিসার, সরি। ভারতীয় পুলিশ মস্তো বড়ো ভুল করেছে। আমার নাম তো গোবিন্দবিহারী মালকানি নয়।

: এয়ার পোর্টে আপনি গগনবিহারী বাজপেয়ী বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন—আমার অর্ধ সমাপ্ত কথা লুফে নিয়ে পুলিশ অফিসার বললো,—থাক্, আমাদের কর্তা আপনার জন্যে লাউঞ্জে অপেক্ষা করছেন।

আমি আবার হাসলুম। মৃদু বিদ্রূপের হাসি। ভাবলুম, আমার পরিচয় জানা কী সহজ কথা। শ্রীকৃষ্ণের শত নাম। আজ আপনারা যাকে গোবিন্দ-বিহারী মালকানি নামে জানেন—এয়ার পোর্টের পুলিশ অফিসার জানে আমি হলুম গগনবিহারী বাজপেয়ী,—কিন্তু আমি সত্যিই কে, জানেন?

আমার আসল পরিচয় আপনারা কেউই জানেন না। শুনুন, আমার নাম হলো—, আমি বললুম পুলিশ অফিসারকে।

: আমার নাম গোবিন্দবিহারী মালকানি বা গগনবিহারী বাজপেয়ী নয় অফিসার। আমার আসল নাম রুস্তমজী কাপাডিয়া। অফিসার আমিই হলুম এই নাটকের তৃতীয় ব্যক্তি। স্পাইদের ভাষায় যাকে বলা হয় থার্ড ম্যান। আরো সংক্ষেপে বলতে পারেন 'স্পাই'।

আমার পেশা জানতে চান? আমি হলুম ভারত সরকারের ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টের একজন অফিসার,—রুস্তমজী কাপাডিয়া।

আমার এই জবাবের ভেতর দৃঢ়তা ছিলো, ছিলো আদেশের সুর।

: লেট আস গো টু ইয়োর বস, অফিসার। আমি বললুম এবং তারপর আমরা দুজনে লাউঞ্জের পানে হাঁটা দিলুম।

একটু পরেই বেরুটের প্লেন শূন্য আকাশে উঠে গেলো।

* * *

হয়তো এই কথা কটি বলেই এখানে কাহিনীর ছেদ টানতে পারতুম। কিন্তু আমার গল্পের শেষ হতো কী? পাটক-পাঠিকার কৌতূহল নিশ্চয় মিটতো না। কারণ, আমার এই কাহিনীর বহু রহস্য ও বৈচিত্র্যে বিজড়িত। আমার এই গল্পের ইতি সমাপ্তিতে নয়, আরম্ভে। তাই গল্প শেষের আগে আরও কিছু গৌরচন্দ্রিকার প্রয়োজন।

আমার নাম রুস্তমজী, গোবিন্দবিহারী মালকানি নয়। আমি ভারত সরকারের কর্মচারী, ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টর।

১৯৬২ সালে চীন ভারত আক্রমণ করলো। যুদ্ধে ভারতের পরাজয় হলো। সমগ্র দেশব্যাপী এই পরাজয় নিয়ে তুমুল আন্দোলন শুরু হলো। পার্লামেন্টে ও সংবাদপত্রে তুমুল সমালোচনা হলো। সবাই একবাক্যে বললে, ভারত সরকারের ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট একেবারেই অকর্মণ্য, কাজের অযোগ্য। না হলে কেন আমরা চীনের শক্তি বা সামর্থ্য সম্বন্ধে দিল্লীর কর্তাদের সময়-মতো সতর্ক করিনি।

আমাদের বিরুদ্ধে আরও অনেক গুরুতর অভিযোগ করা হোল। দেশব্যাপী চীনি গুপ্তচর ছড়িয়ে আছে। এইসব গুপ্তচরেরা খুবই তৎপর ও কর্মঠ। প্রতিদিনই ভারত সরকারের দপ্তর থেকে কিছু না কিছু গোপনীয় কাগজপত্র বা খবর খোয়া যাচ্ছে। সবাই জিজ্ঞেস করতে লাগলো, এইসব চীনি স্পাই কারা? কোথায় তাদের আড্ডা?

প্রশ্ন বা অভিযোগ যতো সহজে করা হলো তার জবাব ততো সহজে দেয়া গেলো না। আমার বড়োকর্তা ভক্তিচরণ ভগত এইসব অভিযোগের কথা শুনে বেশ কিছুটা বিচলিত হলেন। প্রতিদিনই প্রাইম মিনিস্টার ও হোম মিনিস্টারের দপ্তর থেকে মেমো আসছে, চীনি স্পাইদের গ্রেপ্তার করো। কোথায় তাদের আড্ডাও খুঁজে বের করো।

আরও একটা খবরে আমরা অর্থাৎ ভারত সরকার খুবই বিচলিত হল। এতোদিন ব্যাঙ্ক অব চায়না চীনি স্পাইদের টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করছিলো। সে খবর জানতে পেরে ভারত সরকার এখন সে প্রতিষ্ঠানটিকে নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন, অথচ আমরা জানতে পারলুম যে এখনও চীনি সমর্থকেরা কোথাও থেকে বিস্তর অর্থ সাহায্য পাচ্ছে। কে দিচ্ছে এইসব টাকা? যুদ্ধের শুরু থেকেই চীনি দূতাবাসের ওপরে আমরা কড়া নজর রেখেছিলুম। আমাদের চোখ এড়িয়ে তাদের পক্ষে কোন টাকা বিলোনো সম্ভব ছিলো না। অতএব আমরা বুঝতে পারলুম যে চীনি দূতাবাস ছাড়া অন্য কোথাও থেকেই এইসব টাকা আসছে।

একদিন বড়োকর্তা ভক্তিচরণ ভগতের ঘরে আমার ডাক পড়লো। আমি তাঁর কাছে যেতেই তিনি আমাকে 'রুস্তমজী' বলে কাছে ডাকলেন।

কর্তার কাছে দাঁড়িয়ে আমি লক্ষ্য করে দেখলুম যে তার মুখের ভাব বেশ গম্ভীর আকার ধারণ করেছে। তিনি বললেন,

: রুস্তমজী, এইসব চীনি স্পাইদের তৎপরতায় আমরা বেশ নাজেহাল হয়ে পড়েছি। এদের কাজকর্ম নিয়ে প্রতিদিনই সর্বত্র তুমুল আন্দোলন হচ্ছে। সবাই আমাদের গালমন্দ করছে। তারা বলছে, আমরা একেবারেই অকর্মা

অর্থাৎ আমরা কোন ব্যাপারেই চীনি স্পাইদের যুগ্যি নই। কালকের পার্লামেণ্টের রিপোর্টটার দিকেও তাকিয়ে দেখো, সেখানে আমাদের জড়িয়ে তুমুল তর্ক-বিতর্ক হয়েছে কালকের অধিবেশনে।

কথা বলা শেষ করেই কর্তা একখানা খবরের কাগজ ছুঁড়ে দিলেন আমার পানে।

কাগজের প্রথম পাতায় বেশ বড়ো বড়ো অক্ষরে খবরটা ছাপা হয়েছিলো। দেখলাম সে আলোচনার এক জায়গায় ইনটেলিজেন্স বিভাগের অকর্মণ্যতা সম্পর্কে গুরুতর অভিযোগ করা হয়েছিলো।

: কী করা যায় বলুন রুস্তমজী? আমাকে বড়োকর্তা জিজ্ঞেস করলেন।

চট করে যে কী জবাব দেবো তা আমি ভেবে পেলুম না। চীনি স্পাই ও পাকিস্তানী গুপ্তচরদের তৎপরতা সম্পর্কে আমি খুবই অবহিত ছিলুম। জানতুম, সমগ্র দেশব্যাপীই তারা ছড়িয়ে আছে। কিন্তু কে তাদের নেতা? কোথায় তারা কী কাজ করছে? কোথা থেকে টাকা পাচ্ছে? এসব খবরের কোন স্পষ্ট জবাব জানতুম না। তাই বড়োকর্তার প্রশ্নটারও যথাযথ জবাব দিতে পারলুম না।

বড়োকর্তা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। অফিস ঘরের ভেতরেই দুবার পায়চারি করে একটা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আবার বললেন,

: আমরা জানি চীনি এবং পাকিস্তানী স্পাইরা এদেশে কাজ করছে। কিন্তু কে যে এদের নেতা বা কোথায় এদের আড্ডা আমরা তার কিছুই জানিনে। রুস্তমজী, আমরা সম্প্রতি খবর পেয়েছি যে চীনি স্পাইদের কর্তারা প্রাচ্যের বেরুটে বা চীন দেশের হংকং-এ বসেই ভারতে স্পাইং করার জন্য ভারতবাসী এবং বিদেশীদের রিক্রুট করছে। হয়তো বেরুট শহরটাতেই আছে ওদের কাজ-কর্মের হেড কোয়ার্টার। এই কাজের ইনভেস্টিগেশনের দায়িত্ব আমি আপনাকে দিতে চাই। এজন্য আপনাকে আগামী কালই বেরুট যেতে হবে। আপনার বেরুট যাত্রার খবরটা আমরা এখানে একেবারেই গোপন রাখার ব্যবস্থা করবো। কাকপক্ষীকেও এই খবর জানাতে দেবো না। সরকারী গেজেটে বলা হবে আপনি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে তিনমাসের ছুটি নিয়েছেন। আমাদের নির্দেশ হলো আপনি বেরুট গিয়ে এইসব চীনি স্পাইদের সন্ধান করবেন। তাদের গতিবিধির ওপর নজর রাখবেন। কাদের সঙ্গে তারা যোগাযোগ করছে সে সব খবর আমাদের জানাবেন। আর ভারতবর্ষেও কারা ওদের সাগরেদ তা আমরা জানতে চাই।

*　　*　　*

বিচিত্র অলৌকিক শহর বেরুট।

এই শহরে সব কিছুই হয়, রাজা ফকীর হয়, ফকীর উজীর হয়। এই শহরে কেউ পাপ পুণ্যের বিচার করে না।

কিন্তু আমি তো আর জীবন উপভোগ করতেই বেরুটে আসেনি, এসেছি চীনি স্পাইদের সন্ধান করতে।

আমার ভাগ্য ছিলো ভালোই। তাই, বেরুট শহরে পা দিয়ে আমি প্রথমেই কর্নেল হাসানের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম।

কর্নেল হাসান আমার পুরানো বন্ধু, ইণ্টার পোলের কর্তা। আমাদের প্রথম পরিচয় হয় আফ্রিকার মনোভারিয়া শহরে। কর্নেল হাসান এক ডায়মণ্ড স্মাগলারের সন্ধানে গিয়েছিলেন সেখানে আর আমি গিয়েছিলুম এক গোল্ড স্মাগলারের খোঁজে। আমরা দুজনেই এক হোটেলে উঠেছিলুম। একদিন সেই হোটেলের লাউঞ্জেই আমাদের প্রথম পরিচয় থেকে বন্ধুতা। তারপর বহুবার আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি। কর্নেল হাসান আমাকে অনেক খবরাখবর দিয়ে সাহায্য করেছেন। স্মাগলারদের সন্ধানে কর্নেল হাসান দু'একবার বোম্বাইতেও এসেছিলেন। ভারতবর্ষে এসে আমার অতিথি হয়েই থাকতেন কর্নেল হাসান।

সেদিন আমাকে দেখেই কর্নেল হাসান দারুণ খুশী হলেন। যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। প্রথমে আমি তার এই অকারণ খুশির কোন হেতু খুঁজে পেলুম না। একটু পরেই আমার কৌতূহল দূর করলেন কর্নেল হাসান নিজেই। বললেন,

: রুস্তম, আজ সকালেই তোমার কথা ভাবছিলুম।

আমি হেসে জবাব দিলুম: তাহলে আমি খুবই ভাগ্যবান বলতে হবে, নইলে হঠাৎ আমার কথা মনে পড়বে কেন?

: কারণ আছে হে, কারণ আছে। কর্নেল হাসান জবাব দিলেন,—গত রাত্রেই সমুদ্রের ধারে আমরা একটি ভারতীয়ের মৃতদেহ খুঁজে পেয়েছি। লোকটা একসময়ে ইস্তাম্বুলের কিট্-কাট্ নাইট ক্লাবের বারম্যান ছিলো। লোকটা ভারতীয় জানতে পেরেই প্রথমে তোমার নামটাই মনে পড়লো। ভাবলুম, তুমিই ওর সম্বন্ধে আমাদের আরও খবরাখবর দিতে পারবে।

: লোকটির নাম? উৎসুক হয়ে আমি জিজ্ঞেস করলুম।

: গোবিন্দবিহারী মালকানি, ওভারসিজ ইণ্ডিয়ান।

: গোবিন্দবিহারী মালকানি, আমি একবার এই নামটি নিজেও উচ্চারণ করলুম। কেন জানিনে নামটি আমার বেশ ভালো লেগেছিলো।

কর্নেল হাসান কিন্তু ইতিমধ্যে বলে চললেন,

: খুব ভালো সময়েই এসে পড়েছো কাপাডিয়া। এখনই লোকটার পোস্ট-মর্টেম দেখতে আমি মর্গে যাচ্ছিলুম। আসবে নাকি আমার সঙ্গে?

আমি কোন আপত্তি করলুম না। সেই মুহূর্তেই কর্নেল হাসানের সঙ্গে মর্গে গেলুম।

পোস্টমর্টেম শেষ হয়ে গিয়েছিলো। ডাক্তার রিপোর্ট দিলেন: ডেথ ক্রম-শক। একটা পিস্তলের গুলী এসে ওর পায়ে লেগেছিলো। শকেই ভয় পেয়ে মারা গেছে।

কর্নেল হাসান এবার আমাকে ডেড বডি দেখাতে নিয়ে গেলেন। আমরা ভেতরে যেতেই মৃতদেহের মুখ থেকে কাপড় সরিয়ে নেয়া হলো। দুজনেই বেশ খানিকক্ষণ মৃতদেহটার পানে তাকিয়ে রইলুম।

হঠাৎ কর্নেল হাসান আমার পানে তাকিয়ে বললেন,

: আশ্চর্য। কী আশ্চর্য। ডেড ম্যানের মুখটা অবিকল তোমার মত। যেটুকু সামান্য তফাৎ তা একবার প্লাস্টিক সার্জারী করলেই তোমার মুখের সঙ্গে মালকানির মুখের আর কোন অমিল থাকবে না।

কর্নেল হাসানের কথা শুনে আমি বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে রইলুম। কোন জবাব দিলুম না। কথাটা কানে যেতেই আমি মনে মনে একটা ফন্দীর কথা ভাবছিলুম। প্ল্যানটা আর কিছুই নয়। গোবিন্দবিহারী মালকানি মারা গেছে। সে ছিলো নাইট ক্লাবের বারম্যান। আমার মুখের সঙ্গে গোবিন্দ-বিহারী মালকানির মুখের স্পষ্ট আদল আছে। অতএব, আজ থেকে দুনিয়ার কাছে আমি যদি নিজেকে গোবিন্দবিহারী মালকানি বলে পরিচয় দিই তাহলে কে প্রতিবাদ করবে? কর্নেল হাসান এই মাত্র বললেন, মালকানি ছিলো ইস্তাম্বুলের নাইট ক্লাবের বারম্যান। অতএব, বেরুট শহরে সে নিশ্চয় একেবারেই অপরিচিত।

মনের গোপন কথাটা কর্নেল হাসানের কাছে প্রকাশ করলুম। বললুম: কর্নেল, আপনাকে একটা উপকার করতে হবে।

আমার কথাটা ছিলো অনুনয়ের সুর। কেন জানিনে কর্নেল হাসান আমার মুখে এই অনুনয়ের সুরটা শুনে অবাক হলেন। বললেন,

: কী ব্যাপার রুস্তম? কী তোমার রিকোয়েস্ট?

: মালকানি মারা গেছে এই খবর আর কে জানে? আমি প্রশ্ন করলুম।

: এখন পর্যন্ত বাজারে অর্থাৎ স্মাগলারদের বাজারে খবরটা চালু হয়নি। তাছাড়া মালকানির নামটা বেরুট শহরে বিশেষ পরিচিতও নয়। তাই ওর মৃত্যুর খবর এখন পর্যন্ত স্থানীয় সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয় নি। আর যারা

ওকে খুন করেছে তারাও নিশ্চয় কোন স্থানীয় লোক নয়। অন্ততঃ তাই আমার ধারণা বা অনুমান। আর যারা হত্যাকারী তারাও সঠিক জানে না সত্যিই লোকটা মারা গেছে কি না। কিন্তু তোমার এ সব প্রশ্নের উদ্দেশ্য কী বল তো?

: শুনুন কর্নেল হাসান, বিশেষ একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্যই ভারত সরকার আমাকে বেরুটে পাঠিয়েছেন। আপনার সাহায্য ছাড়া এই কাজ সুসম্পন্ন করা সম্ভব নয়। আপনি বললেন যে মালকানির মৃত্যুর খবর এখনও স্মাগলারদের দুনিয়ায় প্রচারিত হয় নি। আপনি আরো বললেন যে আমার মুখের সঙ্গে মালকানির মুখের সাদৃশ্য আছে। এবার শুনুন আমার প্রস্তাব। আমি কিছু দিনের জন্য মালকানির নামে বাজারে পরিচিত হতে চাই।

আমার কথা যেন কর্নেল হাসান বিশ্বাস করতে চাইলেন না। বেশ খানিকক্ষণ আমার মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন: তুমি কী বলছো কুস্তম? তুমি কী পাগল?

: ঠিকই বলছি। আর ধীর শান্ত মনেই এই প্রস্তাব করছি। বেরুট শহরে আমি মালকানি নামে পরিচিত হতে চাই। আমি বেরুটের স্মাগলার এবং স্পাইদের কাছে ঐ নামে পরিচিত হতে চাই।

: কেন? কর্নেল হাসানের প্রশ্নে থাকে বিস্ময়।

: কারণ আমি কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলবো। স্মাগলারদের বাজারে আমি গোবিন্দবিহারী মালকানি নামে পরিচিত হবো।

আমার কথা শুনে কর্নেল হাসান হাসলেন। বললেন: কুস্তম, মালকানি যে কী চীজ ছিলো, তুমি জানো না। ওর জীবনী নিয়ে বেশ একটা বড়ো উপন্যাস লেখা যায়। মালকানি শুধু স্মাগলার নয়, মালকানি প্রেমের ব্যাপারে ছিল কিং ফারুক। যার প্রেমের কাহিনী আজ সমস্ত মধ্য প্রাচ্যে কিংবদন্তী হয়ে আছে। অসম্ভব! কুস্তম, ওর ঐ প্রেমের অভিনয় বা স্মাগলিং-এর অনুকরণ তুমি কখনই করতে পারবে না। বৃথা অমন চেষ্টা করো না। ধরা পড়বে। বিপদে পড়বে। অনর্থক জীবন বিপন্ন হবে।

কিন্তু আমি বিপদকে ভালোবাসি। বিপদের মাঝে কাজ করে আমি আনন্দ পাই। একবার যখন মনে করছি যে মৃত গোবিন্দবিহারী মালকানির ছদ্মবেশ পরবো তখন আর আমি সহজে দমবার পাত্র নই। আমার এই দৃঢ় সংকল্পের কথা কর্নেল হাসানকে বললুম।

কর্নেল হাসান বুঝতে পারলেন যে আমি গোঁয়ার লোক। একবার যখন মনে জিদ চেপেছে তখন সহজে মত পালটাবো না। তাই হতাশ হয়ে বললেন:

তোমাকে নিষেধ করা আমার কর্তব্য তাই তোমাকে নিষেধ করলুম। একট
কথা মনে রেখো রুস্তম, গোবিন্দবিহারী মালকানি ইস্তাম্বুলের আদমী হলে কী
হবে, বেরুট শহরে যে সে একেবারেই অপরিচিত ছিলো একথা ভেবো না।
তুমি ওর জীবনী পড়োনি। ইন্টার পোলের দোসিয়ের। আমার কাছে আছে
পড়ে দেখো। বেশ ভারী পুরু ওর জীবনীর ফাইল। বেরুট শহরে
স্মাগলারদের মহলে গোবিন্দবিহারী মালকানি বিশেষ পরিচিত। বহু বছর
আগে সিরিয়াতে নাইট ক্লাবে কাজ করতো। ওর মতো দুঃসাহসী, শয়তান
এবং সর্বশেষে প্রেমিক তুমি কখনই হতে পারবে না। যাক্, এবার আমাকে
কী করতে হবে তাই বলো?

: প্রথমতঃ, স্থানীয় সংবাদপত্রে একটি বিজ্ঞাপন দিন। মত্ত এবং আহত
অবস্থায় গতরাত্রে পুলিশ ইস্তাম্বুলের কিট-কাট নাইট ক্লাবের বারম্যান গোবিন্দ
বিহারী মালকানিকে গ্রেপ্তার করেছে। এই সংবাদ প্রচারে সুবিধে হবে যে
যারা গোবিন্দবিহারী মালকানিকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিলো তারা জানবে
যে তাদের শত্রু মালকানির মৃত্যু হয় নি। দ্বিতীয়তঃ স্মাগলার মহলে
জানাজানি হবে যে গোবিন্দবিহারী মালকানি ইস্তাম্বুল থেকে বেরুটে চলে
এসেছে।

তারপর দিন দশেকের জন্যে আমাকে কয়েদখানায় পুরে রাখুন। কয়েদ-
খানায় আমার নাম হবে গোবিন্দবিহারী মালকানি। অতএব বেরুটে আমার
উপস্থিতি সম্বন্ধে কারু মনে যদি কোন কৌতূহল থাকে তবে সেই কৌতূহলেরও
নিরসন হবে। কয়েদখানার আসামীরা আমাকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা
চালাচালি করবে। তাদের মুখ থেকেই জেলের বাইরেও আমার কথা রটবে।

তৃতীয়তঃ, গোবিন্দবিহারী মালকানির আইডেনটিটি কার্ডটাও আমার চাই।
গোবিন্দবিহারী মালকানির নামীয় ইন্টার পোলের ফাইলেরও তিনটি কপি
আমার চাই। একটি কপি আমি জেলখানায় বসে পড়বো। বাকী কপি দুটো
আমার কনট্যাক্ট ম্যান মারফৎ স্মাগলারদের দুনিয়ায় বিলিয়ে দেব। মালকানির
জীবনী পড়ে অনেকেই আকৃষ্ট হবে। স্মাগলার মহলে, স্পাই জগতে আমার
চাহিদা বাড়বে।

এর পরে ইস্তাম্বুলের ইন্টার পোলে খবর দিন মালকানি বেরুটে পৌছেছে
এবং এইখানে বসেই তার কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। মালকানি যে বহালতবিয়তে
বেরুটেই বসে আছে এইটে স্পাই এবং স্মাগলারদের মহলে জানাজানি হওয়া
চাই।

আমার অনুরোধ শুনে কর্নেল হাসান বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন।

তারপর বললেন : বেশ, তুমি যা চাইছো তাই হবে। হাজার হোক ভারত সরকারের কাজে সাহায্য করতে আমরা বাধ্য। আর তাছাড়াও তুমি হলে আমার বিশেষ বন্ধু, রুস্তম। অতএব তোমার এই অনুরোধ আমার কাছে আদেশ। তবুও সমস্ত ব্যাপারটা আর একবারে ভেবে দেখতে বলছি। তুমি আগুন নিয়ে খেলতে চলেছো কাপাডিয়া।

আমি কর্নেল হাসানের কথা মন দিয়ে শুনলুম। বললুম : নেভার মাইণ্ড। আমি আগুন নিয়ে খেলা করতে ভালোবাসি।

*　　　*　　　*

কর্নেল হাসান অবিশ্যি আমার কথানুযায়ী কাজ করলেন। বেরুটের কাগজে আমার ছবি ও সংবাদ বেরুলো। আমার ফটোর সঙ্গে মালকানির মুখের চেহারার এতো সাদৃশ্য ছিলো যে তার কোন বন্ধু-বান্ধবের মনেও কোন সন্দেহ জাগলো না যে আমি আসল মালকানি নই।

তারপর দশ দিনের জন্যে আমি বেরুটের জেলখানায় গেলাম। আমার অপরাধ যে আমাকে মত্ত ও আহত অবস্থায় সমুদ্রের ধারে পাওয়া গিয়েছিলো।

আমি জেলে প্রবেশ করতেই সেখানেও কয়েদিদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হলো আমাকে নিয়ে। গোবিন্দবিহারী মালকানিকে তারা কেউ চেনে না বটে কিন্তু মালকানির নাম তাদের কাছে মোটেই অপরিচিত নয়। আমি বুঝতে পারলুম যে গোবিন্দবিহারী মালকানি তাদের মধ্যে বেশ স্বনাম খ্যাত ব্যক্তি।

এবার আমি ইণ্টার পোল রচিত মালকানির ফাইল পড়ায় মনোনিবেশ করলুম।

*　　　*　　　*

গোবিন্দবিহারী মালকানি জাতে ভারতীয় কিন্তু বর্তমানে ওভারসিজ ইণ্ডিয়ান।

পেশা, এক্সপোর্টার ও ইম্পোর্টার। কিন্তু তার আসল কাজ হলো স্মাগলিং। বিবিধ ধরনের স্মাগলিং। গোল্ড, কারেন্সী, কোকেন এবং হেরোইন।

নেশা, মেয়েমানুষ।

সমস্ত ফাইল পড়ে দেখলুম মেয়েমানুষের নেশাই হলো গোবিন্দবিহারী মালক্যানির জীবনের সব চাইতে বড়ো দুর্বলতা। মেয়ে ঘটিত সমস্ত রকম দুর্নীতির সঙ্গেই মালকানি জড়িত। রেপ, মার্ডার, বেচাকেনা কোন কাজেই মালকানির কোন দ্বিধা বা সংকোচ নেই।

এবার কর্নেল হাসানের সতর্কবাণীর অর্থ বুঝতে পারলুম। কারণ, মালকানির এই নেশাটা রপ্ত করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। অন্তত আমার

পক্ষে সহজ হবে কিনা বলা মুস্কিল। কিন্তু একবার যখন কাজের ঝুঁকি হাতে নিয়েছি তখন এই কাজ আমাকে শেষ করতেই হবে। এখন আর পিছ্‌পা হতে পারিনে।

স্মাগলিং এবং মেয়ে বিক্রির ব্যাপারে বহুবার মালকানি পুলিশের খপ্পরে পড়ে। দামাস্কাস থেকে অফিম আনতে গিয়ে ধরা পড়ে। কায়রোতে কারেন্সী স্মাগলিং করতে গিয়েও তাকে বিস্তর ঝামেলা পোহাতে হয়েছিলো। এই ধরনের বহু গোপন কাহিনী এই ফাইলে লেখা ছিলো। প্রতিটি ঘটনাই আমি ভালো করে পড়লুম। জানি না কখন কে আমাকে এই সব ঘটনা নিয়ে জেরা করবে। কারুর জেরায় আমি আটকা পড়তে চাইনে। দশ দিন জেলখানায় বসে আমি গোবিন্দবিহারী মালকানির জীবনী রপ্ত করলুম।

ইতিমধ্যে জেলখানার অন্যান্য কয়েদিদের মধ্যে আমার বেশ পপুলারিটি হয়েছিলো। আমার মুক্তি পাবার দু'দিন আগে একজন এসে বললো : জেলখানার বাইরে গিয়ে কী করবেন ? বেরুটেই থাকবেন না ইস্তাম্বুলে ফিরে যাবেন ?

: ভাবছি, আমি বেশ একটু নির্লিপ্ত কণ্ঠে জবাব দিলুম।

: ইস্তাম্বুলে যাবেন না, বেরুটেই থেকে যান। সে বললো,—আপনার আমার জন্যে বেরুটই হলো স্বর্গপুরী। জীবনের সমস্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এখানেই পাবেন।

: কিন্তু এই শহরে আমি সম্পূর্ণই অপরিচিত, আমি জবাব দিলুম।

: পরিচয়ের জন্য চিন্তা করবেন না। আমার ভূতপূর্ব মনিব শেখ মুনিবের জায়তুনী অঞ্চলে একটা বার আছে। শেখ মুনিবের সঙ্গে গিয়ে দেখা করুন। একটা চাকরীর জন্যে আর এতো ভাবনা কী ? আপনার মতো কোয়ালিফায়েড আদমী পেলে লুফে নেবে। আর ঐ বারে আমার গার্ল ফ্রেণ্ড বেটী আছে। বারের কাউণ্টারে বসে তার সঙ্গে আপনি বিস্তর প্রেম করতে পারবেন।

আমি লোকটির কথার কোন জবাব দিলুম না। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে লোকটি আবার বললো,

: শেখ মুনিরের হরেক রকম বিজনেস। সে এই দুনিয়ার একজন সমৃদ্ধশালী কোকেন স্মাগলার। আপনি তো ইণ্ডিয়ান। আপনাদের দেশের সঙ্গেও ওর বেশ যোগাযোগ আছে। ওখানে উনি প্রায়ই কোকেন এবং সোনা পাচার করে থাকেন।

আর একটা কথাও আপনাকে চুপিচুপি বলছি। বিভিন্ন দেশের লোকের সঙ্গেও শেখ মুনিরের বেশ খাতির আছে।

লোকটার শেষ কথা ক'টি শুনে আমার মনটা আনন্দে নেচে উঠলো। বুঝতে

পারলুম, শেখ মুনিরের দরজায় গেলে আমি হয়তো আমার শিকার খুঁজে বের করতে পারবো।

জেলখানা থেকে বেরিয়ে এসেই দিল্লীর কর্তাদের কাছে সব কথা খুলে লিখলুম। আমার প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করার অনুমতি পেলুম।

* * *

তারপর এলুম শেখ মুনিরের দরজায়। আমাকে কাজ দেবার আগে শেখ মুনির বেশ খানিকটা বাজিয়ে নিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই কর্নেল হাসানও মালকানির নামীয় ইণ্টার পোলের রিপোর্টটা বাজারে বিলিয়েছিলেন। অতএব স্মাগলারদের সমাজে আমার সুখ্যাতি বেশ ছড়িয়ে পড়েছিলো। তাই শেখ মুনিরের দরবারেও বেশ সহজেই কাজ পেয়ে গেলুম।

এবার আমি মালকানির ভূমিকায় অভিনয় শুরু করলুম।

আমার সে অভিনয়ের সবচাইতে কঠিন অংশ হলো প্রেমের অভিনয় করা। কিন্তু বেটীর দৌলতে সে কাজেও আমি বেশ রপ্ত হলুম। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ধরনের মদ আর ককটেল বানাতে শিখে নিয়েছিলুম। তাই মাসখানেকের মধ্যেই আমি একজন সুদক্ষ বারম্যান ও ককটেল বানাবার জহুরী হলুম। তখন আর আমাকে দেখে কে বলবে যে আমি ইস্তাম্বুলের কিট-কাট নাইট ক্লাবের বারম্যান নই।

একদিন আমার বারে কর্নেল হাসান এলেন।

বেটী তখন কাউণ্টারে বসে অন্য একজনের সঙ্গে প্রেমে মশগুল ছিলো। আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে কর্নেল হাসান বললেন: রুস্তম, তোমাকে দেখে আমার হিংসে হচ্ছে। দেখছি, তুমি বেশ সুখী ও আরামের জীবন যাপন করছো।

তারপরেই আবার সতর্ক সুরে বললেন: তবু এখনো আমার মনে খানিকটা আতঙ্ক আছে। গোবিন্দবিহারী মালকানি ছিলো এক আস্তো শয়তান। যারা ওকে একবার খুন করার চেষ্টা করেছিলো তারা নিশ্চয় ওকে আবার খুন করার চেষ্টা করবে। তাই বলছি, সব সময়ে খুবই সতর্ক থেকো। প্রয়োজন হলেই আমাকে খবর দিও।

কিন্তু কর্নেল হাসানকে আমার প্রয়োজন হলো না। দু' একদিনের ভেতরেই সভীলা এবং তার বন্ধু এসে আমাকে শেখ মুনিরের ঘরে ডাকলো।

* * *

সভীলার প্রস্তাবে আমি রাজী হলুম বটে কিন্তু আমার মন বলতে লাগলো

যে আমি আগুন নিয়ে খেলা করছি। সতীলার অনুচর হয়ে ভারতবর্ষে আসা মানে বাঘের ঘরে প্রবেশ করা। ধরা পড়বার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। আর ধরা পড়া মানে শুধুই মৃত্যু নয়, সতীলার দলবলের কাউকেও ধরতে পারবো না।

দু'একটা দিন সতীলার প্রস্তাব নিয়ে ভাবতে লাগলুম, কী করা যায়! এতো বড়ো বিপদের ঝুঁকি নিচ্ছি, এর পরিণাম কী হবে! দিল্লীর কর্তাদের কাছে লিখলুম। ওরা কিন্তু সানন্দে আমার মতই সমর্থন করলেন। অর্থাৎ সতীলার দলের হয়ে কাজ করার নির্দেশ দিলেন। বললেন: এই দলের প্রতিটি মেম্বরকে, প্রতিটি স্পাইকে চিনতে হবে। আমরা সমগ্র দলটিরই সন্ধান চাই।

দপ্তরের নির্দেশ আমাকে মানতে হলো। ভোল পাল্টালুম। বহুবার মালকানির জীবনের ফাইল পড়লুম। তার জীবনের প্রতিটি ঘটনা আমার মুখস্থ হয়ে গেলো।

দিল্লীতে খবর পাঠালুম আমি শিগ্‌গিরই ভারতবর্ষে ফিরে আসছি। দেশে ফিরে এসে কর্তাদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ করবো না বটেই, কিন্তু আমি যে ভারতবর্ষে ফিরে এসেছি তার প্রমাণ থাকবে আমার পাশপোর্টে। আমি একটি মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়া পাশপোর্ট নিয়ে দেশে ফিরবো। বলা বাহুল্য, আমার পাশপোর্টের এই সামান্য ভুলত্রুটি নিশ্চয় পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এবং পরে বড়ো কর্তারাও খবরটা জানতে পারবেন। জানতে পারবেন যে রুস্তমজী দেশে ফিরে এসেছে এবং কাজ শুরু করেছে। কিন্তু দিল্লীতে পৌঁছবার পরেই এয়ার পোর্টের পুলিশ আমার সে প্ল্যানটায় প্রথম বাগড়া দিলো। আমি এয়ার পোর্ট থেকে বেরিয়ে যখন ট্যাক্সিতে উঠতে যাচ্ছি তখনই হঠাৎ পেছন থেকে ডেকে কেউ আমাকে বললো,

: স্যার আপনার পাশপোর্টটি জাল।

পুলিশের মুখে এই কথা শুনে আমি একটু শঙ্কিত হলুম। লোকটা পাগল না কি? হয়তো সতীলার দলের কোন লোক এয়ার পোর্টে আমার জন্য প্রতীক্ষা করছে। যদি ওরা পুলিশের এই কথাটা শুনতে পায় তাহলেই কেলেঙ্কারী হবে।

হলোও তাই। কারণ, আমি যেদিন প্রথম সমাদ্দারের সঙ্গে দেখা করলুম, সমাদ্দার আমাকে বললেন: জি-বি-এম, জাল পাশপোর্ট নিয়ে দেশে ঢুকেছেন। নিশ্চয় পুলিশ আপনার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে। পুলিশের দৃষ্টি এড়াবার জন্যে উনি আমাকে মিসেস সেনের সঙ্গে প্রেম করার নির্দেশ দিলেন। অর্থাৎ পুলিশ যেন জানতে না পারে আমার ভারতবর্ষে আমার আসল উদ্দেশ্য কী?

দিল্লীতে এসে আমি মালকানির পুরানো অতীত দিনের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে

দেখা-সাক্ষাৎ করলুম। মালকানির বড়ো বন্ধু ছিলো মানিকলাল। আমি মালকানির ফাইলে পড়েছিলুম যে ওদের এই বন্ধুত্ব বহুদিনের পুরাতন।

আমার মনে সংশয় জাগলো। ভাবলুম, যদি মানিকলাল আমাকে চিনতে পারে? যদি কোন প্রকারে মানিকলাল একথা টের পায় যে আমি হলুম জাল মালকানি তাহলে আমার বিপদের সীমা থাকবে না।

প্রথমটায় কিন্তু মানিকলাল একেবারেই বুঝতে পারে নি যে আমি হলুম জাল মালকানি। না বুঝবার যথেষ্ট কারণও ছিলো। দীর্ঘ কয়েক বছর মানিকলাল মালকানিকে দেখে নি। তাই চট করে সে আমার ছদ্মবেশ ধরতে পারে নি। কিন্তু তবু এক সময় তার মনে সন্দেহ জেগেছিলো।

সন্দেহ জাগবার আরও একটা কারণ ছিলো। একদিন দিল্লীর জিমখানা ক্লাবে হঠাৎ আমার এক সহকর্মী মাধবন নায়ারের সঙ্গে আমার দেখা হলো। সেখানে আমি তার সঙ্গে বসে নিভৃতে কথা বলছিলুম। এমন সময় হঠাৎ সেখানে এসে উপস্থিত হলো মানিকলাল। মানিকলালকে দেখা মাত্রই আমি বেশ বিচলিত হয়ে পড়লুম। কোনরকম দায়সারা গোছের একটা কৈফিয়ৎ দিয়ে তার সঙ্গে মাধবন নায়ারের পরিচয় করিয়ে দিলুম। জিমখানা ক্লাবের টেবিলে বসেই হঠাৎ পরিচয় হয়েছে জানিয়ে দিয়ে মনের বিচলিত ভাবটা দমন করার চেষ্টা করলুম। কিন্তু আমার সে বিচলিত ভাব মানিকলালের দৃষ্টি এড়ালো না। সে আমাকে নানা প্রশ্ন করে যাচাই করতে শুরু করলে। তার প্রশ্নগুলোর সন্তোষজনক জবাব দেয়া সত্ত্বেও তার মনের সন্দেহ সম্পূর্ণ দূর হলো না।

এর পরেই একদিন আমি ওর বাড়ী থেকেই রেডিও ট্রান্সমিশন করার প্রস্তাব করলুম। ঝোঁকের মাথায় সমীর সেনও আমার সে প্রস্তাব সমর্থন করলেন। কিন্তু এতে মানিকলালের মনের সন্দেহ আরো বাড়লো।

সেদিনই সন্ধ্যার সময় মানিকলাল সমীর সেনকে একটা চিঠি লিখলো। সেই চিঠিতেই সে আমার সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে তাকে জানালো যে আমি হলুম জাল মালকানি। সে কিন্তু তার মনের এই সন্দেহ কখনও মুখে বা ভাষায় প্রকাশ করে নি। তা করার মতো কোন সাহসই তার ছিলো না। কারণ, তার নির্দেশ মতোই সতীলা আমাকে বেরুট থেকে সংগ্রহ করে ভারতবর্ষে পাঠিয়েছিলো। এখন আমার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ প্রকাশ করা মানে নিজেরই বিপদ ডেকে আনা। কিন্তু সমীর সেন ছিলো তার আপনজন। চিঠি লেখা শেষ করে সে সেই চিঠিটা বারম্যানের হাতে দিলো পোস্ট করতে।

মানিকলাল যে জিমখানা ক্লাবে বসেই কাউকে একখানা চিঠি লিখেছিলো সে খবরের হদিশ পেলেন সমাদ্দারও। এই সংবাদে তিনিও বিচলিত হয়ে

পড়লেন। চিন্তান্বিত হয়ে সমাদ্দার ভাবলেন, সে নিশ্চয় পুলিশের কাছেই চিঠিটা লিখেছে। কারণ, কিছুদিন থেকেই স্পাইয়ের কাজ করতে খুবই ভয় পাচ্ছে মানিকলাল।

সমাদ্দারের মনের এই সন্দেহ হয়তো ভেঙে যেতো যদি ঠিক সময়ে সমীর সেন সেই চিঠিটা পেতেন। কিন্তু তা হলো না। বারম্যানের গাফিলতির জন্যই সেই চিঠিটা কয়েকদিন পর্যন্ত পোস্ট করা হলো না।

মানিকলাল যে কারু কাছে চিঠি লিখেছে আমি সেই খবর জানতে পারলুম মাধবন নায়ারের কাছ থেকে। সে আমাকে জানালো যে মানিকলাল কারু কাছে খুব বড়ো একখানা চিঠি লিখেছে। নিশ্চয় সে চিঠির ভেতরে কোন গুপ্তখবরও আছে। কথাটা শুনেই কিন্তু আমার আর সন্দেহ রইলো না যে সেই চিঠিটা আমার সম্বন্ধেই লেখা হয়েছে। কিন্তু এখন কোথায় পাওয়া যায় সেই চিঠি? কার কাছেই বা লেখা হয়েছে সেই চিঠিটা? সমাদ্দারের কথাবার্তায় বুঝলুম তিনি মানিকলালের কাছ থেকে কোন চিঠি পান নি।

এই সময়ে সমাদ্দার ভাবলেন যে এবার হয়তো মানিকলাল পুলিশের কাছে গিয়ে ধরা দেবে। মানিকলাল সরকারী কর্মচারী। ওকে সমাদ্দার বিশ্বাস করেন না। কোনদিনই করেন নি। আজ মানিকলালের প্রতি তার সে সন্দেহ আরো বাড়লো। কিন্তু এই ক্ষেত্রে একটি মাত্র উপায়ই তার হাতে ছিলো। সে হলো মানিকলালকে এই সংসার থেকে সরিয়ে দেয়া। সমাদ্দার সেই সিদ্ধান্তই নিলেন। ঠিক করলেন যে মানিকলালকে খুন করবেন।

আমিও মানিকলালের কার্যকলাপে খুবই চিন্তান্বিত হয়েছিলুম। বিশেষ করে ওই চিঠি লেখার পর থেকেই। ভাবতে লাগলুম মানিকলালকে নিয়ে কী করা যায়। ওকে গ্রেপ্তার করিয়ে দেবো না কিড্‌ন্যাপ করার ব্যবস্থা করবো। গ্রেপ্তার করাবার মুস্কিল হলো যে সমস্ত ব্যাপারটা বাজারে রটে যাবে। আমার কাজে বাধা পড়বে। কিড্‌ন্যাপ করালেও সমাদ্দারের মনে সন্দেহ জাগতে পারে। আমার দিক থেকেও মানিকলালকে হত্যা করাই ছিলো সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

অকস্মাৎ মানিকলাল নিহত হলো।

সেদিন কিন্তু আমি বা সমাদ্দার কেউই তাকে খুন করিনি। জিমখানা ক্লাব থেকে প্রচুর মদ খেয়ে মানিকলাল মাতাল হয়ে বেরুলো পথে। পথে পা দিতেই মধ্য রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ করে তীব্র বেগে একটা লরী ছুটে এলো। সেই লরীতেই চাপা পড়ে মরলো মানিকলাল। ড্রাইভার ভয় পেয়ে পালিয়ে গেলো।

খানিক বাদে সমাদ্দারও গাড়ী নিয়ে জিমখানা ক্লাবের কাছে এলেন। উদ্দেশ্য ছিলো মানিকলালকে খুন করবেন। কিন্তু এসে দেখলেন যে মানিকলালের মৃতদেহ

রাস্তায় পড়ে আছে।

মানিকলালের মৃতদেহ রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে সমাদ্দার বিস্মিত ও হতভম্ব হলেন। কল্পনা করেন নি যে মানিকলালকে মৃত অবস্থায় দেখতে পাবেন। মানিকলালকে কে হত্যা করলো? কেন হত্যা করলো? তাহলে পুলিশ কী জানতে পেরেছে যে মানিকলাল স্পাইয়ের কাজ করছিলো?

আমি প্রথমে ভাবলুম মানিকলালকে সমাদ্দারই খুন করেছেন। কারণ, সমাদ্দার সন্দেহ করেছিলেন যে মানিকলাল পুলিশের কাছে গিয়ে সমস্ত কথা খুলে বলবার ফিকিরে আছে। অতএব সমাদ্দারের পক্ষেই তাকে খুন করা অতি স্বাভাবিক। কিন্তু আমার এই ধারণা যে ভুল, বহুদিন পরে তা জানতে পেরেছিলুম। কারণ, যে লরী মানিকলালকে চাপা দিয়েছিলো সে পুলিশের কাছে গিয়ে তার দোষ স্বীকার করেছিলো।

মানিকলালের মৃত্যুর পরে সমীর সেনের ব্যবহারে অনেক পরিবর্তন দেখতে পেলুম। ক্রমেই তিনি যেন বিচলিত হয়ে পড়ছিলেন। তারপর হঠাৎ একদিন আবার আমাদের ক্যারিয়ার মারা গেলো। এবার সমীর সেনের মনে সন্দেহ জাগলো যে পুলিশ নিশ্চয় তাদের কার্যকলাপের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে।

ঠিক সেই সময়ে সমীর সেন মানিকলালের চিঠি পেলেন। চিঠির শেষ পাতায় মানিকলাল লিখেছিলো যে আমি হলুম জাল মালকানি। অতএব তখন থেকেই সমীর সেন সতর্ক হলেন।

সমাদ্দারের চিন্তার কারণ ছিলো ভিন্ন। প্রথমতঃ, উনি সমীর সেনের বিচলতা দেখে একটু ভয় পেলেন। দ্বিতীয়তঃ, যখন জানতে পারলেন যে রতন মাইক্রোফিল্ম অন্যের কাছে বিক্রি করবে তখনই তার ধারণা দৃঢ় হলো যে এবার পুলিশ সমীর সেনের পেছনে লাগবে। কারণ যে ডকুমেন্টগুলো মাইক্রোফিল্ম করা হয়েছিলো তার ভেতরে সমীর সেনের সই ছিলো। পুলিশ যদি এই মাইক্রোফিল্ম হাতে পায় তাহলে সমীর সেনের খোঁজ পেতে একটুও বেগ পেতে হবে না।

অতএব সমাদ্দার একটু বিচলিত হলেন।

সমাদ্দারের ধারণা আমি মিসেস সেনের প্রেমে পড়েছি। এই প্রেমের দরুনই সমীর সেন আমাকে হিংসে করেন। অতএব সমীর সেন যদি আমাকে আড়ালে, নিভৃতে মিসেস সেনের সঙ্গে প্রেম করতে দেখেন তাহলে নিশ্চয় মনে খুব ব্যথা পাবেন। সমীর সেনের দুর্বল হার্ট। হয়তো আমাকে ওঁর বাড়ীতে দেখলে গুরুতর শক্ পাবেন। সেই শকে তার মৃত্যু হওয়াও আশ্চর্য নয়। তাই তিনি আমাকে সমীর সেনের বাড়ীতে গিয়ে মিসেস সেনের সঙ্গে প্রেম জমাবার

জন্য উৎসাহিত করলেন।

সমীর সেনের বাড়ীতে যাবার ব্যাপারে আমার মনে কিন্তু অন্য একটি উদ্দেশ্য কাজ করেছিলো। আমি চেয়েছিলুম সমীর সেনের বাড়ীতে গিয়ে তার কাছে মানিকলাল যে চিঠি লিখেছিলো সেই চিঠিটা উদ্ধার করবো।

আমার এই কাজটি ছিলো বেশ খানিকটা দুঃসাহসিক কাজ। কিন্তু তবু আমি আমার কাজের দায়িত্বের কথা স্মরণ করে এই বিপদের ঝুঁকি নিলুম।

ইতিমধ্যে সমীর সেন মানিকলালের চিঠিটা পড়ে বেশ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। সেদিন ওর বাড়ীতে আমাকে দেখে তার মনে একটুও হিংসের উদ্রেক হয় নি, ভয়ে তিনি প্রচণ্ড মানসিক শক পেলেন। আর সেই শকের ধাক্কায় খানিকটা পরেই সমীর সেনের মৃত্যু হলো। আমি মিসেস সেনের সঙ্গে কথাবার্তার ফাঁকে সমীর সেনের বসবার ঘরে ঢুকে মানিকলালের সেই চিঠিটা উদ্ধার করলুম। সমীর সেনের বসবার ঘরের একটা ড্রয়ারে ছিলো সেই চিঠিটা। মিসেস সেনের চোখ এড়িয়ে আমি সেই চিঠিটার শেষ অংশের দুটো পাতাই শুধু সংগ্রহ করতে পারলুম। বাকী অংশ সেই ড্রয়ারেই পড়ে রইলো।

চিঠির শেষ দুটো পাতাতেই মানিকলাল আমার সম্বন্ধে তার সন্দেহের কথাগুলো প্রকাশ করে লিখেছিলো। তাই দীর্ঘদিন বাদে মিসেস সেন যখন এই চিঠি সত্তীলা এবং দলের কর্তাদের কাছে পড়েছিলেন তখন চিঠির শেষ পাতা দুটো পড়তে পারেন নি। কারণ, ঐ পাতা দুটো তখন ছিলো আমার জিম্মায়।

চিঠির শেষ পাতা দুটো খোয়া যাবার জন্য আমি মস্তো এক বিপদের হাত থেকে রেহাই পেলুম। কেউ জানতে পারলো না যে আমিই হলুম থার্ড ম্যান, ভারত সরকারের স্পাই। মিসেস সেন সমাদ্দারকে সন্দেহ করলেন। সমাদ্দার মিসেস সেনকে সন্দেহ করলেন। দুজনের ভেতরে যে হৃদ্যতা ছিলো সেই বন্ধুত্ব ভেঙ্গে গেলো। সেই হৃদ্যতা ভাঙবার আরও একটি কারণ হলো সমীর সেনের মৃত্যু। মিসেস সেন সমীর সেনকে ভালোবাসতেন। আমার সঙ্গে যে প্রেমের অভিনয় করেছিলেন সে শুধু দলীয় কর্তব্যের খাতিরে। সমীর সেনের মৃত্যুর জন্যে মিসেস সেন সমাদ্দারকে দায়ী করলেন। কারণ মিসেস সেন জানতেন যে সমাদ্দার ইচ্ছে করেই আমাকে সমীর সেনের কাছে পাঠিয়েছেন। এবং আমার জন্যেই শক পেয়ে সমীর সেনের মৃত্যু হয়েছে।

আমি মিসেস সেন ও সমাদ্দারের এই ঝগড়ার ফলে লাভবান হলুম। কারণ আমি তাদের দুজনেরই বিশ্বাস-ভাজন হয়ে দাঁড়ালুম।

এর পর হঠাৎ একদিন লক্ষ্য করলুম যে সমাদ্দারও আমাকে সন্দেহ করতে

শুরু করেছেন। এইবার প্রমাদ গুনলুম। মানিকলালকে ধোঁকা দিতে পারি, সমীর সেনের চোখে ধাঁধা লাগাতে পারি, মিসেস সেনকেও ধাপ্পা দিতে পারি কিন্তু সমাদ্দারের চোখে ধুলো দেয়া সহজ কথা নয়।

আমাকে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ ছিলো সমাদ্দারের। প্রথমতঃ ওর মনে সন্দেহ জাগলো যে এয়ার পোর্টের পথে ক্যুরিয়ারকে হত্যা করলো কে? সরকার? কিন্তু কেন? কী করে সরকার জানলো যে ক্যুরিয়ারের কাছে একটি মূল্যবান মাইক্রোফিল্ম আছে!

তারপর আরুইন হাসপাতালের ঘটনায়ও সমাদ্দারের মনে খানিকটা বিস্ময় জেগেছিলো। সমাদ্দার জানতেন যে ক্যুরিয়ারের বাঁধানো দাঁতের ভেতরে মাইক্রোফিল্ম লুকানো ছিলো। আর সেই নকল দাঁতের পাটি দুটো গিয়ে পড়েছিলো রতনের হাতে। রতন সেই দাঁতের পাটির ভেতর থেকে মাইক্রো-ফিল্ম বের করে নিয়ে পাকিস্তান হাইকমিশনে বিক্রি করার চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু সে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে। কারণ, সেই মাইক্রোফিল্মগুলোর ভেতরে কোনই জরুরী ডকুমেন্টের ছবি ছিলো না বলেই সে তা বিক্রি করতে পারে নি। মাইক্রোফিল্মগুলো ডেভেলপ করে দেখা গিয়েছিলো যে সেগুলো ছিলো একে-বারেই সাদা। কোন ডকুমেণ্ট বা কোন কিছুরই চিহ্ন নেই তার গায়ে। কী করে এটা সম্ভব হলো। এই মাইক্রোফিল্ম তো আমি ওর সামনে বসেই করেছিলুম।

এসব কারণেই সমাদ্দার সন্দেহ করলেন যে আমি ওর সঙ্গে ছলচাতুরী করেছি। কিন্তু তার মনের এই সন্দেহ তিনি মনেই পুষে রাখলেন। কারু কাছে এমন কি আমার কাছেও ঘুণাক্ষরে প্রকাশ করলেন না। তবে আমাকে বাজিয়ে দেখার জন্য এক নতুন প্ল্যান করলেন।

মিসেস সেনের মুখে সমাদ্দারের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনে সতীনা দলের নেতৃত্ব-ভার আমার হাতে দিলেন। সমাদ্দারও সতীনা এবং দলের নেতা চীনি ভদ্রলোকের প্রস্তাবে পুরোপুরি সায় দিলেন। কারণ, ওর মনে ছিলো আমার ওপরে গোপনে তীক্ষ্ণ নজর রাখা। সত্যি সত্যিই আমি গভর্নমেণ্টের স্পাই না খাঁটি জেনুইন স্মাগলার এবং স্পাই তা জানা দরকার। তাই সমাদ্দারও সানন্দে দলের নেতৃত্বভার আমার হাতে ছেড়ে দিলেন।

আমি সমাদ্দারের মনের এই সন্দেহের কথা বুঝতে পারলুম। বুঝতে পারলুম যে উনি আমাকে সন্দেহ করছেন। দলের মধ্যে এতোগুলো দুর্ঘটনা হয়ে গেলো অথচ আসল কাজ কিছুই এগোলো না। কেন?

আমি জানতুম যে আর অভিনয় চালিয়ে যাওয়া যাবে না। হয় এদের

দলের সবাইকে এখন পাকড়াও করতে হবে, নইলে দলের সাথে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে যেতে হবে। অর্থাৎ, এমন .ভাবে কাজ করে যেতে হবে যে কারু মনে সন্দেহ না জাগে যে আমিই হলুম থার্ড ম্যান।

আমি কাজে অনেকদূর এগিয়েছিলুম। ওদের খবর ট্রান্সমিশন করার কথা, দলের বিভিন্ন মেম্বরদের নাম ধাম সবই সংগ্রহ করেছিলুম। কিন্তু একটা জিনি জানতে পারিনি। জানতে পারিনি, ওরা কোথা থেকে বা কার কাছ থেকে টাকা পায়। শুধু জানতে পেরেছিলুম, মাঝে মাঝে বিদেশ থেকে টাকা আসে। কিন্তু সে টাকা যেমন অপ্রচুর তেমন অনেক বিপদও জড়িয়ে থাকে তার সঙ্গে।

হঠাৎ একদিন সমাদ্দারের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় জানতে পেরেছিলু যে ওরা জাল কারেন্সীও বাজারে চালু করেছে। কোথায় সেই কারেন্সী নোট ছাপা হয় তা জানার জন্যই আরও কিছুদিন মুখবুজে ওদের সঙ্গে কাজ করে যাওয়াই সঙ্গত মনে করলুম।

কিন্তু শিগ্‌গিরই আমার কাজে আর একটা বিঘ্ন ও বিপদ ঘনিয়ে এলো। সেই বিপদ হলো রেখা সরখেলকে ব্ল্যাকমেল করার ব্যাপার নিয়ে।

আমি জানতুম যে রেখা সরখেলকে ব্ল্যাকমেল করে আমি কোন না কোন টপ-সিক্রেট জানতে পারবো। কিন্তু তারপর! সমাদ্দার আমার ওপর কড়া নজর রাখছেন। এবার তাকে ফাঁকি দেবার যো নেই। সে সব কাগজপত্রের ভুয়ো ফটোগ্রাফী করলে চলবে না। তার সন্দেহ চাপা দিতে হলে সাচ্চা কাজ করতে হবে। আর সাচ্চা কাজ করার অর্থই হলো ভারত সরকারের গোপনীয় টপ-সিক্রেট দলিলগুলো সমাদ্দারের হাতে পড়া। কিন্তু আমি কখনই সে সব মাইক্রোফিল্ম তার হাতে দিতে পারিনে। এবার কোন সিক্রেট ডকুমেণ্ট সমাদ্দারের হাতে পড়লে সেই ডকুমেণ্ট অচিরেই পিকিং-এর কর্তাদের হাতে পৌঁছে যাবে। তাই, রেখা সরখেলকে ভুলিয়ে সিক্রেট ডকুমেণ্টের মাইক্রোফি করার পরেও সেই ফিল্মের রোলগুলোকে আমি নিজের কাছেই রাখলুম।

রেখা সরখেলের বাড়ী থেকে বেরিয়েই দেখলুম, সমাদ্দার বাইরে রাস্তা ওপরে দাঁড়িয়ে আছেন আমার প্রতীক্ষায়। অথচ সেখানে তার আসার কো কথা ছিলো না। বুঝতে পারলুম সমাদ্দার আমাকে পুরোপুরিই নজরে নজ রাখছেন।

এর পরেই আমরা সদলে কলকাতায় এলুম। কলকাতায় এসে মিঃ সেনের সঙ্গে এমন অভিনয় করলুম যে তার মনের সব সন্দেহ দূর হয়ে গেলো আমি যে খাঁটি লোক সে ব্যাপারে তার মনে আর কোন সন্দেহ রইলো না। বরং তার এই সন্দেহই প্রবল হলো যে সমাদ্দারই হলেন ভারত সরকারের স্পাই

বা অনুচর।

শ্রীরামপুরের একটা পরিত্যক্ত বাড়ীতে আমাদের তিনজনের মোলাকাতের ব্যবস্থা হলো। আমি ভেবেছিলুম যে শ্রীরামপুরেই ওদের জাল নোট ছাপাবার কারখানা। তাই পুলিশকে আগে থেকেই সতর্ক করে দিয়েছিলুম। কিন্তু উল্টো ফল হলো। পুলিশের আঁচ পেতেই সমাদ্দার দক্ষিণেশ্বরে ভেগে গেলেন। সে ব্যাপারেও মিসেস সেন সমাদ্দারকে সন্দেহ করলেন। বললেন: আমাদের দুজনকে পুলিশের হাতে তুলে দেবার জন্যই সমাদ্দার এই কারসাজী করেছেন।

শ্রীরামপুরে পুলিশ যদি মিসেস সেনকে পাকড়াও করতে পারতো তাহলে সমাদ্দারের মনে একটুও সন্দেহ থাকতো না যে আমিই হলুম থার্ড ম্যান। আর আমিও ওদের দক্ষিণেশ্বরের বাগান বাড়ীর খবর জানতে পারতুম না। প্ল্যান করেই আমি শ্রীরামপুর থেকে মিসেস সেনকে নিয়ে হাওড়ায় এলুম। পথেই মিসেস সেন আমাকে বললেন যে দক্ষিণেশ্বরেই পার্টির হেড কোয়ার্টার। অতএব দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে শ্রীরামপুরেই কেন যে আমাদের মোলাকাতের স্থান নির্দিষ্ট হলো তা উনি একটুও বুঝতে পারছেন না।

হাওড়াতে পৌছবার পরেই আমি মিসেস সেনকে একাকী গ্রাণ্ড ট্যাঙ্ক রোড দিয়ে দক্ষিণেশ্বরে যাবার উপদেশ দিলুম। ওকে পথের মাঝখানেই কোথাও গ্রেপ্তার করা হয় আমি আগে থাকতেই তার ব্যবস্থাও করে রেখেছিলুম।

দক্ষিণেশ্বরের বাগান বাড়ীর ঠিকানা মিসেস সেনই আমাকে দিয়েছিলেন। সমাদ্দারের মনের সন্দেহ দূর করার জন্য আমি আগে থেকেই এমন বন্দোবস্ত করিয়ে রেখেছিলুম যে হাওড়াতে ট্রেন থেকে নেমে রাস্তায় পা দেবার পর মুহূর্তেই সেখানে আমাকে একদল পুলিশ এসে তাড়া করবে। তাদের হাত কাটিয়ে কোন রকমে আমি গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়বো। এবং সেখান থেকে দক্ষিণেশ্বর যাবো। এটুকু দক্ষতার সঙ্গে করতে পারলেই সমাদ্দারের মনে আর কোন সন্দেহ থাকবে না যে আমি খাঁটি লোক আর মিসেস সেনই হলেন পুলিশের অনুচর।

সমাদ্দার আমার পাতা ফাঁদে পা দিলেন। তিনিই আমাকে গঙ্গার জলের বুক থেকে টেনে তুলবার ব্যবস্থা করলেন। তার মতলব ছিলো, আমাকে জেরা করে করে বের করে নেবেন সত্যিই আমি কোন্ দলের হয়ে কাজ করছি। কিন্তু একটু বাদেই খবর পাওয়া গেলো যে মিসেস সেন পুলিশের খপ্পরে পড়েছেন। মিসেস সেনের এই পুলিশের হাতে ধরা পড়ার ব্যাপারটা কোন সাজানো ঘটনা কিনা তা কিন্তু স্পষ্ট জানা গেল না। ফলে মিসেস সেনের ওপরে সমাদ্দারের সন্দেহ আরও গভীর হয়ে দানা বাঁধলো।

সমাদ্দারের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে এসে আমি তাদের গোপন আস্তানার হদিশ পেলুম। সতীলারও দেখা পেলুম সেখানে এসে। নোট ছাপবার একটা ছাপাখানাও দেখলুম সেখানে।

এবার জাল গুটোতে হলো। আমার নির্দেশ মতো আগে থেকেই পুলিশ আমার পেছু নিয়েছিল। এবার তারা দক্ষিণেশ্বরের আস্তানার ওপরে হানা দিলো। দলবল সহ সমাদ্দার ও সতীলা ধরা পড়লো। কিন্তু আমার অভিনয় তখনো শেষ হয় নি। তখনো চিন্তা ছিলো হয়তো দলের আরো অনেকে ধরা পড়ে নি। হয়তো ওরা এখনো আমার ওপর নজর রাখছে। তাই পুলিশের হাত কাটিয়ে পালিয়ে যাবার ভান করে আমি দমদম এয়ার পোর্টে গেলুম। এয়ার পোর্ট অবধি আমি গোবিন্দবিহারী মালকানির ভূমিকায় অভিনয় করলুম।

*　　　*　　　*　　　*

বিচিত্র মানুষ এই স্পাই।

তার জীবনের প্রতি স্তরে স্তরে লুকিয়ে আছে বিপদ। এই বিপদ এড়াতে তাকে আরও অনেক বিপজ্জনক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। সে সব ঘটনার অনেকাংশই অবাস্তব ও অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। তাই আমার জীবনের ঘটনাতেও এমন অনেক ঘটনার পরিচয় পাওয়া যাবে যা আপাতদৃষ্টিতে অলৌকিক বলে মনে হবে।

কিন্তু মনে রাখবেন, স্পাই-এর জীবন সাধারণ মানুষের জীবন নয়।

তাই স্পাই হলো এই জগতের এক বিচিত্র মানুষ।

●